অগ্নিতট সপ্তগ্রাম

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশকাল : ১লা বৈশাখ ১৩৭২

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১ নিতাই বাবু লেন, কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক : স্রোতা ঘোষ, এস. জি. প্রিন্টার্স, ১৪৪/১, রাজা
রামমোহন সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯

'কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি—'

রবীন্দ্রনাথ।

ভূমিকা

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সম্রাট সেন এমন কোন নবাগত নন যে, তাঁর উপন্যাসের ভূমিকা বা পরিচায়িকার প্রয়োজন আছে। কারণ ইতিপূর্বে তাঁর কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস কাহিনীগ্রন্থনে, চরিত্রাঙ্গনে ও ইতিহাস-রসসৃষ্টিতে বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে এবং পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহলী আকর্ষণ তাঁকে জনপ্রিয়তার জনারণ্যে টেনে এনেছে—যদিও তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধূসর পটভূমিকার মতই অন্তরালে থাকতে চান। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'অগ্নিতট সপ্তগ্রাম' সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তগ্রাম-হুগলীর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চিত্রিত কয়েকটি নরনারীর আখ্যান। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের মধ্যে এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এবং পর্তুগীজ মিশনারী ও 'হার্মাদের' অত্যাচারের অগ্নিজ্বালা-এর ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে মানব-বেদনারসে পূর্ণ করে তুলেছে।

গঙ্গার তীরে রাঙামাটি গ্রাম। এই গ্রামের অবিবাহিতা কুলীনকন্যা ইন্দিরাকে পর্তুগীজ হার্মাদরা স্নানের ঘাট থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেল। অদূরে নৌকা থেকে এ দৃশ্য দেখলেন নিঃস্ব জমিদারপুত্র সূর্যকান্ত এবং এর যথোচিত প্রতিবিধানকল্পে প্রস্তুত হলেন। তারপর দ্রুত গতিতে কাহিনী এগিয়ে চলল। ইতিহাসের রণরঙ্গমুখর রাজপথে গ্রামের মেয়ে ইন্দিরা নেমে এল। তারপর কত সংঘাত-সংঘর্ষ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব—কখনো আমদরবার, কখনো হারেম, কখনো হুগলী-সপ্তগ্রাম রাঙামাটি, কখনো আগ্রা। বিশাল্ দেশ ও বিচিত্র কালের আবর্তনে সাধারণ নরনারীর চরিত্রগুলি হারিয়ে গেল না, বরং তারাই যেন ঘটনা-প্রবাহকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে নির্দেশ করতে লাগল।

লেখক আশ্চর্য কৌশলে ইতিহাসের ধারাপ্রবাহ ও সাধারণ অনৈতিহাসিক মানব-মানবীর জীবনপ্রবাহকে একসূত্রে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। এই দুই ধারা সমান্তরাল রেখায় পরিণত না হয়ে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল লক্ষ্য ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবজীবনরস পরিবেশন, শুধু ঐতিহাসিক তথ্যের সমারোহ নয়। তাই বলে বিনা প্রয়োজনে ইতিহাস-বিচ্যুতিও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য নয়। শ্রীযুক্ত সম্রাট সেন এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অতিশয় অভিজ্ঞ, সুতরাং ইতিহাসের অতি-প্রাধান্যের প্রতি তাঁর লোভ থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গেই ইতিহাস ও মানব জীবন—উভয়ের সমানুপাত রক্ষা করেছেন।

অধুনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে যে সমস্ত বিপুল কলেবর অমেধ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, তার তুলনায় 'অগ্নিতট সপ্তগ্রাম' একটি আবির্ভাব। লেখক স্বয়ং

সপ্তগ্রামেরই আদিবাসিন্দা। সুতরাং এর ইতিহাসের প্রতি তাঁর স্বভাবতই কৌতূহল ছিল। তিনি ভূমিকায় বলেছেন 'সপ্তগ্রামের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিলাম এবং তাকে কাহিনীসূত্রে গাঁথবার বাসনাও ছিল'। সেই আগ্রহ তাঁর পূর্ণ হয়েছে। ইতিহাসের কাহিনী ও মানবজীবন-কাহিনীকে তিনি একসূত্রে সার্থকভাবে গ্রন্থিত করে সর্বজন উপভোগ্য উপন্যাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

প্রসঙ্গত

সপ্তগ্রামে পতুর্গীজ হাঙ্গামা সুবিদিত কাহিনী—ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাসে জানা যায় সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা যে-সব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলার মোগল-শাসনের শৈশবে তা রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অত্যাচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার ও তদপেক্ষা অধিক পাদ্রীর উৎপীড়নে বাধ্য হয়ে বাদশাহ শাহজাহান কাশেম খাঁকে হুগলী আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন। এইসব ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস পওয়া যাবে মহম্মদ আমীন রচিত 'বাদশাহনামা' অথবা 'তারিখ-ই-শাহজাহান' নামক গ্রন্থে। পর্তুগীজ পাদ্রী ও জলদস্যুর অত্যাচারই যে বাঙলায় পর্তুগীজ-শক্তির অধঃপতনের কারণ, ইংরাজ ঐতিহাসিক কীন ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ডাঃ বার্গেস তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। একথাও স্বীকার করতে হয় যে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য ব্যতীত 'শাহজাহান' পর্তুগীজদের পরাজিত করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে ১৬২১ খৃস্টাব্দে শাহজাহান সুরাট বন্দরের ইংরাজ-প্রধানকে মোগল সাম্রাজ্যমধ্যে সর্বত্র সকল সময়ে পতুর্গীজ জাহাজ আক্রমণে ফর্মান প্রদান করেছেন।—ইংরাজ চরিত্রটির অবতারণা সেই প্রয়োজনে।

এ গ্রন্থের উপাদান ছড়িয়ে আছে নানাস্থানে ঃ 'আমল-ই-সলিহ', 'মাসির-উল-উমারা', 'বাদশাহনামা' প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন আছে তেমনি 'রিয়াজ-উস্-শালাতীন'-এ। গোলাম হোসেন সলেমী সারাংশ সংগ্রহ করে 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' লেখেন পারস্য ভাষায়—তা থেকে উপাদান সংকলন করে ইংরেজি ভাষায় বাঙলার ইতিহাস রচনা করবার সময়ে ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট বহু বিষয় পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করার ফলে বাঙলা ভাষায় বাঙলা দেশের যে-সব ইতিহাস-গ্রন্থ লেখা হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাতেও ফিরিঙ্গি বণিকের কথা যথাযোগ্যভাবে স্থানলাভ করেনি। কারণ, স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন'-এর অনুবাদ নয়, ছায়ামাত্র। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 'গোলাম হোসেন' নামক প্রবন্ধ লিখে, সেই প্রবন্ধের ফলশ্রুতি রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের অশেষ অধ্যাবসায়ে অনুদিত সিরাজ-উস্-সালাতীন। পরে, এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে আবদুস সালেম সাহেব একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

গোলাম হোসেনের গ্রন্থোক্ত ফিরিঙ্গি-বণিকদের বিবরণ যতদিন কেবল পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে সর্বসাধারণে অপরিচিত ছিল ততদিন ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করেও, ফিরিঙ্গি-বণিক সম্বন্ধে বেশি কিছু জানবার উপায় ছিল না। তা তখন পর্তুগীজ ভাষাবদ্ধ গ্রন্থে ও রাজদপ্তরের কাগজপত্রে অন্তরীণ। ড্যানভার

যথাযোগ্য অনুসন্ধান করে গ্রন্থ রচনা করার ফলে এবং স্যর উইলিয়াম হাণ্টার নানা তথ্যের আলোচনা করায় ক্রমে অনেক কথা জানবার সুযোগ পাওয়া গেছে।

এ-সব তথ্য সংগ্রহের পেছনে আমার একটি প্রেরণা ছিল, সেটি এই যে, সপ্তগ্রামেই আমাদের আদি বাসস্থান। স্বভাবতই সপ্তগ্রামের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিলাম এবং তাকে কাহিনীসূত্রে গাঁথার বাসনাও ছিল। যে সময়ের কাহিনী এ গ্রন্থে বিধৃত তখন সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য-গরিমা অস্তগমোন্মুখ, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমি শুধু কাহিনীর মধ্যে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু গ্রহণ করেছি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ময়ূখ' বইটি এ বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করেছে, তাঁর ঋণ স্বীকার করি।

বৈশাখ

তেলিনীপাড়া ঃ হুগলী

সম্রাট সেন

অগ্নিতট সপ্তগ্রাম

।। এক ।।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি। বৎসরের শেষ। চৈত্র মাস। শুষ্ক আবহাওয়া। খরার টানে রুক্ষ প্রকৃতি।

গঙ্গাকূলে রাঙামাটি গ্রাম। গঙ্গা স্নানে চলেছে ইন্দিরা।

প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ী থেকে সে বেরোয় না। গণ্ডিবদ্ধ যাতায়াত। তাঁকে নিয়ে আলোচনা হোক এ তাঁর পছন্দ নয়। সতের পেরিয়ে আঠারোয় পড়েছে অথচ বিয়ে হয়নি এখনও, এ যেন তার অপরাধ। কুলীন কন্যা। মুখের উপর কেউ কোন কথা বলবে না হয়ত, কিন্তু চলে আসার পরেই প্রতিবেশিনীরা বাঁকা চোখে চাইবে, বক্র মন্তব্য করবে। সে-সব শুনতে রুচি নেই, স্বেচ্ছা উপস্থিতিতে তার খোরাক যোগাতে প্রবৃত্তি হয় না। ইদানীং প্রতিবেশিনীদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও যায় না ইন্দিরা, গৃহ বন্দিত্ব সহনীয় করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে আসে শুধু গঙ্গার ঘাটে। তাও প্রয়োজনে, পালা-পার্বনে। স্নানের জন্য।

বাড়ির অতি-নিকটে তবু অপ্রয়োজনে আসে না গঙ্গাতীরে। পরিচিত সুন্দর দৃশ্যাবলী। প্রচুর হাওয়া। আকর্ষণ যথেষ্ট। ছোটবেলায় আসত। এখন বন্ধ করে দিয়েছে একেবারে। ফিরিঙ্গির ভয়। তাছাড়া ঐ রসালো মন্তব্য, বংকিম কটাক্ষ, দরিদ্র পিতার অক্ষমতা নিয়ে টিটকারি-কোনটাই রুচিকর ঠেকে না। বরং ঘরে বসে ভাবতে ভাল লাগে। ভাল লাগে মনে মনে গঙ্গার সাথে মিতালি। ঋতুতে ঋতুতে গঙ্গার পরিবর্তন—তাঁর রূপ মানস-চক্ষে মোটামুটি দেখতে পায়। সর্বাধিক আকর্ষণীয় বর্ষার রূপ। গঙ্গা যেন বর্ষার নব জল-ধারায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তাকে চেনাই যায় না। লাবণ্যের ঢল নামে সর্বাংগে। চেনা যায় না বাণের সময়। শীর্ণা গঙ্গা বাণে তেজে ও জলোচ্ছ্বাসে অন্যরকম হয়ে যায়। ভরে ওঠে তার দেহ। বুঝি যৌবন পায়। কলকল ছলছল করে বাতাস লেগে।

এখন পথ চলতে চলতে এই-সব কথা ভাবছিল ইন্দিরা।

গ্রামের গা ঘেঁষে গঙ্গা, কয়েকটা চালাঘর আর কিছু গাছ-গাছালির আড়াল।

অস্তিত্ব অনুভব করা যায় প্রায় সর্বক্ষণই। ঠাণ্ডা বাতাসে তার আর্দ্রতার অনুলেপন অস্বীকার করার উপায় নেই। শরীরে-মনে তার উপস্থিতি। বান এলে কিংবা বর্ষার ঢল নামলে এই আর্দ্র শীতল বাতাসে শোনা যায় তার বিপুল কলনাদ— যেন রুদ্রাণী হয়ে ওঠে গঙ্গা। কূলে এসে দাঁড়ালে ভয় করে। বান আর বর্ষার ঘোলা জলের সাথে মিশে গঙ্গা যেমন যৌবন পায় তেমনি ভীষণ হয়ে ওঠে— কলোচ্ছ্বাসে উন্মাদিনীর মতো কূল ভেঙে ছোটে সাগরে কোন্ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। এই গঙ্গা তখন ভীষণ ও সুন্দর। ভয় করে, ভাল লাগে। বিষামৃতের মতো। তিথি উপলক্ষে ডুব দিতে এলে মনে হয় পায়ের তলা থেকে বুঝি মাটি সরে যাচ্ছে, রাক্ষসী-মায়ের মতো গঙ্গা বুঝি টেনে নেবে আপন গর্ভে।' ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। মায়ের সঙ্গে স্নান করতে এসেছিল একবার। মনে হয়েছিল, জলের তলায় কে যেন তার কচি পা দুটো ধরে নির্দয়ভাবে টানছে, মায়ের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কী খরস্রোত! মায়ের শত আশ্বাসেও ভয়ে সে ডুব দিতে পারেনি, কেবল তীরে ওঠার জন্যে কান্না। অবশেষে মা তাকে কোলে তুলে সেই হাঁটু-পরিমাণ জলে কোনোমতে নিচু হয়ে গোটা-কতক ডুব দিয়ে ওর স্নানের সাধ মিটিয়েছিলেন। বাড়ী এসে কী বকুনি!—সে কত বছর আগে!

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ঠেলে—বুঝি টনটন করে উঠল বুকের ভেতরটা।

মায়ের সাথে সে আর কোনোদিন গঙ্গাস্নানে আসে নি, মা বিরক্ত হয়েছিলেন বলে নয়, তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছিলেন তার অল্পদিন পরেই। আজ দশ বছর হয়ে গেল মা পরলোকগতা। ইন্দিরা হিসেব করে দেখল, শেষবার সে গঙ্গাস্নানে এসেছিল আট বছর বয়সে, সময় কী দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। সেই ছোট্ট মেয়েটিকে আজ আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, বর্ষার ঢল-নামা গঙ্গার মতো। এ এক অন্য মেয়ে। কূলে কূলে ভরা। বয়স ও জ্ঞান বেড়েছে, সেই সঙ্গে শরীরে এসেছে আশ্চর্য পরিবর্তন। ছেলেবেলার সেই ভয় দূর হয়ে দেখা দিয়েছে অন্য ভয়। গরীব-ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও রূপ-লাবণ্যে ও যৌবন-লক্ষণে বিব্রত হতে হয়, ভয় সেইখানে। সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। প্রতিবেশিনীদের ঈর্ষার কারণ সে বোঝে।...তবু বিব্রত ভাব কাটে না। শুধু সে নিজে নয়, বিব্রত হচ্ছেন বাবাও। তাঁর বিব্রত হওয়ার কারণ এই শরীর-রহস্য আর বাবার দুশ্চিন্তা, তার বিবাহ। নিজের শরীরের যেমন সে তল পাচ্ছে না তেমনি যজমানী-পিতা পাচ্ছেন না পাত্রের সন্ধান। — পাত্র! বিবাহ! লজ্জা পেল ইন্দিরা। বড় বড় পা ফেলে, যেন এ ভাবনার হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এগিয়ে গেল খানিক।

দাসী আসছিল পেছনে, তার কাঁখে পিতলের ঝকঝকে কলসী, কাঁধে গামছা।

ইন্দিরাকে এগিয়ে যেতে দেখে সে বলে উঠল, 'আস্তে, দিদি, আস্তে। কাল সারাদিন উপোস গেছে. তার উপর রাত্রি জেগেছো, জোরে হাঁটলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।'

চলার গতি ঈষৎ শ্লথ করল ইন্দিরা। একদিনের উপবাসে ও রাত্রি জাগরণে শরীর খুব দুর্বল, হোঁচট খেয়ে পড়লে ওঠবার শক্তি থাকবে না। একটা হোঁচট সে খেয়েছে ইতিপূর্বে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় চৌকাঠে, হাত আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছিল কাঁখের ওই কলসী। শব্দ শোনা গিয়েছিল, ঝন ঝন ঝন—

বাবা বেরিয়ে এসেছিলেন হন্তদন্ত হয়ে : 'কী হল মা?'

'কলসীটা পড়ে গেল—'

'হোঁচট খেলি?'

'ও কিছু না বাবা—'

'ঠিক বেরোবার সময় বাধা। সাবধানে যাস মা। গঙ্গায় যা উৎপাত।'

'কিছু ভেবো না বাবা। যাব আর আসব। ভানু দিদি আছে সঙ্গে—'

'শিবের উপোস করেছিস। না বলতে পারি নে। তাড়াতাড়ি আসিস মা।'

'চলো ভানুদিদি—'

ভানুমতী সেই কলসী কাঁখে তুলে নিয়েছে। মনটা তখন থেকেই ভারি। একটা অস্পষ্ট ভয়ের ছায়া। বেরোবার সময় চৌকাঠে হোঁচট। বেশ বড় হোঁচট। টনটন করছে পায়ের বুড়ো আঙুল—ঝিনঝিন করছে মাথার শিরা। সচরাচর এমন বাঁধা আসে না, খুব সতর্ক চলনভঙ্গি তার, ধীর ও সাবধানী। অন্যদিন হলে গঙ্গাস্নানে যেত না ইন্দিরা—বাড়িতেই স্নান সেরে নিত। ব্রত বা তিথি ব্যতীত গঙ্গায় স্নানে যাবার প্রয়োজনও হয় না, জলের দরকার হলে ভানুমতী কলসী ভরে জল নিয়ে আসে। পুরনো দাসী ভানুমতী, মায়ের বিয়ের সময় এসেছিল, অতি গরীব স্বজাতীয়া বিধবা। নিঃসন্তান, সংসারে কেউ নেই। মায়ের মৃত্যুর পর তার হাতেই এ সংসারের ভার। সব দিক আগলিয়ে রেখেছে। তার হাত চলে যেমন মুখও চলে তেমনি। সহজে কেউ ঘাঁটায় না ওকে। নির্বিঘ্নে পথ হাঁটা যায়। তাই সঙ্গে নেওয়া। কিন্তু বাধা পড়ল। শিবরাত্রির উপবাসে ও জাগরণে শরীর-মন এত ক্লান্ত যে অবগাহন স্নান বিশেষ প্রয়োজন—জোর করেই বেরিয়ে পড়েছে ইন্দিরা।

অথচ বাবার আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ফিরিঙ্গিদের উৎপাত দেখা দিয়েছে গঙ্গায়। বউ-ঝিদের পক্ষে গঙ্গার ঘাট নিরাপদ নয়। ইন্দিরা আবার পা চালাল, তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। বাবার জন্যে রান্না চড়াতে হবে, খেয়েদেয়ে যজমান-বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবেন তিনি। আর্থিক সঙ্গতি নেই—হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াবেন এ-গ্রাম ও-গ্রাম। পাত্রের মন গলাবার জন্যে কাকুতি-

মিনতি করবেন দুয়ারে দুয়ারে। এখন চৈত্র মাস—আগামী বৈশাখে তার বিয়ে দিতে না পারলে তিনি নির্ঘাত সমাজ-পরিত্যক্ত হবেন, একঘরে হয়ে যাবেন। পিতার এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কন্যার মর্মপীড়ার কারণ।.....ইন্দিরা কতদিন চোখের জল ফেলেছে গোপনে, প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে, কিন্তু তার আঠারো বছরের দুঃসহ জীবনের সেই আনন্দের লগ্ন কোনোদিন আসেনি। বাবা প্রতি-বার ফিরে এসেছেন বিষণ্ণ মনে। দু-একটি সংবাদ যা পাওয়া গেছে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেননি। কুলীন পাত্রের অভাব সেই দেশে—বিবাহ যাদের ব্যবসা। শুধু একরাত্রির সম্বন্ধ, বাকি সমস্ত জীবনে স্বামীর দর্শন মিলবে কিনা সন্দেহ। মৃত্যুকালে পতি-দেবতার মুখখানা স্মরণে আসবে না হয়তো—দীর্ঘ অনশনে সে-মুখ যেমন ঝাপসা তেমনি অস্পষ্ট। তাও স্বীকার করা যেত, সমাজের যা রীতি তা অমান্য করার মতো শক্তি কারই-বা আছে, কিন্তু আর্থিক প্রশ্নেই বিব্রত হয়েছেন দরিদ্র পিতা। পঞ্চাশ-ষাটটি কন্যাকে উদ্ধা করেছেন এমন বৃদ্ধ পাত্রের আর্থিক আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত কম নয়। সেজন্যে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। —তবে কী উদ্ধার পাবে না ইন্দিরা? স্বপ্নে সে বার বার দেখেছে শিবের মতো সুন্দর একটি যুবা-পুরুষ, রাজ্যহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পথে। তার বাহুতে অমিত শক্তি, হৃদয়ে দুর্জয় সাহস, দেহে পবিত্র-তার জ্যোতি। ঠিক এরকম কোনো পুরুষ সংসারে আছে কিনা সে জানে না, জানে না সেই পুরুষ তার মতো হতভাগিনীকে উদ্ধার করবে কিনা, কিন্তু স্বপ্নটি বড় সুন্দর—বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। স্বপ্নের সেই মুখের সঙ্গে শিবের মুখের আশ্চর্য মিল। তাই এবারে শিব-চতুর্দশীতে নিয়ম পালনে কোনো ত্রুটি রাখেনি ইন্দিরা। উপবাসে ও রাত্রি-জাগরণে সে মনেপ্রাণে শিবরূপ ধ্যান করেছে এবং পিতার কষ্ট ও ক্লেশ দূর করার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে। গঙ্গাস্নানেই তার পূর্ণ উদ্‌যাপন। অতএব বাধা অস্বীকার করে তাকে গঙ্গার ঘাটে আসতে হল।

চণ্ডীমণ্ডপ পেছনে ফেলে, ছোট কুঁড়েঘরগুলো পার হয়ে, গাছ-গাছালির ছায়া ডিঙিয়ে ইন্দিরা গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়াল। চৈত্রের গৈরিক গঙ্গায় কলতান—জোয়ারের জল বয়ে চলেছে কুলুকুলু স্বরে। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে পক্ষ বিস্তার করেছে হাঁসের দল, তাদের শুভ্র ডানায় অজস্র কিরণ ঢেলে দিয়েছে সকালের শিশুসূর্য, রূপার পাতের মতো ঝকঝক করছে ডানাগুলো। ভারি সুন্দর দেখায় উড়ে-চলা এই হংস-বলাকা, যেন মালার মতো আকাশের কোনো দেবতার গলায় টুপ করে ঝুলে পড়তে চায়। দেখা গেল না বেশিক্ষণ—ওপারের দিকচক্রবালে হারিয়ে গেল দূর হতে দূরে। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল ইন্দিরা। ইট বাঁধানো ঘাট জীর্ণ হয়ে গেছে কালের নিয়মে,—জোয়ারে গঙ্গা এত ভরে উঠেছে যে আর মাত্র দু-তিনটি সিঁড়ি বাকি আছে ডুবে যেতে। বন্যায় ও বানে কখনও ডুবে যায়, তট ও তরঙ্গের সাথে ঘটে অন্তরঙ্গ মিতালি। তখন দেখায় যেন প্রকাণ্ড

একটি হলুদবর্ণ চাদর কেউ বিছিয়ে দিয়েছে এপার ওপার জুড়ে। থই থই করে জল। শান্ত নিঝুম পরিপূর্ণ গঙ্গার সাথে তখন যেন কথা বলতে সাধ হয়। কিন্তু ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি—বাবাকে রান্না করে দিতে হবে। এরকম তন্ময় হয়ে গঙ্গার রূপ দেখলে কি তার চলে? নদীতে নামার জন্যে সে পা বাড়াল।

ভানুমতী বললে, 'কোথায় যাচ্ছ দিদি? দেখছ-না কাদের নৌকো বাঁধা?'

তা বটে।

অন্যমনস্কতায় একেবারে সামনের জিনিসটি সে উপেক্ষা করে গেছে। বাস্তবিক একটা নৌকা বাঁধা রয়েছে ঘাটের নিচে—তীর থেকে ঝুঁকে পড়া একটা বহুকালের পুরনো ছাতিম গাছের ডালের সঙ্গে। কালক্রমে তটদেশ যত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে ছাতিম গাছটি ততই ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর। তার কয়েকটা শাখা নৌকোর মাঝিদের দাঁড় বাঁধার মস্ত সহায়ক। সেইভাবে গাছের আড়ালে ছোট নৌকাখানি বাঁধা রয়েছে বলে ভাল করে ইন্দিরার চোখে পড়েনি, ভানুমতীর কথায় সে সচকিত হল। তাকিয়ে দেখল নৌকোর ওপরে সদ্যোনিহত কয়েকটি রক্তমাখা পাখি, পাশে বন্দুক-হাতে এক দিব্যকান্তি তরুণ যুবক পিছন ফিরে আকাশের পানে তাকিয়ে, সম্ভবত লক্ষ্য করছে উড়ন্ত পাখির গতিবিধি। ভিন্ গাঁয়ের যাত্রী নিশ্চয়, বন্দুক চালাতে জানে এবং পোশাকে-পরিচ্ছদে মনে হয় অভিজাত-বংশের ভদ্রসন্তান। চুলগুলি উড়ছে বাতাসে এবং শোনা যাচ্ছে, গুনগুন সুর। গলা বেশ মিষ্ট এবং বোঝা যায়, সংগীতচর্চায় অনুরাগ আছে।

নৌকোর মধ্যভাগে প্রৌঢ়বয়সী হৃষ্টপুষ্ট যে লোকটি হ্রস্ব ধুতি ও পিরান গায়ে চিৎভাবে চোখে হাত ঢেকে শুয়ে, তাকে দেখে মনে হয়, মাল্লা-শ্রেণীর লোক, সম্ভবত ঐ নৌকোর মাঝি। মনিবের ভ্রমণসঙ্গী হয়েছে। কিন্তু এত জায়গা থাকতে এ-ঘাটে নৌকো বাঁধা কেন? মেয়েদের স্নানের অসুবিধা হবে বিব্রত বোধ করল ইন্দিরা।

ভানুমতী বললে, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। নৌকো বাঁধবার আর জায়গা পেলে না?'

বলে সে নেমে এল জল অবধি : 'বলি, ঘাটে নৌকো কার? শিগগির নৌকো সরাও—'

প্রৌঢ় ব্যক্তির চোখের ওপর থেকে হাত সরে গেল এবং সে তড়াক করে উঠে বসল।

'তুমি কে গা?'

তার স্বরে বিরক্তি।

ভানুমতী বললে, 'আমি যেই হই, নৌকো সরাতে বলছি সরাও—'

'কেন?'

'কেন আবার কি। মেয়ে-ছেলেরা চান করবে না?'

'আরও ঘাট আছে। তোমরা অন্য ঘাটে যাও—'

'বেশ কথা বললে। সুবিবেচনা আছে দেখছি! এ না হলে বুদ্ধি—'

ইন্দিরা মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'ভানুদিদি—'

অর্থাৎ সে বিবাদ চায় না। দাসীকে থামাতে চাইল কথা না বাড়িয়ে। ভানুমতী চুপ করল অনিচ্ছায়।

'ঘাটে ছেড়ে দিতে হবে? হুঁ! তোমাদের কেনা ঘাট কিনা—'

গজগজ করছিল প্রৌঢ় ব্যক্তি।

আরোহী যুবক গান থামাল এবং ফিরে দাঁড়িয়ে কঠিনস্বরে ডাকল, 'রাঘব—'

প্রৌঢ় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বিনম্র হল ঃ 'মহারাজ!'

যুবক বললে, 'এটা কী হচ্ছে?'

'কেন মহারাজ?'

যুবক তেমনি বিরক্ত ঃ 'এখানে নৌকো থাকলে ও'রা স্নান করবেন কী করে?'

'ঠাকুরানীরা যখন এতদূর আসতে পেরেছেন তখন আর একটু কষ্ট করে অন্য ঘাটে গেলেই পারেন—'

'ছি রাঘব। নৌকো সরাও—'

'সরাব?'

'হ্যাঁ—'

'বেশ।'

ক্ষুণ্ণমনে অগত্যা গাছের ডাল হতে দড়ি খুলে সে নৌকো সরাল এবং দূরে নিয়ে গেল। ঘাট পার হয়ে যাবার সময় যুবক ওদের উদ্দেশ্যে বললে, 'আপনারা এবার ঘাটে আসুন—' কণ্ঠস্বর বড় সুমিষ্ট। দীর্ঘদেহ, দিব্যকান্তি, বলিষ্ঠ গঠন। নৌকোর ওপরে দাঁড়িয়ে যেন এক তরুণ দেবদূত। ইন্দিরার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। সে অপাঙ্গে তাকিয়েছিল যুবকের পানে, কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সোজাসুজি চোখ তুলল এবং তৎক্ষণাৎ মনে হল, জীর্ণ ঘাট, ওই নৌকো এমন-কি গঙ্গা নিদারুণভাবে দুলে উঠেছে। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। আশ্চর্য, এই মুখ সে স্বপ্নে দেখেছে এবং শিবের মুখের সাথে মিশিয়ে ফেলে কখন্ আরাধ্য দেবতায় পরিণত করেছে। ঠিক সেই মুখ!

কিন্তু পরিচয় জানা নেই—জানা নেই কোনো কথা। শুধু ভৃত্যের সম্বোধনে জানা গেছে তিনি 'মহারাজ'। কোথাকার মহারাজ? কী কারণে একজন মাত্র সঙ্গী সম্বল করে নৌভ্রমণে বেরিয়েছেন? মহারাজ যদি, অন্যান্য পাত্রমিত্র ও দলবল কই? এ কেমন মহারাজ?

দূর, স্বপ্ন কখনও সত্যিই হয়? তার যা পোড়াকপাল! যত সব অসঙ্গত চিন্তা। ছিঃ, পরপুরুষে আসক্তি!

রক্ত জমে গিয়েছিল ইন্দিরার সুশ্রী মুখে—সকালের আলোয় দেখাচ্ছিল অদ্ভুত সুন্দর। দূরে সরে যেতে যেতে যুবক তাকিয়েছিল অপলকে। ঘাটেই সে দেখেছে একবার, মনে হয়েছিল অপরূপা তপস্বিনী। এখন দূর হতে মনে হল একটি পবিত্র দেবী-প্রতিমা। কাদের বাড়ির কন্যা? অনূঢ়া? হায়, কোন্ সে ভাগ্যবান যার গলায় সে মাল্যদান করবে?—ছবিটা যুবকের মনে স্থায়ী আঁকা হয়ে গেল। মনে হল এ ঘাটে নৌকো বাঁধা তার সার্থক হয়েছে।

কিন্তু অলক্ষে ঝড় জমছিল কেউ তা টের পায়নি।

যুবকের নৌকো ঘাট হতে সরে অদূরে একটা বাঁশঝোপের ভেতরে আশ্রয় নিল। তীরদেশ থেকে নত হয়ে বাঁশের ঝাড় বেশ একটা কুঞ্জ সৃষ্টি করেছিল, রাঘব তার মধ্যে নৌকো প্রবেশ করাল এবং খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিশ্চিন্ত হল। বাঁধা শেষ হলে সে আপন মনে বলে উঠল, 'যাক বাবা, এটা কোনো ঘাট নয়। কেউ আর কথা শোনাতে পারবে না। বেশ ছায়া আছে, নিরিবিলি। মহারাজ, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন।'

যুবক বললে, 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'একটা কেন মহারাজ, হাজারটা বলুন। আমি আপনার অনুগত ভৃত্য, আপনি আমার অন্নদাতা।'

রাঘব যথার্থ ভৃত্যের মতো জোড়হাত করে দাঁড়াল।

যুবক বললে, 'তুমি আমার ভৃত্যের অধিক, বন্ধু ও সহচর। সবাই যখন আমাকে ত্যাগ করেছে—তুমি আমার সঙ্গ ছাড়োনি। রাঘব, দুঃসময়ে মানুষকে সবচেয়ে বেশি চেনা যায়। এখন আমার দুঃসময় চলেছে, সঙ্গী-সাথী লোক-লস্কর কেউ আজ আমার পাশে নেই, একমাত্র তুমি ছাড়া। কথাটা তা নয়, আমি যা বলতে চাইছি তা তোমার ওই ডাক।'

'কোন্ ডাক, মহারাজ?'

'ওই মহারাজ সম্বোধন। ওটা কানে বড় খট করে লাগছে। ও নামে তুমি আমাকে ডেকো না।'

'ডাকব না?'

'না।'

'কেন মহারাজ?'

'আমি প্রশ্ন করছি, কেন ডাকবে? আমার কী আছে?'

'সেকথা যদি বলেন,' রাঘব গর্বোৎফুল্লস্বরে বললে, 'আপনার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সকলেই রণসাগরের রাজা ছিলেন—আপনার বংশের সকলকেই সেজন্যে আমরা মহারাজ বলে ডেকে থাকি। আপনি স্বর্গত মহারাজের

একমাত্র সন্তান, রূপে গুণে বলবীর্যে আপনার তুলনা মেলা ভার। আপনাকে যদি মহারাজ বলে না ডাকি তো কাকে ডাকব?

'কিন্তু রাঘব,' যুবক গম্ভীর হয়ে উঠল, 'সত্যি তো আমি মহারাজ নই। রণসাগরের রাজসম্পত্তির কানাকড়ির উত্তরাধিকারী কী আমি? এখন সে-সব আমার খুড়োমশায় ভোগ-দখল করছেন।'

'তা তিনি করছেন বটে', রাঘব বললে, 'কিন্তু সকলেই বলে তাঁর মৃত্যু ঘটলে আপনিই মহারাজ হবেন।'

'তারা ভুল বলে রাঘব।' যুবকের গাম্ভীর্য তেমনি অটুট ঃ 'তাঁর সন্তান জীবিত থাকতে আমি ও সিংহাসনে বসতে পারি না। কেউ এভাবে কী সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে দেয়? খুড়োমশায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেই মহারাজ হবে, আমি যেমন আছি তেমনি থাকব।'

রাঘব বললে, 'আপনার পিতার রাজ্য আপনি পাবেন না কেন?'

'কী করে পাব? অধিকার নেই।' যুবকের স্বরে ঈষৎ ক্ষুণ্ণতা?

'খুড়োমশায় দিল্লি থেকে বাদশাহের ফরমান পেয়েছেন। আমি যখন শিশু ছিলাম তখন খাজনা বাকি পড়েছিল বলে সুবাদার আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল, সেইসময় ছোট রাজা খুড়োমশাই দিল্লি থেকে ফরমান এনে ওই রাজ্যের দখলিস্বত্ব অধিকার করেছেন।'

'সে কথা আমরা জানি। রণসাগরের সবাই জানে।' রাঘব তবু একরোখার মতো বললে, 'দু-বছর খাজনা বাকি পড়েছিল বলে কী সাতপুরুষের ন্যায্য দাবী কেউ ছেড়ে দেয়? এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে?'

যুবক ধীরস্বরে বললে, 'বাদশাহের হুকুম তো মানতে হবে রাঘব।'

'আপনি যদি একবার হাঁক দিতেন তাহলে সমগ্র রণসাগর আপনার পেছনে এসে দাঁড়াত। আপনাকে সবাই দেবতার মতো ভক্তি করে। আপনি রাজা হলে আমরা সবাই সুখে থাকতাম।'

'সুখে থাকতে কিনা জানি না কিন্তু তোমরা যে আমাকে ভালোবাসো তা জানি। খুড়োমশায় সবাইকে দুঃখে রেখেছেন তাও সত্যি নয়। কোথাও কোনো গোলমাল নেই—বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে রণসাগরের দিন। তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলুম, বাবা মারা গেলেন, তার কিছুদিন পরে মাও চলে গেলেন, ওই খুড়োমশায় কোলে তুলে নিয়ে আদর-যত্নে এত বড়টি করেছেন। তাঁর তো কোন দোষ খুঁজে পাইনি। রাজ্যের কথা কিছুই বুঝতাম না, খুড়োমশায় কার নামে ফরমান আনলেন সে-বিষয়ে কৌতূহল ছিল না, খেতে পাচ্ছি, শাস্ত্রশিক্ষা করছি, খেলে বেড়াচ্ছি, তখন তোমাদের হাঁক দেবার মতো বুদ্ধিই হয়নি।'

'হুঁ।'

যুবক বললে, 'সে আক্ষেপ করে আজ আর লাভ নেই। আজ আমি বড়

হয়েছি, খুড়োমশায়ের তত্ত্বাবধানে থেকে রাজ্যটি খোয়ালেও শাস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যাটা ভাল করে রপ্ত করেছি—উড়ন্ত পাখি গুলি করে নামাতে পারি তা তো সকালেই দেখলে। পাখিগুলো রান্না করো, ভাতের সঙ্গে তোফা খাওয়া যাবে। আমার হাতে বন্দুক থাকলে আমি কাউকে ভয় করি না রাঘব।'

'যেমন আমার হাতে তীর-ধনুক।'

যুবক বললে, 'যথাসম্ভব শাস্ত্রপাঠ করেছি, শাস্ত্রবিদ্যাতেও মোটামুটি নিপুণ, আমার বয়স এখন তেইশ। খুড়োমশায়ের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে দেহমন মজবুত করেছি, অলসভাবে বসে বসে দিন কাটাতে ইচ্ছা হল না, তাই বেরিয়ে পড়েছি। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে, আবাল্যের সহচর তুমি আছ সঙ্গী, ভয় করব কাকে? শুধু মাঝে মাঝে ওই নামে ডেকে মনে করিয়ে দাও, আমি স্বর্গত মহারাজ চন্দ্রকান্ত রায়ের ছেলে রাজ্যহারা হতভাগ্য সূর্যকান্ত রায়।'

'ছি ছি ছি আপনি হতভাগ্য হবেন কেন?' রাঘব কানে আঙুল দিল, 'শুনলেও যে পাপ হয়।'

'তবে মহারাজ বলে ডেকো না।'

'কী বলে ডাকব?'

'যা খুশি।'

'তা হয় না মহারাজ। রাজ্য আপনি ফিরে পাবেনই, মিছামিছি দুদিনের জন্যে অন্য নামে ডেকে পাপের ভাগী হই কেন? এটুকু আপনাকে ক্ষমা করতে হবে মহারাজ—'

সূর্যকান্ত কথা বললে না। বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে বাতাস বইছে ঝিরঝিরিয়ে। পাড়ে বসে রয়েছে কয়েকটা বক— একটা মাছরাঙা পাখি জলে ছোঁ মেরে উড়ে গেল। ঘাটের উপর দেখা যাচ্ছে সেই মুখরা স্ত্রীলোকটিকে, ওর কর্ত্রীঠাকুরানীর সম্ভবত স্নান শেষ হয়নি এখনও। রাঘব সঠিক বুঝতে পারল না মহারাজ হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন কথা বলতে বলতে। কোথায় কী ঘটেছে? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

'বেলা প্রখর হয়ে উঠেছে, আহারাদির আয়োজন করি মহারাজ—'

তবু উত্তর নেই। মহারাজ ঠায় তাকিয়ে আছেন দূরে, নদীবক্ষে একখানি বড় নৌকোর পানে। নদীপথে নৌকো চলবে এ তো স্বাভাবিক। তা বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখার কী আছে? আরও তো ক'খানা' মহাজনী নৌকো ধীরভাবে উজানে চলেছে।

'মহারাজ।'

'উ—'

'কী দেখছেন?'

'নৌকোটা বড় জোরে ওপার থেকে এপারে আসছে—'

'বোধহয় ফৌজদারের ছিপ।'

'ভাল করে চেয়ে দ্যাখ্—'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সূর্যকান্ত। তার সুন্দর মুখে উত্তেজনার গাঢ় ছায়া। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে নৌকোটির গতিপথের দিকে।

'ঠিক বলেছেন ওটা ছিপ নয়, একখানা কোশা—'

'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কোশা কী কখনও এত জোরে চলতে পারে?' যুবকের স্বরে বিস্ময়।

বাস্তবিক একখানি কোশা দ্রুতবেগে ওপার থেকে এপারে আসছে। মাঝগঙ্গায় দু-তিনটি মহাজনী বড় নৌকো। সামাল সামাল রব উঠেছে।

'সাধারণ কোশা পারে না।' রাঘবের স্বরে উত্তেজনা ঃ 'কিন্তু ফিরিঙ্গি কোশা পারে।'

'সে কথাই ভাবছি।' যুবক চিন্তিত ঃ 'কিন্তু এখানে ফিরিঙ্গির কোশা আসবে কোথা থেকে? সপ্তগ্রাম তো বহুদূর।'

'তা বটে।'

'আমাদের মকসুদাবাদে বাদশাহী নাওয়ারার কোশা নেই, আমি জানি।' যুবক বললে, 'হয়ত জাহাঙ্গীরনগর থেকে আসছে। সুবাদারের কোশা হতে পারে।'

রাঘব বললে, 'তাহলে সোজা সপ্তগ্রামে যেত, এরকম পারাপার হবে কেন? এ যে প্রকাণ্ড কোশা—একদিকে পঞ্চাশখানা বৈঠা পড়ছে। ইস্—দেখেছেন কাণ্ড?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তেজনায় তীরধনুক তুলে নিল। তার আগেই বন্দুক তুলে নিয়েছিল সূর্যকান্ত। ওদের আশঙ্কা একেবারে মিথ্যা নয়। দুজনেই দেখতে পেল মাঝগঙ্গা দিয়ে যে তিনটি মহাজনী নৌকো মন্থরগতিতে উজানে ভেসে যাচ্ছিল, বড় কোশাখানি তাদের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াল এবং দু-তিনবার বন্দুকের শব্দ হল। বোঝা গেল আক্রমণকারী কোশা থেকেই বন্দুকের শব্দ উঠেছে, কেননা পরক্ষণে একখানি নৌকো টাল খেয়ে ডুবে যেত লাগল। রাঘব বললে, 'মহারাজ, যা ভেবেছি তাই, ওটা ফিরিঙ্গি হার্মাদের কোশা, তিনখানা নৌকোই ডুববে।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার তো?'

'ওরা এভাবেই লুটতরাজ করে।' রাঘব দাঁতে দাঁত চাপল ঃ 'শুধু নিরীহ নৌকোগুলোতেই হামলা করে না, গঙ্গার ঘাটে মেয়েছেলে দেখলে তাদেরও পরিত্রাণ নেই। ওরা লুটেরার জাত—এদেশের আতঙ্ক। বড় বাড় বেড়েছে মহারাজ—'

'দেশের শাসন রয়েছে, তবু এমনটা হচ্ছে কী করে?'

'বন্দোবস্ত আছে নিশ্চয়।'

'শুনেছিলাম বটে ফিরিঙ্গিরা অত্যাচার করে বেড়ায়,' যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আজ স্বচক্ষে দেখলুম।'

'দেশ বেড়াতে যখন বেরিয়েছেন,' রাঘব বললে, 'এমন কাণ্ড হয়ত আরও দেখবেন—'

এরা কথা বলছিল আর ওদিকে বন্দুকের শব্দ হচ্ছিল ক্রমাগত। গঙ্গার মাঝখানে একটা খণ্ডযুদ্ধ। প্রতিরোধ টিকল না বেশিক্ষণ। একখানা নৌকো ডুবেছিল আগেই, বাকি দুটো নৌকো ডুবল অল্পক্ষণের মধ্যে। কোশা থেকে বিজাতীয় হল্লা ও চিৎকার ভেসে এল। যেন মারণযজ্ঞের আনন্দ-উল্লাস।

'ও কী!' যুবক যেন আর্তনাদ করে উঠল।

'কী মহারাজ?'

'দেখতে পাচ্ছি,' যুবক উত্তেজিত ঃ 'কোশাখানা তীব্রবেগে ঘাটের দিকে আসছে।'

'ঘাটে স্ত্রীলোক রয়েছে যে।' রাঘবের সেই পূর্ব সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ঘাটের দিকে ওরা আসবে তা যেন সে জানত।

'কারা?'

'সেই দুজন—'

'ওদের চলে যেতে বল্।'

'বলব কী করে? কোশা যে এসে পড়েছে।'

'সর্বনাশ!'

পরক্ষণে কোশা এসে লাগল ঘাটে। ভানুমতী আর ইন্দিরা আর্তনাদ করে উঠল ভয়ে। মাঝগঙ্গায় নৌকোডুবি তারা দেখেছিল, ভেবেছিল, পারস্পরিক সংঘর্ষে এটা ঘটেছে এবং কোশাখানা তাদের উদ্ধারকল্পে এগিয়ে এসেছে। ওটা যে ফিরিঙ্গিদের কোশা এবং পরিস্কার দিনের আলোয় মহাজনী নৌকো ডুবিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসবে তা একবারও ভাবেনি। ইন্দিরা জল থেকে ওঠার আগেই তীব্রবেগে ছুটে এল কোশাখানা, ভিড়ল ঘাটে। ওরা দিশেহারা হয়ে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠল।

সূর্যকান্ত বললে, 'রাঘব, নৌকো খুলে দে—'

রাঘব বিচলিত হয়েছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি হারায়নি। সে বললে, 'মহারাজ বলেন কী! আমরা এই দুজন লোক, ওদের নৌকোয় পঞ্চাশ জন বন্দুকধারী, জেনেশুনে কেউ মরতে যায়?'

'বন্দুক আমারও আছে।'

'কিন্তু ওদের পঞ্চাশটা বন্দুক। অবুঝ হবেন না। ভেবে দেখুন, একা আপনি কী করতে পারেন?'

'তা বলে চোখের সামনে এ অত্যাচার দেখব?'

যুবক রীতিমত উত্তেজিত।

'উপায় কি।'

রাঘব নির্বিকার।

'খুলে দে নৌকো।' যুবক তার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল, 'আর কিছু না পারি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মরব।'

'তার চেয়ে আমি যা বলি শুনুন।' রাঘব অনুত্তেজিত শান্তস্বরে বললে 'বিপদে ধৈর্য হারালে চলে না। এক কাজ করা যাক। নৌকো আমাদের বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢোকানোই আছে, সহজে দেখতে পাবে না। আসুন, নৌকোর আড়ালে জলে নামি। আপনি বন্দুক ধরুন আর আমি তীরধনুক। যতগুলো পারি শেষ করি—'

'তাই কর। দেরি করিসনে। ওদিকে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

ওরা চটপট নেমে পড়ল জলে। নৌকো আড়াল করে জলে দাঁড়াল। কোমর-পরিমাণ জল, স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারল। সামনে বাঁশঝাড়ের আবরণ, পাতা ও বাঁশের ডগা দুলছে, বাতাস বইছে ঝিরঝিরিয়ে। বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। আকাশে প্রখর সূর্য। নদীর ঘাটে হার্মাদ জলদস্যুর দল। ওরা দেখতে পেল, ঘাটের ওপরে একজন ফিরিঙ্গি অল্পবয়সী মেয়েটিকে ধরে কোশায় ওঠাবার চেষ্টা করছে, মেয়েটি ঘাটের সোপান আঁকড়ে প্রাণপণে আর্তস্বরে প্রার্থনা করছে, 'হরি, মধুসূদন, রক্ষা কর।' তীরের ওপর সঙ্গিনী প্রৌঢ়া আকুলভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে আর চেঁচিয়ে বলছে ঃ 'কে কোথায় আছ শিগগির এসো গো—আমাদের ইন্দিরা-দিদিকে ধরে নিয়ে যায়—' কিন্তু কারো আবেদনে সাড়া নেই। মেয়েটির হরি বা মধুসূদন সম্পূর্ণ নির্বিকার —প্রৌঢ়ার আবেদনও নিস্ফল। গ্রামবাসীরা বুদ্ধিমান, তারা জানে, একজনের জন্যে শতজনের প্রাণ বিসর্জন অর্থহীন, যদি-বা-দু-একজন উঁকিঝুঁকি মেরেছিল, বন্দুক আর দলবল দেখে তৎক্ষণাৎ গা ঢাকা দিয়েছে। তাদের আগমনে ও প্রস্থানে এ কথাটাই স্পষ্ট, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। অতএব কোথাও থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ফিরিঙ্গি দস্যু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল মেয়েটিকে, ওরা দেখল মেয়েটির শক্তি নিঃশেষিত এবং ফিরিঙ্গি জোর করে তাকে কোশায় তুলেছে। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে দৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

একই সঙ্গে বন্দুকের গুলি ও ধনুকের তীর গিয়ে বিঁধল ফিরিঙ্গির দেহে। সে ঘাট থেকে জলে পড়ে গেল। করধৃত ইন্দিরা সংজ্ঞাহীন, সে জলে ভেসে যাচ্ছিল। একজন ফিরিঙ্গি তাকে ধরে ঘাটের রাণায় শুইয়ে দিয়ে বন্দুক তুলে নিল। আকস্মিক আক্রমণে ও সহচরের মৃত্যুতে বিপুল ক্রোধে সে বাঁশঝাড় লক্ষ্য করে বন্দুক চালাল। তার সঙ্গীরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, বন্দুকের শব্দে সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘাটের রাণায় আত্মগোপন করে একযোগে শুরু করল প্রতিআক্রমণ । ওদিকে একটা বন্দুক আর একঝাঁক তীর। কতক্ষণ এ অসম যুদ্ধ চলতে পারে? আড়ালটা ছিল খুবই ভাল, প্রতিপক্ষের সমস্ত গুলি হয় নৌকোর গায়ে লাগছিল নতুবা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তারই

ফাঁকে কয়েকটি শর ও গুলি গিয়ে বিঁধল ফিরিঙ্গিদের শরীরে, কেউ লুটিয়ে পড়ল ঘাটে, কেউ ভেসে গেল জলে। কিছু সংখ্যক ফিরিঙ্গি এভাবে জখম হবার পর সূর্যকান্ত ফিসফিস করে বললে, 'রাঘব, আমার গুলি ফুরিয়ে গেছে।'

রাঘব তেমনি মৃদুস্বরে জানাল, 'মহারাজ, আমার তূণে আর শর অবশিষ্ট নেই—'

'তাহলে?'

'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন—'

'তাও পারছিনে।'

'লেগেছে আপনার?'

'ও কিছু না—'

'আপনার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কোথায় লেগেছে?'

'কানের পাতায়—'

'আপনি নৌকোয় উঠে বিশ্রাম করুন, আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখছি।'

'বিশ্রামের প্রয়োজন নেই কিন্তু ওরা থেমে গেল কেন?'

'তাই তো—'

বন্দুকের দু-একটা আওয়াজ আসছিল বটে কিন্তু ওরা যখন কথাবার্তা বলছিল তখন দলপতির নির্দেশে অন্যান্য ফিরিঙ্গিরা কোশায় উঠে পড়েছে। বোঝা গেল ওরা ভয় পেয়েছে, পালাতে চাইছে। সূর্যকান্ত বললে, 'হায়, এখন যদি গুলি থাকত, সব কটাকে শেষ করতুম।' বাস্তবিক অবশিষ্ট ফিরিঙ্গি কজন নির্বিঘ্নে কোশায় উঠল।

আরও দু-চারটে গুলির আওয়াজ করে তারা দ্রুত চলে গেল ঘাট ছেড়ে।

সূর্যকান্ত বললে, 'তোর কী মনে হয় মেয়েটিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে?'

'বুঝতে পারছি না। একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে উঠল তো?'

'চল দেখে আসি।'

বেণুকুঞ্জ হতে নৌকো খুলে ওরা ঘাটে এল।

তখন ঘাটের ওপরে, তীরে দাঁড়িয়ে সেই বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটি হাপুস নয়নে কাঁদছে আর ভাঙাগলায় বলছেঃ 'কর্তাঠাকুরের এ কী সর্বনাশ হল গো! জলজ্যান্ত মেয়েটাকে দিনের বেলা ধরে নিয়ে গেল। এত চেঁচালুম, একটা লোকও বেরিয় এল না গা ঃ শাসন করার বেলা বড় বড় বুলি, রক্ষা করার বেলা কেউ নেই! আমার কী হবে গো, আমি কর্তাঠাকুরের কাছে মুখ দেখাব কী করে?'

সূর্যকান্ত উঠে এসেছিল কাছে, বললে, 'তুমি ঠিক দেখেছ তোমার কর্তাঠাকুরের মেয়েকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে? জলে ভেসে যায়নি?'

ভানুমতী কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আপনাদের গুলি আর তীরের আঘাতে

প্রথমবার তুলতে পারেনি বটে, শেষবার চলে যাবার সময় কাঁধে করে তুলে নিয়ে গেছে। আপনারা যা করেছেন তা কেউ করে না। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।—শিবরাত্রির উপোষ করেছিল গতকাল, গঙ্গাস্নান করে বাবাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবে বলে তাড়াতাড়ি এসেছিল ঘাটে। কতক্ষণ একা-একাই লড়েছিল ইন্দিরাদিদি—কিন্তু যণ্ডাগুলোর সঙ্গে পারবে কেন? জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল আর কাঁধে ফেলে তুলে নিয়ে গেল যণ্ডারা। এই রাঙামাটিতে যদি মানুষ থাকত তাহলে কী এমনটা ঘটত? আপনাদের সঙ্গে এখানকার মানুষ এসে যোগ দিলে কী ওরা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারত? মুখে আগুন—মুখে আগুন—এখানকার মানুষের মুখের আগুন—'

বিলাপ, ক্রোধ ও অভিসম্পাতে ভানুমতী পাগলের মতো বকে যেতে লাগল: 'কর্তাঠাকুর গরীব কিন্তু খাঁটি ব্রাহ্মণ, তাঁর একমাত্র সন্তানই ওই ইন্দিরাদিদি। ওর গায়ে হাত দিয়েছে ফিরিঙ্গিরা, কেউ রক্ষা পাবে না, জ্বলে-পুড়ে যাবে। আমি বলছি দেখে নেবেন ও মেয়েকে স্বয়ং শিব রক্ষা করবেন—'

সূর্যকান্তের বলতে ইচ্ছে হল, 'হরি মধুসূদন নামে তো তোমার ইন্দিরাদিদি অনেক ডাকাডাকি করেছিলেন তবু কী ফিরিঙ্গির হাত থেকে রক্ষা পেলেন? আমাদের সমাজের মতো ঈশ্বরও বধির—'

না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সূর্যকান্ত।

ভানুমতী বললে 'মা-মরা মেয়ে, সারাদিন উপোস করে ছিল গো। কী কুক্ষণেই গঙ্গা ঘাটে এসেছিল। জাত গেল ধর্ম গেল—ওর বাবা গঙ্গাধর ঠাকুর এ সংবাদ শুনলে পাগল হয়ে যাবেন। আমি কোন্ মুখে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব—তিনি যে আমার ভরসায় মেয়েকে গঙ্গাস্নানে পাঠিয়েছিলেন—'

তার বিলাপ ও কান্নায় নদীতট মথিত হয়ে উঠেছিল। সূর্যকান্ত এদিক ওদিক তাকায়, দেখতে পায় একজন দুজন করে গ্রামবাসীরা দেখা দিতে শুরু করেছে। এখনি সান্ত্বনা ও সমবেদনার ঝড় শুরু হবে। তার আগে স্থানত্যাগ দরকার। কিন্তু তীরে উঠেই রাঘব যে কোথায় গেল তার এখনও দেখা নেই। মনটা খারাপ, কানের লতি বেয়ে অবিরল ধারায় এখনও রক্ত ঝরছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমে কাঁধ ও বুক চটচট করছে—গ্রামবাসীরা সহসা দেখলে মনে করবে বুঝি-বা রঙ খেলেছে। তাছাড়া চিনে ফেলবার সম্ভাবনা আছে, রাঙামাটি থেকে রণসাগর কতদূরই—বা। লোকজনের যাওয়া-আসা আছে নিশ্চয় ও-গ্রামে; চিনতে পারলে খুড়োমশায়ের কানে উঠবে তার পলায়ন-সংবাদ, তিনি পাঠিয়ে দেবেন লোকজন—আদেশ অমান্য করা যাবে না, ফিরে যেতে হবে তাদের সাথে। অথচ ফেরার ইচ্ছা নেই তার। তেইশ বছরের ঘুমন্ত যৌবন জেগে উঠেছে, বিপুল বিক্রমে এ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ যুবক

সে, পেশীতে শিরায় রক্তে দুর্দমনীয় তেজ—ছুটকো দু-চারটে গুলি ছুঁড়ে যথাকর্তব্য সমাপন করা হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার অভিলাষ নেই আদৌ। মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে—সোজাসুজি মোকাবিলা করার জন্যে শরীর-মন তৈরি হয়ে উঠেছে। এ দস্যুতা—এ জুলুমবাজি—সর্বশক্তিতে এর জবাব দিতে না পারলে কোনো রাত্রেই ঘুম হবে না অতঃপর। ঘুম হবে না ইন্দিরা নামে ঐ মেয়েটির মুখখানি স্মরণ করে—তার চাহনি, তার দেহচ্ছন্দ, তার কণ্ঠস্বর অস্থির করে তুলবে। এমন একটি দেবী-প্রতিমার মতো মেয়েকে হরণ করে নিয়ে গেল কিনা তারই চোখের সামনে! আত্মধিক্কার দিতে ইচ্ছা হল তার। ধিক্কার এই পৌরুষকে, ধিক্কার তার শক্তির দম্ভকে। কতদূর যেতে পারে ফিরিঙ্গিরা? তাদের এই ক্ষুদ্র নৌকোর চেয়ে কী ফিরিঙ্গির কোশা জোরে চলে? দেখা হতে পারে না মাঝপথে?

আর রাঘবটা এ সময়ে গেল কোথায়?

ভানুমতীকে ঘিরে গ্রামবাসীরা যথারীতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাতে শুরু করেছে। ভানুমতী কাঁদছে আর এলোমেলোভাবে ঘটনাটা বিবৃত করে চলেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর কেউ প্রশংসা করে বলছে ঃ 'বলো কী গো ভানুদিদি, অতগুলো ফিরিঙ্গি আর দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ, তুমি পালিয়ে না গিয়ে কিনা ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে রইলে! যদি একটা গুলি এসে লাগত? যে গেছে সে তো গেছেই, মাঝখান থেকে তোমার প্রাণটা যেত।—ধন্যি সাহস বাপু।'

অন্যজন বললে, 'আমরা তো বন্দুকের আওয়াজ শুনে এ মুখোই হলুম না। কে বাবা শখ করে প্রাণ দেবে? একজনের জন্যে দশজন মরব?'

তৃতীয় জনের উক্তি ঃ 'মেয়েটা বড় ভাল ছিল—রূপে যেমন গুণে তেমনি। কিন্তু তা হলে কী হবে? ওর বাবা গঙ্গাধর গোস্বামী না আছে অর্থ না-আছে সামর্থ্য। সমাজপতিরা দয়া করে এতদিন সমাজে রেখেছে এই ঢের, না হলে ওই ধিঙ্গি মেয়ে এমনিতেই পতিত হত। ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে গিয়ে ওর বাবাকে রক্ষা করে গেছে যাই বলো বাপু—'

খটাস করে বন্দুকটা তুলল সূর্যকান্ত—লোকটার মাথা লক্ষ্য করে তাক করল। প্রাণভয়ে লোকগুলো হইচই করে উঠল।

'ওরে বাবা, এ আবার কে রে! বলা-নেই কওয়া-নেই বন্দুক চালায় যে!'

ওরা চিনতে পারেনি। ভালই হয়েছে।

সূর্যকান্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'চোপ রও বেয়াদপ। ভীরু, কাপুরুষ, নরকের কীট। তোমাদের গুলি করে মারাই উচিত।'

রাঘব সেই সময় বেরিয়ে এল পাশের জঙ্গল থেকে। তার হাতে কতকগুলো গাছগাছালির পাতা—তালুতে চটকাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললে, 'করছেন কি মহারাজ? বন্দুক নামিয়ে নিন। এতে কি গুলি আছে? সব তো

খতম হয়ে গেছে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়ায়ে।'

তা বটে। মনে ছিল না।

আত্মসংবরণ করে সূর্যকান্ত বললে, 'তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

'আপনার রক্ত বন্ধ হচ্ছে না—গিয়েছিলুম গাছের পাতা সংগ্রহে। মাথাটা নামান, লাগিয়ে দিই—'

গাছের পাতার রস থাবড়ে দিল রাঘব তার ক্ষতস্থানে।

সূর্যকান্ত বললে, 'অনেক দেরী হয়ে গেল, চল্ শিগ্‌গির—'

ওরা ফিরে এসে নৌকো ভাসিয়ে দিল জলে।

'কোথায় যাবেন মহারাজ?'

নৌকো বাইতে বাইতে জিজ্ঞেস করল রাঘব।

'শোন্ এতদিনে একটা কাজ পেয়েছি।' সূর্যকান্ত জলের ঘূর্ণাবর্তের পানে তাকিয়ে বললে, 'সত্যিকারের কাজ। আমি মেয়েটির সন্ধানে সপ্তগ্রামে যাব।'

'বলেন কি!' রাঘব যেন শিউরে উঠল : 'সেখানে যে ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব। তার মধ্যে কোথায় তাকে খুঁজে পাবেন?

'খুঁজলেই পাব।' সূর্যকান্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'তুই বাধা দিসনে। আমি একা যাব সপ্তগ্রাম।'

'না-আছে অস্ত্রবল না-আছে লোকবল।' রাঘবের কণ্ঠস্বরে তেমনি দৃঢ়তা : 'আপনি একাকী সপ্তগ্রামে যেতে পারবেন না।'

'বেশ।' সূর্যকান্ত ভেবে নিল এক মুহূর্ত, বললে 'তুই তীরে নেমে রণসাগরে চলে যা। আমাদের রাজ-পুরোহিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সাথে চুপিচুপি দেখা করবি, তিনি আমার শুভাকাঙ্খী, তাঁকে আমার কথা খুলে বললে তিনি লোকবল-অস্ত্রবল সব সংগ্রহ করে দেবেন। দেরি না করে, তখনি আবার চলে আসবি। আমি সপ্তগ্রাম আছি—'

'আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না?'

'রাঘব খুতখুত করতে লাগল।'

'ততক্ষণে কোশা অনেক দূর চলে যাবে।' সূর্যকান্ত তার সিদ্ধান্তে অবিচলিত : 'আমি ওদের পেছনে পেছনে যেতে চাই। চিন্তা করিসনে, আমি এত নির্বোধ নই যে একা ওদের সঙ্গে লড়তে যাব। বাবার পরিচিত কিছু কিছু পদস্থ মুসলমান ব্যক্তি সপ্তগ্রামে আছেন, তাঁদের খুঁজে বার করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। তুই দেরী করিসনে। এইখানে নেমে যা। ভাবিসনে কিছু—'

অনিচ্ছার সঙ্গে নৌকো ভেড়ালো রাঘব। উজানে ভেসে চলল সূর্যকান্ত একা।

।। দুই।।

দু ঘণ্টাও কাটেনি—রাঙামাটির চণ্ডীমণ্ডপে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের ইষ্টক নির্মিত বেদীর ওপরে বসেছে সমাজপতিদের সভা। সকলেই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, কণ্ঠে শুভ্র উপবীত, মাথায় দীর্ঘ শিখা। আলোচনার বিষয়টি যে গুরুতর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, নইলে ভবতোষ ভট্চায উদ্যোগী হয়ে ডাক দিতে না-দিতেই এতগুলি-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ উৎসাহী হয়ে তৎক্ষণাৎ একত্রিত হবেন কেন? সামাজিক আহ্বানে সকলে যে বিশেষ তৎপর তা বেশ বোঝা যায়।

সমাজপতিরা দলবদ্ধ হতে না-হতেই ভবতোষ ভট্চায বিস্ফারিত হলেন। তাঁর বহুদিনের আক্রোশ যেন ফেটে পড়ল ঃ 'গদাধরকে এবার দেখে নেবো। আমার বেলায় খুব শাসন করেছিল, ভেবেছিল এক মাঘে শীত পালায়। কিন্তু তা হয় না। ধর্ম আছেন, মাথার ওপর ভগবান আছেন। আমার মতো সৎ ব্রাহ্মণকে শাসন করে একঘরে করা? দর্পহারী মধুসূদন তুমি সত্য! এবার কে তোকে রক্ষা করে দেখি—'

উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বললেন, 'ওহে ভবতোষ, এখন কি করা যায় সে কথা বলো।'

'আবার কি। গোঁসাই আমার বেলা যে ব্যবস্থা করেছিল এক্ষেত্রে তারও সেই ব্যবস্থা।' ভবতোষ ভট্চায দাপটের সঙ্গে ঘোষণা করলেন ঃ 'আজ থেকে গদাধর গোঁসাইয়ের হুঁকো বন্ধ, নাপিত বন্ধ, রজক বন্ধ। এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর হতেই পারে না।'

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বললেন, 'সংসারে তো আর কেউ নেই—ধোপা-নাপিত বন্ধ করলে ও-বেচারী যাবে কোথায়?'

'চুলোয় যাক। ও-সব কথা ভাবলে সমাজ রক্ষা হয় না।' ভবতোষ ভট্চাযের তেমনি ক্ষমাহীন উদগার ঃ 'বৈরাগী হয়ে না-হয় বৃন্দাবনে চলে যাক। এত বড় পাপ কী সমাজে ঠাঁই দেওয়া যায়? এটা হিন্দু সমাজ—আমরা যদি আমাদের কুলমান রক্ষা না করি তাহলে কে করবে? গোঁসাই প্রশ্রয় পেলে সমাজে পাপ বেড়ে উঠবে, তখন সামলাবে কে? তুমি?'

তৃতীয় ব্রাহ্মণ ঘাড় নেড়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'যথার্থ। ঠিক বলেছ ভট্চায। পাপের সাজা নিষ্ঠুর ভাবেই হওয়া উচিত। গদাধর গোস্বামীর অবিবাহিতা যুবতী-কন্যাকে যখন ফিরিঙ্গিতে ধরে নিয়ে গেছে তখন দোষ পিতৃকুলেই স্পর্শ করেছে বটে—'

'তাহলে?'

'সাজা পেতে হবে—'

'আপনি মত দিচ্ছেন?'

'অগত্যা—'

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ বললেন, 'বড্ড কঠোর শাস্তি হয়ে যাচ্ছে না?'

'কঠোর কিসে?' ভবতোষ ভট্‌চায হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'এসব বিষয়ে গুরুতর দণ্ড বিধান না করলে ফল কী হতে পারে ভেবে দেখেছেন?—কিছুদিন পরে ওই গদাধর গোস্বামী সমাজের বুকে পদাঘাত করে ফিরিঙ্গি-জামাই ঘরে নিয়ে এসে আমাদের চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। তখন সে-দৃশ্য মধুর ঠেকবে, কী বলেন বাচস্পতি ঠাকুর?'

'তাই তো।' বৃদ্ধ বাচস্পতি ঠাকুর মাথা চুলকোতে লাগলেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ পঞ্চম জনকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে তারিণী, চুপচাপ কেন? তোমার কী মত বলো?'

তারিণী বললেন, 'আমি কি বলব। তোমরা একটা সিদ্ধান্তে এলেই হল। তোমরা যা বলবে তাতেই আমার সম্মতি আছে।'

চতুর্থ ব্রাহ্মণ বললেন, 'এ বেশ কথা। শুধু বাচস্পতি ঠাকুর—'

ভবতোষ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন, 'এ-রকম একটা গুরুতর ব্যাপারে আপনারা একমত হতে পারছেন না এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে? আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইনে—শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখতে চাই যে আপনারা যদি ওকে সমাজচ্যুত না করেন তাহলে আমি আত্মহত্যা করব এবং প্রত্যক্ষত ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবেন আপনারা সবাই।'

তৃতীয় ব্রাহ্মণ, যিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন, হই হই করে বললেন, 'সে কি কথা ভবতোষ, তুমি আমার দশ-রাত্রির জ্ঞাতি, তোমাকে ছেড়ে আমি কী ওই সুবর্ণ-বণিকের ব্রাহ্মণ গদাধরের পক্ষ অবলম্বন করতে পারি? এই সামান্য ব্যাপারে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? স্থির হয়ে শান্তভাবে আলোচনা করলেই তো হয়।'

'স্থির হতে দিচ্ছেন কই আপনারা?'

'কেন?'

'যেটা এক-কথায় মিটে যেতে পারে সেখানে মতান্তর হলে—'

'মিটে তো গেছে।'

'তাহলে গোঁসাই সমাজচ্যুত হয়েছে বলুন।'

'একশোবার।'

বলে সামনে তাকিয়ে দেখলেন, একজন দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চণ্ডীমণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়ালেন, অভিবাদন করে বললেন, 'তর্ক করে আর লাভ নেই। স্বয়ং তর্করত্ন মশায় এসে গেছেন। আমাদের সমাজের মাথা। তিনি যা বলেন, তাই হবে।'

অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা অভিবাদন করে বসবার জায়গা ছেড়ে দিলেন. সভার রূপ বদলে গেল। আসন গ্রহণ করে তর্করত্ন জিজ্ঞাসা করলেন, 'দূর থেকে তোমার গলাই বেশি শোনা যাচ্ছিল ভবতোষ, বলি ব্যাপার কী হে? কী বিষয়ে আলোচনা?'

তর্করত্ন মহাশয়ের আকস্মিক উপস্থিতিতে ভবতোষ ভট্‌চায বিশেষ খুশি হননি তা বোঝা গেল তাঁর নিরুত্তাপ-মৃদুস্বর প্রত্যুত্তরে: 'আপনি শুনেছেন কি না জানি না, আজ একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের গ্রামে। অবশ্য একে ভবিতব্য বলতে পারেন। গোঁসাইজির কন্যা ইন্দিরাকে ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে গেছে—'

'বলো কি! শুনিনি তো! কখন্ ধরে নিয়ে গেল?'

'এই দণ্ড দুই আগে।'

'গদাধর শুনেছে?'

'শুনেছে বৈকি।' ভবতোষ দরাজ গলায় বললেন, 'আমি নিজে গিয়ে শুনিয়ে এসেছি।'

'মহৎ কাজ করেছো।' তর্করত্নের গলা গাম্ভীর্যে, থমথম করে উঠল, কিন্তু তোমরা বৃদ্ধের দল এখানে বসে 'কী শলা-পরামর্শ করছ?'

'আজ্ঞে সমাজরক্ষার ব্যবস্থা করছি।' ভবতোষ বিনয়ে বিগলিত।

'সমাজরক্ষা?' তর্করত্ন সহসা ক্রোধে ফেটে পড়লেন, 'সেটা খুব জরুরী, না?—দস্যুতে ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে এখানে বসে সমাজরক্ষা করছ, তোমরা পুরুষ না মেয়েমানুষ? ছি, ছি, এই অকর্মাদের জন্যেই হিন্দুসমাজ রসাতলে যাবে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মুকুটমণি হয়েছ তোমরা, কুলীন সমাজের অগ্রণী—এ না হলে অগ্রগতি! তা সমাজরক্ষার কী ব্যবস্থা হয়েছে শুনি?'

তাঁর তীব্র তিরস্কারে সকলেই অধোবদনে রইলেন। কেবল ভবতোষ ছটফট করে উঠলেন উষ্মায়। কেউ কথা বলছেন না দেখে তিনি অন্তরের উষ্মা দমন করে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'এক্ষেত্রে যা বিধান তাই করা হয়েছে। গোস্বামীর ধোপা-নাপিত বন্ধ করেছি।'

তর্করত্ন শান্ত চোখে তাঁর পানে তাকালেন, 'গোস্বামীর অপরাধ?'

'বা, তাঁর অবিবাহিত কন্যাকে ফিরিঙ্গিতে ধরে নিয়ে গেল, সমাজ তার কোন প্রতিবিধান করবে না?' ভবতোষ ঈষৎ বিরক্ত: 'কঠোর শাস্তি বিধান না করলে সমাজ অধঃপাতে যাবে যে! কে বলতে পারে দশদিন পরে গোঁসাইজি ফিরিঙ্গি-জামাই ঘরে এনে আমাদের নেমন্তন্ন করে বসবে না?'

'হুঁ', তুমি অনেকদূর চিন্তা করতে পার দেখছি। যথার্থ দূরদৃষ্টি তোমার আছে—সমাজরক্ষা তোমাকেই মানায়!' তর্করত্ন গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'কিন্তু ভবতোষ, একটা কথা বল দেখি, গদাধর কী ফিরিঙ্গি নিমন্ত্রণ করে এনে তার কন্যা সম্প্রদান করেছে?'

'তা অবশ্য করেনি—'

ভবতোষ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'তবে?'

'তাঁর কন্যা গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল,' তাঁকে বলতেই হল, 'ফিরিঙ্গিরা ঘাট থেকে ধরে নিয়ে গেছে—'

'তাহলে গদাধরের অপরাধ কোথায়?'

'অবিবাহিত কন্যাকে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি ধরে নিয়ে গেছে,' ভবতোষের উত্তর ঃ 'তাতে পিতৃকুলের দোষ হবে না?'

'এই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান?' তর্করত্নের কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক ঃ 'শাস্তি দিতে যাচ্ছ অথচ পিতৃকূলের অপরাধ খুঁজে পাচ্ছ না।—এইমাত্র বলতে পার যে কন্যা গঙ্গাস্নানে যায় কেন? তার উত্তরে আমি বলছি, এ সমাজে কার মাতা কার বনিতা কার ভগিনী গঙ্গাস্নানে না গিয়ে থাকে? গঙ্গাস্নান পূণ্যকর্ম, সকলেই যায়। ঘাটে যদি অঘটন ঘটে থাকে তাদের রক্ষা করার বেলা কেউ নেই, শাস্তি দেবার বেলা দশ-মাথা এক। চমৎকার ব্যবস্থা!'

সকলেই চুপ। কারো মুখে কথা নেই।

কিন্তু ভবতোষ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত বানচাল হয়ে যায় দেখে বাধ্য হয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু সমাজ বলে একটা কথা, তা রক্ষার উপায় কী হবে?'

'সমাজ বিপন্ন হলে তবে তো রক্ষার কথা ওঠে। সমাজের তো কোন হানি হয়নি।' তর্করত্ন আরও গম্ভীর, বললেন, 'দেখ ভবতোষ, শাস্তি দিতে তুমি কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ তা আমার অজানা নয়। ঘটনাক্রমে গদাধর সেবার ছিল আমাদের সঙ্গে, তাকে দুকথা বলতে হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে, কিন্তু তা অসংগত হয়নি; আমরাও সেইভাবে বিচার করে তোমাকে শাস্তি দিয়েছিলাম। সবাই জানি তোমার ভগিনী স্বেচ্ছায় মুসলমানের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিল, তুমি তাকে গৃহে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলে বলেই তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করে সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। —দুটো ঘটনা এক নয়। গদাধরের কন্যা স্বেচ্ছায় ফিরিঙ্গির সঙ্গে চলে যাননি এবং গদাধর এখনো অবধি তাকে ফিরিয়ে আনবার কোনো চেষ্টাই করেননি। করেছে কী?'

ভবতোষ উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা বললেন, 'কই তেমন কিছু তো শুনিনি। আসবার সময় দেখে এলাম হাউ হাউ করে কাঁদছে আর পাগলের মতো প্রলাপ বকছে। তার মাথার ঠিক নেই।'

তর্করত্ন দুঃখের হাসি হেসে বললেন, 'সমাজের কোন হানি হয়নি তবু তোমরা সমাজরক্ষার ব্যবস্থা করেছ। উত্তম কথা। কিন্তু বৃদ্ধ অপুত্রক গদাধরের একমাত্র কন্যা দস্যুকর্তৃক অপহৃতা হয়েছে, তার উদ্ধারের কী কোনো ব্যবস্থা করেছিলে?'

'বন্দুকের গুলির শব্দ কেউ কেউ শুনেছিলুম,' এক ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'সেই গোলাগুলির সামনে কে এগোবে বলুন? ফিরিঙ্গি হার্মাদ তো যে-সে দস্যু নয় যে লাঠিয়াল পাঠিয়ে লড়াই করা যাবে। আমরা তো কোন্ ছার, ফৌজদার সুবাদার অবধি ফিরিঙ্গিদের ভয়ে কম্পমান—'

তর্করত্ন ভেবে দেখলেন, কথাটা মিথ্যা নয়। বাস্তবিক ফিরিঙ্গিদের প্রচণ্ড দাপট।

'কিন্তু গোস্বামীকে জাতিচ্যুত করা উচিত।'

ভবতোষ শেষবারের মতো ছোবল বসাবার চেষ্টা করলেন।

ক্ষেপে উঠলেন তর্করত্ন, তীব্রস্বরে বললেন, 'তুমি মানুষ না পাষাণ, ভবতোষ? মানুষের উপকার করতে পার না কিন্তু অপকারের জন্যে মুখিয়ে আছো। অভাগিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে তার পিতাকে জাতিচ্যুত করতে চাও।—নারায়ণ। এই ব্রাহ্মণসমাজ রসাতলে যায় না কেন?'

ভবতোষ আর সাহস পেলেন না—কুঁকড়ে গেলেন তিরস্কারে।

'রসাতলে অনেকদিন গেছে তর্করত্ন, এটা সমাজের কবন্ধ।'

বিকৃত, ভাঙা গলা। সকলে তাকিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধ গদাধর গোস্বামী অর্ধনগ্ন অবস্থায় এগিয়ে আসছেন, বেশবাস বিস্রস্ত। চোখে উন্মাদের মতো অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি, চুল এলমেলো, পদক্ষেপ ক্লান্ত। তিনি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে দাঁড়াতেই তর্করত্ন তাঁকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে ফেললেন। নীরব সহানুভূতি পেয়ে বৃদ্ধ এতক্ষণ পরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। সেই অবসরে কুলীনকুলচূড়ামণি ভবতোষ ভট্‌চায গা ঢেকে দিলেন।

তর্করত্নের স্কন্ধে মাথা রেখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে গদাধর গোস্বামী বললেন, 'ভাই, ইন্দিরা আমার সারাদিন উপবাসী ছিল, ব্রত সাঙ্গ করে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল দাসী সঙ্গে নিয়ে, সেই অবস্থায় দুর্বৃত্ত ফিরিঙ্গি ধরে নিয়ে গেছে। আহা, মা আমার কত কষ্ট পাচ্ছে। যতই ভাবি, মাথার ভেতরটা

গোলমাল হয়ে যায়। জগতে এমন কে আছে যে ওই দস্যুদের হাত থেকে আমার মাকে উদ্ধার করে আনে?'

তর্করত্ন সান্ত্বনা দিলেন, 'তুমি একটু শান্ত হও ভাই। ঈশ্বর রক্ষা করবেন। এত বিচলিত হলে কী চলে?'

'শান্ত হতে পারছি না যে!'

'নারায়ণকে ডাকো।'

'ভাই, সে মনঃসংযোগ আর নেই। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'চলো তোমায় বাড়ি রেখে আসি।'

'বাড়ি গেলে পাগল হয় যাব। যেদিকে তাকাই সেখানে ইন্দিরার স্মৃতি। এ যে কী জ্বালা—'

'এভাবে তো পথে পথে ঘুরতে পারো না। চলো আমি যাচ্ছি।'

তর্করত্ন ক'পা এগিয়ে আসতেই রাঘবের সঙ্গে দেখা। রাঘব নদীতীর ধরে রণসাগরে যাচ্ছিল। শরীরে ক্ষতের চিহ্ন—রক্তধারা তখনও বন্ধ হয়নি। সামনে ব্রাহ্মণ দেখে সে প্রণাম করে এগিয়ে যাচ্ছিল তর্করত্ন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে তো এ গ্রামের অধিবাসী বলে মনে হচ্ছে না বাপু। হন্তদন্ত হয়ে চলেছ কোথায়?'

রাঘব থেমে যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে বললে, 'ঠাকুর মশাই যথার্থ অনুমান করেছেন, আমি এ গ্রামের বাসিন্দা নই। থাকি রণসাগরে, সেখানেই যাচ্ছি—'

'তুমি আঘাত পেলে কোথায়?'

'ফিরিঙ্গিদের সাথে যুদ্ধে—'

'কখন যুদ্ধ হল?'

'দণ্ড দুই পূর্বে। এখানকারই ঘাটে। এক কন্যা উদ্ধার করতে গিয়ে।'

'তবে সে আমারই হতভাগিনী কন্যা ইন্দিরা—'

আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন গদাধর গোস্বামী।

'হ্যাঁ সেই নামই শুনেছি বটে। ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে গেছে—'

'এখন কোথায় চলেছ?'

'আমার প্রভু ফিরিঙ্গিদের সেই কোশা অনুসরণ করেছেন।' রাঘব বললে, 'তাঁর নির্দেশে রণসাগরে চলেছি লোকবল অস্ত্রবল সংগ্রহে। এ অত্যাচারের প্রতিবিধান দরকার—'

'ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।'

রাঘব প্রণাম জানিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে চলল।

তর্করত্নের সঙ্গে গদাধর গোস্বামী গৃহাভিমুখী হলেন।

পশ্চাতের অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বললেন, 'কি হে বাচস্পতি, কী রকম বুঝছ?'

বাচস্পতি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'গোস্বামীকে সমাজচ্যুত করা অসম্ভব—'

'ভবতোষ কী করে আত্মঘাতী হবে?'

বাচস্পতি বললেন, 'হলেই ভাল। কিন্তু হবে না। ওরা আত্মঘাতী হতেও জানে না—'

'যা বলেছ। চলো ওঠা যাক। বেলা বড় উওপ্ত হয়ে উঠেছে।'

।। তিন।।

ছোট নৌকো—স্বচ্ছন্দে ভেসে যাচ্ছিল ডাঁটার টানে আর হালের ঘায়ে। রাঘবের মতোই দক্ষ নৌচালক সূর্যকান্ত। সে দৃঢ়হাতে ধরে আছে হাল।

মাথার ওপরে মধ্যাহ্নসূর্যের খর উত্তাপ—চৈত্রের আকাশ যেন গঙ্গার বুকে জ্বালা জুড়াতে নেমেছে। দৃষ্টি তুলে তাকানো যায় না সূর্যের দিকে—চোখ বুঝি ঝলসে যাবে। কোনোদিকেই তাকাবার ইচ্ছা নেই সূর্যকান্তের, সে প্রাণপণে হাল ধরে ডাঁটার টানে যতদূর-সম্ভব দ্রুত গতিতে নৌকো চালনা করছিল আর ভাবছিল, সে কী খুব পিছিয়ে পড়েছে? জোরে—আরও জোরে চলছে না কেন তার নৌকো খানা। হার্মাদদের কোশা কতদূর এগিয়ে আছে? এখনও পর্যন্ত তাদের নাগাল পাওয়া গেল না—দেখা গেল না সেই বড় কোশার অস্তিত্ব। তখন কূলে উঠে খোঁজ-খবর না নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলেই ছিল ভাল, দেরি হল মিছিমিছি। সপ্তগ্রাম অবশ্য অনেকদূর, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক জলপথে দুদিনের আগে কেউ পৌছুতে পারবে না। কিন্তু কোশা যদি চোখের বাইরে চলে যায় তাহলে বেশ বেগ পেতে হবে খুঁজে পেতে। কতক্ষণেরই-বা সাক্ষাৎ। সেই ক-মুহূর্তেই চোখ ঝলসে গেছে দেবী-প্রতিমার মতো রূপে, তার দৃষ্টি মনে হয়েছিল গঙ্গার জলে চৈত্র-আকাশের মতো স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল, যেন বাঙ্ময়। সামান্য ক্ষণের চোখাচোখিতে দুলে উঠেছিল বিশ্ব-ভুবন। দূর বনানীর মতো ঘন কৃষ্ণ মাথার চুল, জোয়ারের গঙ্গার মতো হরিদ্রাভ গায়ের রঙ, তার সঙ্গে রক্তাভা মিশে যেন দান করেছে অপরূপ মহিমা। সংগীতের মতো সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। সে নিজে সংগীতগুণী, সংগীতে তার আবাল্য আকর্ষণ, কিন্তু নারী-কণ্ঠের সংগীতের এমন স্পষ্ট ঝংকার ইতিপূর্বে কর্ণগোচর হয়নি। 'হরি, মধুসূদন, রক্ষা করো—' যদিও আর্ত, বিপন্ন স্বর, তবু অন্তর্নিহিত সুর-মাধুরীটুকু এখনও কানে লেগে রয়েছে। হরি বা মধুসূদন রক্ষা করেননি, তাঁরা ক্বচিৎ এ কাজ করে থাকেন। সূর্যকান্তের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কিন্তু অতি-ভক্তি নেই, অন্ধের মতো, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। তার যৌবন তার কাছে ঈশ্বরের মতো, সে যৌবন-শক্তি ও বিবেক-বিচারে অধিক বিশ্বাসী, সে মনে করে মানুষের কর্মে ও মর্মে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান।

কিন্তু মেয়েটি সদ্বংশজাত ও ব্রাহ্মণকন্যা—ঈশ্বরে অগাধ নির্ভরতা থাকা স্বাভাবিক। বিপদে ডেকেছে তাই ঈশ্বরকেই—অন্যায় নয়, অসঙ্গত নয়। সূর্যকান্ত মনে মনে যেন ক্ষমা করে ফেলল। তখন অন্য কাকেই বা ডাকতে পারত? ঘাটে কে ছিল সে সময়?—দাসীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে বক্র মনোভাব দেখা দিয়েছিল এখন সেকথা মনে পড়তে লজ্জা হল। ছিছি, ভাগ্যিস ব্যক্ত করেনি!

কী যেন নাম? ইন্দিরা—ভারি সুন্দর নাম। জল কেটে যাচ্ছে নৌকোর তলা দিয়ে, স্রোত ঘুরে গেছে, ছলছল জলের শব্দে বেজে উঠছে ওই নাম ঃ 'ইন্দিরা—ইন্দিরা—ইন্দিরা—'

কে ডাকছে? সূর্যকান্তের অন্তর নাকি? তার নিভৃত মনের অস্ফুট ডাক বেজে উঠছে নদীব জলে? কিন্তু ডাকতে ভাল লাগছিল।'

সূর্যকান্ত অস্ফুট মন্ত্রপাঠের মতো ডাকল, 'ইন্দিরা—ইন্দিরা—ইন্দিরা'

যেন চেতনায়, মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল এই ডাক। শিহর জাগল। নামের কী ওজস্বীশক্তি।

ই-ন্-দি-রা—গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল মনের অতলে, যেন স্পর্শসুখ পাওয়া যাচ্ছিল উচ্চারণের সাথে সাথে। সংগীতের রাগ-রূপের মতো প্রতিটি শব্দ যেন অস্থি-মাংসে সংগঠিত হয়ে পরিপূর্ণ একটি শরীর-রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং জলের ধারায়, রোদের ঝলকে, সেই হাসিভরা মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাছিল। হাতের কাছে, গৈরিক জলে, পদ্মের মত মুখখানা ফুটে রয়েছে। যেন হাসতে হাসতে নৌকোর সঙ্গে চলেছে সাঁতরে। কিন্তু কতক্ষণ সাঁতার দেবে এভাবে? মুখখানা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে—ঢেউ আসছে বড় বড়। নৌকো পাক খাচ্ছে অন্ধের মতো। ধরে রাখা যাচ্ছে না—টলমল করছে স্রোতের বেগে। তবু দৃষ্টি সরাতে পারল না সূর্যকান্ত, ঝুঁকে ডাক দিল, 'উঠে এসো, আমার নৌকোয় উঠে এসো ইন্দিরা। আমি তোমাকে—'

কখন বান এসেছে—খেয়াল করেনি সূর্যকান্ত। জলের মরীচিকায় তার কল্পনাপ্রবণ মন মিশে গিয়েছিল একাত্ম হয়ে। নৌকো টলমল করছিল আগেই—এখন একটি তরঙ্গাভিঘাতে উলটে গেল একেবারে। নৌকো-গহ্বর থেকে কোনোমতে বেরিয়ে স্রোতে সাঁতার কাটতে লাগল অসহায়ের মতো। বিপুল টানে বানে ভাসিয়ে নিয়ে চলল একঘাট থেকে অন্য ঘাটে।

সে ভেসে যাচ্ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। আর উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে আসছিল একখানি দীর্ঘকায় অতিপ্রশস্ত বজরা। বেশ বড় বজরা। মাঝির সংখ্যা অনেক। ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা এইসব বজরা ব্যবহার করে থাকে। বানের জন্যে বজরাটা ছিল মাঝঃগঙ্গায়—বান চলে যাবার পর স্রোতের বিরুদ্ধে ভেসে আসছিল ধীরে মন্থরে। অনেকগুলো বৈঠা পড়ছিল—জলে শব্দ উঠছিল বিচিত্র।

আমিরী চালে বজরাটা কিছুদূরে চলে আসার পর, মাঝিদের মধ্যে একজন দেখতে পেল—দূরে কালো একটা বিন্দুর মতো কি-যেন ভাসছে। ভাবল, কাঠজাতীয় কিছু হবে—বানের জলে কত-কি ভেসে আসে। আঁধার তাকাতেই পিঠ টান করে বসল মাঝি—স্রোতের টানে বিন্দুটা অনেক কাছে এসে গেছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল কাঠ নয়, মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়ছে—নেতিয়ে পড়েছে সম্ভবত—সর্বনাশ! সে তাড়াতাড়ি দাঁড়ের মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং বজরা চালনা করতে বললে ভাসমান কালো বিন্দুটা লক্ষ্য করে।

বজরার গতি পরিবর্তিত হল এবং শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসতে লাগল সূর্যকান্তের দিকে। হাঁপিয়ে গিয়েছিল সূর্যকান্ত—জল খেয়ে ফেলেছিল ক-ঢোক্। কূলে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্রোতের টানে পিছলাতে পিছলাতে দূরে—ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল। সাঁতার কাটার শক্তি প্রায় নিঃশেষ, বানের স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে হলে অপরিমিত শক্তি দরকার—সূর্যকান্ত দক্ষ সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও উপর্যুপরি কয়েকবার স্রোতের ঝাপটায় নিতান্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এটা আকস্মিক বিপদপাত, সে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। দুঃখ হচ্ছিল নিজের নৌকো আর বন্দুকটার কথা ভেবে। সপ্তগ্রাম যাবে সে কিসে এবং দুর্দান্ত হার্মাদের সাথে লড়বে কোন্ অস্ত্রবলে?— সে মাথা তুলল এবং দেখতে পেল একটা বড় মহাজনী নৌকো ভাসছে দূরে। মহাজনী নৌকোই মনে হল তার। আশার সঞ্চার হল। হাত নেড়ে জানাল সে বিপদগ্রস্ত—উদ্ধার চায়। বজরার গতিপথ পরিবর্তিত হল এবং তার কাছে এসে ভাসতে লাগল। মাঝিদের সহযোগিতায় সে বজরায় উঠল।

দ্বিধা যে ছিল তা নয়—কিসের বজরা কাদের বজরা কে জানে। কিন্তু আশ্বস্ত হল এই দেখে যে সমস্ত মাঝি এদেশীয় এবং সকলের চোখে-মুখে সহানুভূতি ও উৎকণ্ঠার ভাব। এটা বিজাতীয় হার্মাদের কোশা নয়। স্বস্তি পেল সূর্যকান্ত।

যে মাঝি জল হতে তাকে তুলেছিল সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন বোধ করেছেন কেমন?'

সূর্যকান্ত বললে, 'ভাল—'

'জলে পড়লেন কী করে?'

'বানে নৌকো ডুবে গিয়েছিল—'

'বান দেখে সাবধান হতে পারেন নি? মাঝির কণ্ঠে মৃদু ভর্ৎসনা : 'বানের সময় কেউ কূল ছেড়ে নৌকো চালায়? — যদি আমরা দেখতে না পেতুম!'

'ভাগ্য বলতে হবে।' সূর্যকান্ত ওর উৎকণ্ঠায় মৃদু হাসল, বুঝতে পারল মাঝিরা সৎ ও সহৃদয় : 'ভাগ্যিস দেখতে পেলে—না হলে আরও কতক্ষণ সাঁতার কাটতাম কে জানে। তা, তোমরা চলেছ কোথায়?

'সপ্তগ্রামে।'

'বটে। পথে কোন কোশা দেখেছ?'

'না।'

'কোশা—মানে বড় নৌকো—'

মাঝি হেসে বললে, 'আজ্ঞে কোশা কাকে বলে তা আমরা জানি। কোশা বা গরাব কিছুই আমাদের নজরে পড়েনি।'

'হুঁ—'

মাঝি বললে, 'আপনার কানের লতি জখম হয়েছে দেখছি—অনেকক্ষণ জলে থাকার দরুন ক্ষতস্থানে রক্ত ঝরছে। আপনি আহত হলেন কী করে?'

কোশার সংবাদ না পাওয়ায় সূর্যকান্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে যুদ্ধে—'

মাঝি বিস্মিতঃ 'কোথায় যুদ্ধ বাধল?'

সূর্যকান্তের উত্তর দেবার ইচ্ছা ছিল না, সে চিন্তা করছিল। শুধু বললে, 'মকসুদাবাদের কাছে রাঙামাটিতে?'

'কেন?' মাঝির জিজ্ঞাসা ঃ 'তারা কী আপনার নৌকোয় হামলা করেছিল?'

'না—'

'তবে?'

সূর্যকান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, 'তারা আমার এক আত্মীয়কে ধরে নিয়ে গেছে—'

'কী করে?'

'ঘাটে স্নান করতে এসেছিল—'

'তাই কোশার সন্ধান করছিলেন?'

'হাঁ—'

'একা লড়তে পারলেন?'

'সহায় জুটে যেত। আমার মতো আরও অনেকের আত্মীয়া অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে হার্মাদরা—তাদের সাহায্য পেতাম।' সূর্যকান্ত চিন্তা করছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কোথায় যাবে বললে? সপ্তগ্রাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'তোমাদের মনিব কে? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে?'

'নিশ্চয়। দাঁড়ান খবর দিচ্ছি—'

বলে মাঝি বজরার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল এবং অল্পক্ষণ পরে এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সাথে ফিরে এল।

প্রৌঢ়ের বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে—কিন্তু কর্মঠ বলিষ্ঠ গড়ন। লম্বা, দোহারা চেহারা,

মাথায় পরিপাটি সুবিন্যস্ত চুল, তাতে রূপোলি আভাস আছে। দাড়ি নেই কিন্তু সুস্পষ্ট সুদীর্ঘ গোঁফ, পরনে ধুতি ও কামিজ। সহসা দেখলে রাজপুত বলে মনে হয়। বিস্তৃত বক্ষোপট, বলদৃপ্ত সাহসী পদক্ষেপ। মুখমণ্ডল ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক—বীরত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি। কণ্ঠস্বরে ভুল ভাঙ্গল, রাজপুত নন, বাঙালি। উদাত্ত কণ্ঠস্বর, ভরাট। কাছে এসে তিনি ক-মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তারপর বললেন, 'যুবক, তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছি, মনে হয় তুমি বীর, বলি অস্ত্র ধরতে জানো?'

সূর্যকান্ত বললে 'জানি—'

'বন্দুক ধরতে পারো?'

'পারি—'

'সাহস আছে?'

'অন্তত ভয় নেই। ভয় থাকলে হার্মাদদের সাথে লড়াই করি?'

'যথার্থ। তোমার সাহসের প্রশংসা করি। এই রকম একটি যুবক আমি খুঁজছিলাম। আমাদের শক্তি ও সাহস আরও বাড়ল। খুশী হলাম তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। —কী নাম?'

'সূর্যকান্ত—'

'কী জাত?'

'ব্রাহ্মণ—'

'তাহলে তো আপনি আমাদের পূজ্য। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন—'

বাধা দেবার আগেই প্রৌঢ় নত হয়ে তার পদধূলি গ্রহণ করলেন।

সূর্যকান্ত বললে, 'ছি ছি আপনি আমাকে বড় লজ্জায় ফেললেন। আমার জীবনদাতা হয়ে—'

প্রৌঢ় বললেন, 'ঠাকুর, আপনি ভেতরে আসুন। দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়—নিশ্চয় ক্ষুবকাতর হয়ে পড়েছেন। ভেতরে রন্ধনাদির সমস্ত প্রকার আয়োজন আছে, আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'আপনারা?'

'অনেকক্ষণ চুকে গেছে। আসুন—'

বাস্তবিক ক্ষুধা পেয়েছে—অস্বীকার করা যায় না। রাঘবের হাতের রান্না আজ জোটেনি—সকালে নিহত পক্ষীগুলির জন্যে শোক করা বৃথা—নৌকো ডোবার সাথে সাথে তারা কোথায় ভেসে গেছে। ওগুলো না মারলেই হত—মিছিমিছি প্রাণী হত্যা। উদর শূন্য—আহার জোটেনি সারাদিন একথা সত্য। রাঘব থাকলে পাখির মাংস রাঁধত সে আর তাকে চড়াতে হত ভাত। ছুঁৎমার্গ—জাতি-রক্ষার ধারাবাহিকতা। ব্রাহ্মণ হিসাবে অতিরিক্ত মর্যাদা ও সম্মান-লাভের ব্যবস্থা। রাঘব তার আজন্মের অনুচর ও সঙ্গী, পিতার আমলের বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ

ভৃত্য সে-ই শোনেনি—এঁরাই-বা শুনবেন কেন? প্রণাম ও অভ্যর্থনার ঘটা দেখে তো মনে হয় এঁরা অব্রাহ্মণ, কিন্তু অভিজাত শ্রেণী, ভদ্র ও বিনয়ী। আশ্রয় ও আহার এত সহজে জুটবে তা সে ভাবেনি। — ব্রাহ্মণ হওয়ায় মনে এই মুহূর্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করল সূর্যকান্ত।

বজরার ভেতরে একটি মাত্র প্রশস্ত কক্ষ—তার একদিকে শয়নের বহুমূল্য খাট ও শয্যা অপরদিকে থালাবাসন ও আহার্য সামগ্রী, উনুন হাতা বেড়ি খোন্তা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে সাজানো। ঝকঝক করছে সবকিছু। প্রৌঢ় বললেন, 'তোলা-উনুন রয়েছে, কাঠ মজুত, আগুন ধরিয়ে চটপট ভাত চাপিয়ে দিন। বাসন-কোসন গঙ্গার জলে পরিষ্কার ভাবে ধোয়া। তুব আর-একবার ধোয়ার বন্দোবস্ত করছি। ওরে কার্তিক—'

ব্যস্তভাবে বাধা দিতে গেল সূর্যকান্ত, কিন্তু ডাকের পরক্ষণে দ্বারদেশে উঁকি দিল পূর্বোক্ত মাঝি। প্রৌঢ় বললেন, 'বাসনগুলো আর-একবার পরিষ্কার করে দে। আর ঠাকুর-মশায়ের কাছে-কাছে থাক্ যখন যা দরকার পরে যুগিয়ে দিবি—ঠাকুরের আহার হয়নি এত বেলা পর্যন্ত।

বলে তিনি খাটে গিয়ে বসলেন এবং বালিশের ওপর এলিয়ে পড়লেন ধীরে ধীরে। বোঝা গেল আহারাদির পর তিনি একটু বিশ্রাম-সুখ চান। শুয়ে শুয়ে দেখলেন তোলা-উনুন কক্ষের বাইরে নিয়ে গেল কার্তিক এবং কাঠের গুঁজি দিয়ে আগুন ধরাল, 'ঠাকুর চাপিয়ে দিল ভাতের হাঁড়ি। টুকটাক জিনিস হাতের কাছে এগিয়ে দিতে লাগল কার্তিক— রন্ধনপর্ব এগিয়ে চলল যথারীতি। দেখতে দেখতে এক সময় অবসাদে জড়িয়ে এল চোখ, তিনি নিদ্রাভিভূত হয়ে গেলেন।

অপরাহ্ন অপগত—তাঁর নিদ্রা ভাঙল সন্ধ্যার পূর্বে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন শয্যায়। দেখলেন কক্ষে কেউ নেই। বজরা চলেছে বেশ দ্রুত গতিতে—জানালা দিয়ে তাকিয়ে বুঝলেন জোয়ার সরে গিয়ে এখন ভাঁটার কাল, বজরা পেয়েছে অনুকূল স্রোতের টান, তরতরিয়ে ভেসে চলেছে। কিন্তু একদম নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন-সুখ গ্রহণ করলে চলবে না, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, প্রস্তুত থাকতে হবে। হার্মাদ জলদস্যুদের আক্রমণ ঘটতে পারে রাতের অন্ধকারে। বেরিয়ে এলেন তিনি। দেখতে পেলেন, বজরার পাটাতনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠাকুর, পশ্চিম দিকে মুখ। পশ্চিম-সূর্যের নিরুত্তাপ আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত আকাশ—সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ধূসর নীলের আভাস; বহু ঊর্ধ্বে যেন মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলেছে একদল সাদা হাঁস। দৃশ্যটি মনোরম, তাকিয়ে দেখার মতো। বাতাস বইছে স্নিগ্ধ মধুর—এ সময় চিত্ত কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু শিয়রে আক্রমণের ভয়। অতএব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তিনি মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'ঠাকুর, কী দেখছেন?'

চমক ভাঙল সূর্যকান্তর। লজ্জিতস্বরে বললে, 'এই উন্মুক্ত আকাশ, প্রকৃতি ও গঙ্গার এমন একটা নিজস্ব রূপ-মহিমা আছে যে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। বাঙলাদেশের এই শ্যামল-সুন্দর রূপের বুঝি তুলনা নেই। ভাবলে আনন্দ হয় যে আমি এদেশে জন্মেছি। মাথা নত করে দিতে হয় প্রকৃতির পায়ে। প্রার্থনা করছিলুম প্রকৃতির এই উন্মুক্ত রূপ দেখতে-দেখতে যেন মরি। ভারি সুন্দর—'

তার উচ্ছ্বাসের বহর দেখে প্রৌঢ় মৃদু হাসলেন।

বললেন, 'সে ইচ্ছা আমারও। কিন্তু তার দেরী আছে। মানুষের মৃত্যু কখন কীভাবে আসে তা কেউ বলতে পারে না। আবার, এ মুহূর্তেই আমাদের সে-সাধ হয়তো পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অকালমৃত্যু কে চায় বলুন? মৃত্যুর সময় আসুক তখন দেখা যাবে সজ্ঞানে প্রকৃতির শোভা দেখতে-দেখতে গঙ্গালাভ করা য়ায় কিনা—'

সূর্যকান্ত সচকিত হল ঃ 'একথা বলছেন কেন?'

'এমনি।' প্রৌঢ় হেসে বললেন, 'মনে এল তাই বললাম।—আহারের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ত্রুটি মার্জনা করবেন। অসুবিধা হয়নি তো?'

'কিছুমাত্র না। কার্তিকের আন্তরিক সহযোগিতায় পরিতোষ সহকারে আহার করেছি।' সূর্যকান্ত বললে, 'আপনার সহৃদয় ব্যবহার ও উপকার চিরকাল স্মরণে থাকবে—'

'স্বদেশবাসীর বিপদে এ আমাদের কর্তব্য।' প্রৌঢ়ের সতর্ক জিজ্ঞাসা, 'আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করছেন নিশ্চয়?'

'এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ—'

'বিশ্রাম করছেন?'

'হ্যাঁ—'

'ক্লান্তি নেই তো?

'না—'

'সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।' প্রৌঢ়ের স্বর গম্ভীর, 'আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

'নিশ্চয়! কিন্তু সেনা?'

প্রৌঢ় হেসে উঠলেন, 'ঠাকুর, মাঝিরা কেউই জেলে নয় সবাই শিক্ষিত সেনা, দরকার পড়লে মাঝির কাজ করে আবার বন্দুক চালাতে পারে—'

'তবে তো কথাই নেই। কতজন মাঝি আছে?'

'দেড় শত—'

'বন্দুক?'

'সকলের কাছেই আছে একটা করে—'

'সেগুলো ভরে রাখা উচিত।'

'আমিও তাই ভাবছিলুম। কার্তিক—'

বোঝা গেল কার্তিক মাঝিদের দলপতি। কালো, বলিষ্ঠ চেহারা। ঝাঁকড়া চুল, খাটো ধুতি। বিশালকায়। প্রভু-ভৃত্যের চেহারায় অনেকখানি মিল! স্বভাবের মিল তো আগেই দেখা গেছে। এরা যে শিক্ষিত মনিবের শিক্ষিত সেনা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা কারা? প্রৌঢ় ব্যক্তির পরিচয় কী? এভাবে সেনা-সংগ্রহ করে তিনি চলেছেন কোথায়? সপ্তগ্রামে?—কেন?

প্রশ্নগুলো পাক খেয়ে উঠল মনে। কিন্তু জিজ্ঞেস করা হল না। বিশাল চেহারার কার্তিক এসে দাঁড়াল সামনে।

প্রৌঢ় বললেন, 'কার্তিক, মনে হচ্ছে আজ রাত্রে লড়াই বাধতে পারে। তোমরা প্রস্তুত হও।'

কার্তিক কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে লড়াই হুজুর?'

'কে আবার?' প্রৌঢ় অশ্রদ্ধায় উচ্চারণ করলেন, 'ফিরিঙ্গি হার্মাদ।'

'এখানে ফিরিঙ্গি? সাতগাঁ তো বহুদূর—'

'আসতে পারে না?' তিনি ঈষৎ বিরক্ত : 'কত পেছনে ফেলে এসেছি রাঙ্গামাটি, শুনলে তো সেখানে গিয়েও হামলা করেছে ওরা। অপহরণ করে নিয়ে গেছে ওঁর এক আত্মীয়াকে। কতদূর যেতে পারে বুঝে দ্যাখ তাহলে। ওদের অত্যাচারে গঙ্গার এপার-ওপার তটস্থ। সর্বদা ভয় এই বুঝি এল—'

'আমি ভেবেছিলুম' কার্তিক মাথা চুলকাল, 'সারা বাঙলা মুলুকে সাতগাঁ-ই জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরের কথা শুনেছিলুম বটে কিন্তু অতটা খেয়াল করিনি। সাধে আপনি মনিব আর আমি ভৃত্য—এই বুদ্ধির তফাত। হুজুর, ব্যাটারা বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। যদি আদেশ দেন, তোপ দুটো বের করি—'

'করো। কিন্তু বারুদ?'

'যথেষ্ট আছে।'

'ভরে ফেল।'

'অভাব শুধু লোকের, বুঝলেন?'

'কেন?'

'এত বড় বজরা নিয়ে লড়াই করতে হলে তিন শো লোকের প্রয়োজন, দুশো বজরা বাইবে আর একশো লড়াই করবে। সে জায়গায় আমাদের—'

'অর্ধেক লোক আছে।' প্রৌঢ় বললেন, 'তা থাক। এও নিতান্ত কম নয়। কার্তিক, তোমাদের বন্দুকগুলো ভরে রাখতে বলো।'

কার্তিক বললে, 'সমস্ত বন্দুক প্রস্তুত আছে, কেবল তোপ দুটো ভরে রাখা বাকি।'

'তাড়াতাড়ি ভরে নাও—'

কার্তিক দশ-পনেরোজন মাল্লাকে ডাকল—সকলে মিলে বজরাগর্ভ হতে বজরার ওপরে তোপ দুটো তুলল এবং নির্দেশক্রমে বারুদ ও গোলা ভরে রাখল। রণতরীর মত সজ্জিত হল বজরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছিল, স্রোত বইছিল ভাঁটার, বজরা ছুটে চলল বাতাসের অনুকূলে।

বেশ কিছুদূর চলে এসেছিল ওরা। অন্ধকারে তরতরিয়ে বয়ে যাচ্ছিল বজরা। রজনীর প্রথম যাম উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত প্রায়। শুধু জলের শব্দ—ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল। বাধাবন্ধনহীন বয়ে চলেছে বজরা—পঞ্চাশখানা দাঁড় উঠছে আর পড়ছে। দাঁড় সুদ্ধ মাঝিদের হাতের পেশী ফুলছে আর নামছে। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি—কোথাও কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখা যায় কিনা। নিস্তব্ধতায় থমথম করছে গঙ্গাতীরের উভয় পার্শ্ব। কালো অন্ধকারে অজানা আশংকায় দু'পাশের নদীতট যেন মূর্ছিত। অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নদীর কোনো তীরে প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা সন্দেহ। এত নিস্তব্ধতা কেন?—হল্লা উঠল কোথায় যেন তার অস্পষ্ট রেশ ভেসে এল বাতাসে। সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের সরব আতংকধ্বনি।

উৎকর্ণ হল সবাই। কোথায় কী ঘটল?

'কার্তিক, ও কিসের আলো?'

প্রৌঢ় অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন পশ্চিম তীরে।

ভাগীরথীর অন্ধকার পশ্চিম-তীরে সহসা তীব্র আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

'কোনো গ্রামে আগুন লেগেছে বোধহয়।'

কার্তিক চোখের ওপর হাত তুলে ঠাহর করে দেখতে লাগল।

'দাউ দাউ করে জ্বলছে, দু-একটা ঘরে আগুন লাগলে এত আলো হয় না।'

প্রৌঢ় বললেন দূরদর্শীর মতো।

'ওরে, জোরে টান—'

কার্তিক হাঁক দিল।

দেখতে দেখতে বজরা আলোর নিকটবর্তী হল। বজরা যত কাছে আসছিল আগুনের লেলিহান রূপ ততই দেখতে পাচ্ছিল, একসঙ্গে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগুনের প্রলয়ংকর নৃত্য। গ্রামবাসীদের কলরব ও হাহাকার কানে আসছিল, কিছু কিছু গম্ভীর গলা, উচ্চ অট্টহাসি। সারা গ্রাম জুড়ে যেন অগ্নির প্রেত-নৃত্য। লাল হয়ে উঠেছে অন্ধকার আকাশ, চোখ ঝলসে যায়।

বজরা থেকে পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছিল না তবু একটা অঘটন ঘটেছে এ বিষয়ে কারো সংশয় ছিল না। সকলে উদ্বিগ্ন চোখে গ্রামের দিকে তাকিয়েছিল।

'এত বড় গ্রাম একসঙ্গে জ্বলে উঠল কী করে?'

প্রৌঢ়ের স্বর বেশ দুশ্চিন্তিত।

কার্তিক বললে, 'বোধহয় এক বাড়ির আগুন অন্য বাড়িতে লেগে সারা গ্রাম জ্বলে উঠেছে।'

'তা হবে কী করে?' প্রৌঢ়ের স্বরে কাঠিন্য ঃ 'বাড়িগুলো কত দূরে দূরে দেখছিস না? কাছাকাছি হলে তবে তো আগুন বাড়ি-বাড়ি ছড়ায়। এ নিশ্চয় কোনো দলের কাজ। গ্রামবাসীদের ঘরে আগুন লাগিয়ে লুটতরাজের মতলব—'

'কারা?'

'ডাকাতের দল হতে পারে। না হলে—'

সূর্যকান্ত এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, চুপচাপ প্রভু-ভৃত্যের কথা শুনছিল আর আগুনের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ লাগল। চাপা আক্রোশে সে বলে উঠল, 'ফিরিঙ্গি নয় তো?'

'তাই সম্ভব।' প্রৌঢ় গম্ভীরস্বরে বললেন, 'ডাকাতের দল হলে সমবেত গ্রামবাসীরা বুঝতে পারত। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের প্রতিরোধ দুঃসাধ্য।'

'তবে?'

'কার্তিক তীর-ঘেঁষে বজরা নিয়ে চল্। ফিরিঙ্গি হলে তাদের কোশার দেখা পাব। সাবধানে চল্।'

কার্তিক কর্ণধারের কাছে চলে গেল এবং নির্দেশ দিল। বজরা চলতে লাগল তীর ঘেঁষে। কার্তিক কর্ণধারের পাশে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগল কোথাও কোনো কোশা আছে কিনা। অন্ধকারে নিঃশব্দে কিছুদূর চলে আসার পর কার্তিক সচকিত হল। মনিবের অনুমান সত্য। দেখতে পেল একখানি দীর্ঘ কোশা নোঙর করা হয়েছে অল্পদূরে। শূন্য কোশা—লোকজন নেমে গেছে সবাই। ছোট একটা খাল ছিল পাশে, কার্তিক তৎক্ষণাৎ বজরা চালাতে বললে সেই খালে। কর্ণধার গতিপথ পরিবর্তন করে বজরা চালিয়ে দিল তার নির্দেশমতো।

খালের মধ্যে ঢুকল বজরা—একটা গাছের তলায় বজরা বাঁধল কার্তিক। এসব বিষয়ে সে খুব তৎপর। পঁচিশজন মাঝিকে বজরা পাহারায় থাকতে বলে সকলে নামল তীরে। বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রের ঠুকঠাক শব্দ হল খানিক। প্রৌঢ় বললেন, 'ঠাকুর, পছন্দমতো আপনি একটা বন্দুক বেছে নিন।'

কার্তিক একাধিক বন্দুক এনে তার সামনে ধরল।

সূর্যকান্ত তা থেকে রজতনির্মিত ছোট একটি আগ্নেয়াস্ত্র বেছে নিল।

'ওতে কাজ হবে?' কার্তিক বললে।

'খুব ছোট বলে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায় আবার দরকার পড়লে কাজে লাগানো যায়। এটাই আমার কাছে থাক।'

সূর্যকান্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে খুশী হল। নতুন জিনিস। কিন্তু খুব কার্যকর।

প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুর, এ গ্রাম কী আপনার পরিচিত?'

সূর্যকান্ত বলল, 'আসিনি কখনও।'

'আমারও অপরিচিত।—'

'ভাবছেন কী?'

'ভাবছি অপরিচিত গ্রাম, রাস্তাঘাট চিনি না, কী ভাবে অগ্রসর হব?'

'আমার মনে হয় গ্রামের ভেতরে প্রবেশ না করে গঙ্গাতীরের পথ ধরে চলাই ভাল। তাতে ওদের কোশার কাছাকাছি থাকা যাবে এবং দস্যু দলের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হবে।'

প্রৌঢ় তারিফ জানিয়ে বললেন, 'ঠাকুর, আপনার বুদ্ধি দেখে খুশি হলাম, আপনি যথার্থ যুদ্ধ-ব্যবসায়ে পারদর্শী। উত্তম কথা, তাই যাওয়া যাক। নদীকূলের আশ্রয়ে অগ্রসর হও সকলে—'

বলে তিনি, সূর্যকান্ত ও কার্তিকসহ অগ্রসর হলেন সবার আগে।

অপরিচিত গ্রাম। রাস্তাঘাট কেউ চেনে না। তদুপরি অন্ধকার রাত্রি। গঙ্গাতীরের উচ্চভূমি ধরে কিছুদূর আসার পর সূর্যকান্ত বললে, 'এভাবে অগ্রসর হওয়া ঠিক হচ্ছে না। আমি একটা কথা ভাবছি—'

'বলুন?'

'আমার মনে হয় নাবিকদের দুভাগে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এক দল চলুক গ্রামবাসীদের রক্ষাকার্যে, দ্বিতীয় দল থাকুক দস্যুদের পথরোধ করে।— আপনা কী অভিমত?'

প্রৌঢ় বললেন, 'যুক্তিযুক্ত কথা। এটাই কার্যকর। কে কোন্ পথে যাবে?'

সূর্যকান্ত বললে, 'আমি প্রথম দল নিয়ে গ্রামরক্ষায় যাচ্ছি, আপনি ও কার্তিক ওদের পথরোধ করুন—'

'বেশ।'

সত্তর জন নাবিক নিয়ে সূর্যকান্ত গ্রামের পথে রওনা হল আর অবশিষ্ট নাবিকেরা মনিব ও দলপতির সঙ্গে অগ্রসর হল ঘাটের দিকে—যাতে দস্যুদলের প্রত্যাবর্তন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অন্ধকার। পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। উঁচুনিচু পথ ধরে এরা ঘাটে ফিরে আসছিল নিঃশব্দে। কার্তিক ও প্রৌঢ়ের সতর্ক পদক্ষেপ। ঘাটে তখনও ওরা ফেরেনি, গ্রামের মধ্যে বন্দুকের শব্দ হল। উত্তর প্রত্যুত্তর চলল কিছুক্ষণ। ওরা উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শুনল।—তারপর চুপচাপ।

প্রৌঢ় জিজ্ঞেস করলেন, 'কার্তিক, কী হল বল তো? থেমে গেল কেন?
কার্তিক বললে, 'বুঝতে পারছিনে—'
'ঠাকুরের চোট লাগল না তো?'
'কী জানি—'
'দল ভাগ হয়ে আমাদের শক্তি না কমালেই ভাল হত—এমনিতেই তো আমরা ছোট দল।'
কার্তিক বললে, 'ঠাকুর একাই একশো।'
'কিন্তু—'
'হস্-স-স।'
'কী?'
'কে যেন ছুটে আসছে।'
বাস্তবিক একজন ছুটে আসছিল। পরমুহূর্তে একটি নাবিক এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।
'কী সংবাদ দুর্লভ?'
নাবিক হাঁপাচ্ছিল, বললে, 'হুজুর, ঠাকুরের আক্রমণে দস্যুদল বিব্রত, তারা পালাচ্ছে, আপনি তাদের কোশা আক্রমণ করুন।'
'কিন্তু কোশা তো এখনও খুঁজে পাইনি—'
'তাহলে?'
'ওরা কী ফিরিঙ্গি?'
'হয় মগ নতুবা ফিরিঙ্গি। হুজুর, ওরা কিন্তু পালিয়ে এসেছে—'
'কী করা যায় বল তো?'
কার্তিক বললে, 'পথঘাট না চেনার জন্যে অসুবিধা। ওরা সোজাসুজি কোশায় উঠবে এবং স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে—'
কার্তিকের কথাই সত্যি। দেখা গেল, ফিরিঙ্গিদের কোশার মতো একখানি বড় কোশা ওপাশ থেকে বেরিয়ে খাল পার হয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। বেশ দ্রুতগতি। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। কার্তিক বললে, 'আমরা খালের এপারে, ওরা খাল পেরিয়ে চলে গেল। পথঘাট বেশ ভাল করেই চেনে। —দস্যুদের শিরোমণি!'
'হুঁ।' প্রৌঢ় বললেন, 'দুর্লভ, তুমি ঠাকুরকে গিয়ে বলো দস্যুরা কোশায় উঠে পালিয়েছে, গ্রামে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই, তিনি যেন বজরায় ফিরে আসেন—'
আবার যাত্রা।
যুদ্ধের মহড়া নেওয়া হল কিন্তু আশানুরূপ কিছুই হল না বলে সকলেই

মনঃক্ষুণ্ণ। নাগালের মধ্যে ছিল, কিন্তু নাগাল পেরিয়ে চলে গিয়ে জানিয়ে দিল, বুদ্ধিতে কত বড় তারা। এখানেই যেন ছোট মনে হচ্ছিল। গ্রামবাসীদের ওপর উৎপীড়ন বন্ধ করেছে বটে তারা আকস্মিক আক্রমণে, ভয় পেয়ে পিছু হটে পালিয়ে গেছে দস্যুদল, কিন্তু পালিয়ে গেছে অক্ষত শরীরে, কোনো শাস্তি গ্রহণ না করেই। এ যেন খেলা-খেলা যুদ্ধ। পেছনে পড়ে রইল অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, বৈঠার ঘায়ে বজরা এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে।

কক্ষের মধ্যে প্রৌঢ় ও সূর্যকান্ত।

সূর্যকান্ত বললে, 'সপ্তগ্রামে পৌঁছুতে ক দিন লাগবে?'

'দিন দুই। আপনি সপ্তগ্রামে কোথায় যাবেন?'

সূর্যকান্ত বললে, 'ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁর সঙ্গে দেখা করব—'

'একদিনেই কী ফৌজদারের সাক্ষাৎ পাবেন?'

'পাব না?'

'সচরাচর পাওয়া যায় না।'

'তাহলে অপেক্ষা করব—'

'সপ্তগ্রামে' কী আপনার পরিচিত লোক আছে?'

সূর্যকান্ত বললে, 'তেমন কেউ নেই—'

'তবে?'

'আমার পিতার দু-একজন বন্ধু আছেন—'

'তাঁরা কী আপনাকে চেনেন?'

'সূর্যকান্ত বললে, 'কখনও দেখিনি। হয়ত নাম বললে চিনতে পারবেন—'

'তাদেরও তো খুঁজে বার করতে হবে?'

'তা হবে—'

'ততদিন আশ্রয় নেবেন কোথায়?'

'অতিথিশালায়—'

প্রৌঢ় বললেন, 'আমি একটা অনুরোধ করব?'

'অনুরোধ কেন, আদেশ বলুন। আপনি আমার জীবনদাতা—'

প্রৌঢ় বললেন, 'সপ্তগ্রামে অনুগ্রহ করে যদি আমার কুটীরে বাস করেন তাহলে কৃতার্থ হব।'

'আপনি দ্বিতীয়বার আমাকে আশ্রয় দিতে চাইছেন,' সূর্যকান্ত বিনীতস্বরে বললে, 'এ আমার পরম সৌভাগ্য। কোন্ শুভক্ষণে—'

আচমকা শব্দ হল, গুড়ুম। তোপের আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল বজরা। ফুঁ দিয়ে তৎক্ষণাৎ কক্ষের দীপ নিবিয়ে দিলেন প্রৌঢ়। তোপ দাগিয়েছে

নদীবক্ষ হতে অন্য কেউ। লক্ষ্য যে তারাই তাতে কোনো ভুল নেই। কেননা তোপ এসে পড়েছে বজরার অতি সন্নিকটে। জলোচ্ছ্বাসে বজরা তখনও দুলছে।

দুজনে দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন বাইরে। দেখতে পেলেন, দূরে কোশার মতো একখানি বৃহৎ নৌকো দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। ওরা এভাবে গোলা ছুঁড়ল কেন?

কার্তিক এসে দাঁড়াল ওঁদের কাছে। বললে, 'হুজুর, ফিরিঙ্গি হার্মাদ বোধহয় পিছু নিয়েছে আমাদের. গোলা লেগে একজন মাল্লা মারা পড়েছে?'

'তুমি তার জবাব দিচ্ছ না কেন? আমাদের তোপ তো প্রস্তুত আছে—'

কার্তিক বললে, 'তার গোলা অতদূর পৌঁছুবে না।'

'ঠিক বলছো?'

'হ্যাঁ হুঁজুর।'

'তাহলে শিগগির বজরা ফেরাও। একজন লোকও যেন আর না মরে—'

মুহূর্ত মধ্যে বজরা ফিরল এবং দ্রুতবেগে উত্তরে চলতে লাগল।

নিরাপদ দূরত্বে এসে প্রৌঢ় বললেন, 'ঠাকুর, এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না—একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ, জ্বালা ও প্রতিহিংসার সংমিশ্রণ।

সূর্যকান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ওপর কে অত্যাচার করেছে?'

'ওই পর্তুগীজ বণিক দস্যু।'

বিজাতীয় ঘৃণায় তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল।

'পর্তুগীজ বণিক কী দস্যু?'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি সূর্যকান্তর।

'এরা যখন সুবিধে পায়, বাণিজ্য করে।' প্রৌঢ়ের স্বরে তেমনি ঘৃণা : 'অবসর বুঝে করে লুটতরাজ—'

'ফৌজদার কী করেন? এদের শাসন করেন না কেন?'

প্রৌঢ় বললেন, 'পেরে ওঠেন না—'

'আর সুবাদার? তিনি কী কিছুই সংবাদ রাখেন না?'

প্রৌঢ় উত্তর দিলেন, 'ভেতরে আসুন। সব বলছি। আমার কথা শুনলেই সব জানতে পারবেন—'

।। চার।।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন প্রৌঢ়। তাঁর অনুরোধে সূর্যকান্ত বসল খাটে, তিনি বসলেন কাঠের একটি আসনে। মধ্যরাত্রি। বাইরে কালি ঢালা অন্ধকার। নিস্তব্ধতা। বজরা ভেসে চলেছে তরতরিয়ে।

সূর্যকান্ত বললে, 'বলুন।—'

'আমার নৌযাত্রা ঠিক ভ্রমণোদ্দেশ্যে নয়,' প্রৌঢ় বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে যেন স্বগতোক্তি করলেন, 'আমি ফিরছি জাহাঙ্গীরনগর থেকে। ফিরছি বলা ভুল, ফিরতে বাধ্য হচ্ছি—'

'কেন?'

'বাঙলার সুবাদার তাঁর অধীনস্থ প্রজাদের দস্যুর হাত হতে রক্ষা করতে অক্ষম।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এটুকু বুঝেই জাহাঙ্গীর নগর ত্যাগে বাধ্য হয়েছি। সুবাদার কিছু করতে পারেন নি, আমি মার খেয়েছি দস্যুদের হাতে—'

'বাদশাহের কাছে আবেদন করেননি?'

'বাদশাহ থাকেন অনেক দূরে—দিল্লি?' তিনি বললেন আত্মগত স্বরেই: 'ফিরিঙ্গির অত্যাচারে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও যাবে দিল্লি গেলে। দিল্লি যাওয়া স্থগিত রেখেছি এ কারণে —'

'কেন, বাদশাহ কী আপনার সম্পত্তি কেড়ে নেবেন?'

'ভয় সেদিকে নয়।' অতঃপর তিনি স্পষ্ট হলেন, 'বাদশাহের দরবারে পৌঁছুবার আগেই ফিরিঙ্গি বণিক ও খৃষ্টান পাদ্রী আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি এমনকি আমার স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকন্যা পর্যন্ত হরণ করতে পারে, আশংকা করি। তাড়াতাড়ি ফিরছি এই কারণে। লোকবল ও অর্থবল থাকার দরুন অন্য ক্ষতি করতে পারছে না—কিন্তু আমার অনুপস্থিতি ঘটলে সহজে তা পারবে। তাই বাদশাহের দরবারে যেতে চাইনে—'

সূর্যকান্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুনছিল। প্রথম সাক্ষাতের পর এই কথাবার্তা শোনা পর্যন্ত তার কৌতূহল বারংবার নাড়া খেয়ে উঠছিল মনে। কে এই ভদ্রলোক?—সম্পত্তিগতভাবে বিপর্যস্ত হবার পর জাহাঙ্গীরনগর হতে এখন ফিরে চলেছেন সপ্তগ্রামে—কী এঁর পরিচয়? আচারে-ব্যবহারে অতি ভদ্র ও বিনয়ী অথচ লোকবল ও অর্থবল প্রচুর। অর্থ ও সামর্থ্য এমনই প্রচুর যে ফিরিঙ্গি হার্মাদদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।—দেখাই যাচ্ছে, শক্তি তাঁর নিতান্ত অল্প নয়। সাধারণ কোনো ব্যক্তির এত সাহস ও সামর্থ কী থাকে? —কে ইনি?

একটু চুপ করে থেকে বললে, 'অনেকক্ষণ একসাথে আছি, আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা হয়।'

প্রৌঢ় এতক্ষণে হাসলেন।

বললেন, 'ঠাকুর, আপনি নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন, কেন রেখেছেন তা জানি না, কিন্তু আমি গোপন করব না। পারস্পরিক পরিচয় থাকা ভাল, যেহেতু এ বড় দুঃসময়। আমি সপ্তগ্রামবাসী সুবর্ণ বণিক, বাণিজ্য আমার ব্যবসা,

সপ্তগ্রামের অনেকেই আমার পরিচিত—নাম সর্বেশ্বর সেন। কুঠি আছে চার জায়গায়—সপ্তগ্রামে, গৌড়ে, সুবর্ণগ্রামে আর জাহাঙ্গীরনগরে। বেশ ভাল বাণিজ্য-ব্যবসা ছিল, দশখানা জাহাজ যাতায়াত করত বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে, সেগুলো বিসর্জন দিয়েছি একে একে। গৌড় ও জাহাঙ্গীরনগরে ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে অচল এবং সপ্তগ্রামে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। —হৃত-সম্পত্তির জন্যে দুঃখ করি না, বেঁচে থাকলে আবার তা গড়ে তোলা যায়, কিন্তু এভাবে প্রহৃত হতে আর ইচ্ছা নেই। আত্মরক্ষার অধিকার সব মানুষের আছে, কী বলেন?'

সূর্যকান্ত ঘাড় নেড়ে জানাল, 'নিশ্চয়।'

সে পরিচয় প্রদান করেনি বলে মনে মনে কুণ্ঠিত ছিল। পরিচয় না দেওয়ার কারণ, আত্মগোপনের ইচ্ছা, খুড়ো-মশায়ের কানে যেন তার পলায়ন-সংবাদ না পৌঁছায়। এখন চলে এসেছে অনেকদূর, তাছাড়া এ ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত—খুড়ো মশায়ের সাথে যোগাযোগ না থাকাই সম্ভব। থাকলেও, ভয়ের কারণ নেই। তবু সাবধান হতে দোষ কী। সে ভূমিকাস্বরূপ বললে, 'আপনি যখন নদীপথে এই দীর্ঘ অঞ্চল যাতায়াত করেন—উত্তর-রাঢ়ে রণসাগর নামে কোন জায়গার নাম হয়ত শুনে থাকবেন—'

'শুনেছি। কিন্তু বন্দর নয় বলে যাওয়া-আসা নেই। আমার যাতায়াত নদীপথেই বেশি এবং বন্দরে বন্দরে সম্পর্ক—'

সূর্যকান্ত মুখ খুলল, বললে, 'আমার নাম সূর্যকান্ত, আমার পিতা রণসাগরে প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন। বাদশাহের আদেশে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার পিতৃব্য সেই অধিকার পেয়েছেন। বর্তমানে আমি সহায়হীন নিঃসম্বল ভিখারী। আপনার আশ্রয় পেয়ে মনে অনেক বল পেয়েছি। আপনি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন—'

'ছি ছি, অপরাধী করবেন না।' তিনি হাত জোড় করলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে দুঃখ পেলাম। মানুষের ভাগ্যে কখন কী-যে ঘটে—'

সূর্যকান্ত বললে, 'আপনার দশখানা জাহাজ ছিল—সেগুলো বিসর্জন দিলেন কী করে?'

'ফিরিঙ্গিদের হামলায়।' তিনি বললেন, 'ওরাই কতকগুলো ডুবিয়ে দিয়েছে, বাকিগুলো কেড়ে নিয়েছে জোর করে—'

'বলেন কী।'

সূর্যকান্ত বললে কিছুক্ষণ পরে, 'এর কী প্রতিকার নেই?'

'প্রতিকার!' তাঁর স্বরে ব্যঙ্গ ও ক্ষোভের সংমিশ্রণ ঃ 'অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি, কেউ ঘাঁটাতে চায় না ওদের। আক্ষেপ করে লাভ নেই, ভেঙে পড়াও চলে না। আমি ভাগ্য আর পুরুষকারে বিশ্বাসী—'

'এখন কী করবেন?'

'বলেছি তো—আত্মরক্ষার ব্যবস্থা—'

'কিন্তু সুবাদার ফৌজদার যাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না, আপনি একা তাদের সঙ্গে কি করে লড়াই করবেন?'

'আমার কিছু সৈন্যবল আছে, দেখতেই পাচ্ছেন, জাহাঙ্গীরনগরে এরা কুঠি সামলাত। সপ্তগ্রামেও কিছু আছে।' তিনি মৃদু প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'তাছাড়া অন্য ফিরিঙ্গিরা আমাকে সাহায্য করবে এমন প্রত্যাশা করি—'

'মানে?' সূর্যকান্ত যথারীতি বিস্মিত ঃ 'ফিরিঙ্গি কী দু-তিন রকম হয়?

'হয় বৈ কি? মানুষ কী সব এক?' তিনি বিস্তারিত হলেন ঃ 'এখন যাদের প্রভাব বেশী তারা পর্তুগীজ—এদের এক সন্ন্যাসী জল ও স্থলের রাজত্ব এদের লিখে-পড়ে দান করেছেন, সেজন্যে এরা পৃথিবীর সর্বত্র অত্যাচার করে বেড়ায়। অন্যান্য ফিরিঙ্গিরা এদের মতো উদ্ধত নয়—তাদের মধ্যে ওলন্দাজ জাতি সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আমি এই শেষদলের ওপর কিছু আশা-আকাঙ্খা রাখি।'

সূর্যকান্তর স্বরে সংশয় প্রকাশ পেল, 'শুধু পর্তুগীজ আর ওলন্দাজ তো নয় আরও কোনো কোনো জাত এদেশে আসছে—'

'তা আসছে। ভারতের স্বর্ণখনির সন্ধান পেলে দুঃসাহসী ও চতুর বহুজাতি আসবে নানা দিক থেকে। শক্তি ও বুদ্ধি যাদের কাছে তারাই টিকে থাকবে—অন্যেরা চলে যাবে। নিপীড়ন ও অত্যাচারে কোন জাত বেশিদিন কোথাও টিঁকে থাকতে পারে না—না-স্বদেশে না-বিদেশে।' একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'বাঙলার বড়ই দুর্দিন—সপ্তগ্রামের ততোধিক। সোনার বাঙলা লুটেপুটে নেবার জন্যে, চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র—বিদেশীরা বড়ই তৎপর। অসহায় ভাবে শুধু মার খেয়ে মরছি—যারা সপ্তগ্রামবাসী। জলে-স্থলে বাস করা কঠিন হয়ে উঠেছে। ওদিকে মগ এদিকে ফিরিঙ্গি। যেন যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গিয়েছি।'

'কিন্তু—'

'ইংরেজ আর ফরাসী জাত ক্রমে ক্রমে এদেশে বাণিজ্যবিস্তার করছে।' তিনি যেন আত্মগত, বলছিলেন, 'ফরাসীরা শুনেছি খুবই শক্তিধর, কিন্তু এদেশে তাদের শক্তির পরিচয় এখনও তেমন পাইনি। ইংরেজরা আসা-যাওয়া শুরু করেছে বিনীত ভঙ্গিতে—তারা এখনও জমে বসতে পারেনি। এখন ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের সুসময়। তাদের দাপট বেশি। আমি অন্য ফিরিঙ্গি বণিকদের সঙ্গে কারবার করি বলে পর্তুগীজরা আমার ওপর অসন্তুষ্ট। সেজন্যই আমার জাহাজ মারা গেছে, আমার সপ্তগ্রামের কুঠিতে আগুন লাগিয়েছে, সকল বিষয়ে আমার সর্বনাশের চেষ্টা হচ্ছে—'

তিনি চাপা একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধরে দাঁতের কামড় বসল। ক্রোধ ও ঘৃণার দংশনে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল।

সূর্যকান্ত বললে, 'অন্য ফিরিঙ্গিরা কোথাও কুঠি স্থাপন করেছে?'

'বাঙলায় করেনি।' তিনি সংযত হলেন, বললেন, 'কিছুদিন পূর্বে দুজন ইংরেজ পাটনায় একটা কুঠি খুলেছিল, সেটা বোধহয় উঠে গেছে। সকলেই চাইছে সপ্তগ্রাম কিংবা তার কাছাকাছি কুঠি খুলতে—সপ্তগ্রাম মস্ত বড় বন্দর। সপ্তগ্রামের বাজারে সব শ্রেণীর গোমস্তা জিনিসপত্র খরিদ করতে আসে। কিন্তু সময়টা এমনই যে কেউই পর্তুগীজ বণিকের সঙ্গে এখন পেরে উঠছে না। এখন পর্তুগীজরা দলে ভারি—তবে ওলন্দাজ আর ইংরেজ একসঙ্গে মিশলে বোধহয় ওদের দাপট কমতে পারে। তাতে আমাদের লাভ কি? এক শত্রুকে যেতে বলে আর এক শত্রুকে ডেকে আনা—'

'আপনার ক্ষতি হয়েছে অনেক। সুবাদারের কাছে দরবার করে ছিলেন নাকি?'

'করেছিলাম বৈকি—'

'ফল পেলেন না?'

'কই আর পেলাম!—মকরম খাঁ অত্যন্ত বিলাসী; তদুপরি পর্তুগীজ বণিকেরা নানা উপায়ে তাঁকে সন্তুষ্ট রেখেছে, তোষামোদ খোশামোদ তো আছেই, নিত্য উপহার-উপঢৌকনে। সেজন্যে তিনি বাদশাহের কাছে সাধারণ প্রজা কিংবা অন্য জাতীয় ফিরিঙ্গির আর্জি পেশ করতে চান না। তাঁকে ডিঙিয়ে যাওয়াও শক্ত। ঘোড়া ডিঙিয়ে তো ঘাস খাওয়া যায় না!—কে যাবে অতদূর বাদশাহের কাছে? প্রচুর অর্থব্যয় ও সময়ব্যয়। এটা তিনি বোঝেন বলেই বহাল-তবিয়তে চোখকান বুজে আছেন—'

'হুঁ।' সূর্যকান্ত বললে চিন্তিতস্বরে, 'আচ্ছা পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করলে সুবাদার কী অসন্তুষ্ট হবেন?'

'হয়তো হবেন। সেটাই স্বাভাবিক। আমি তা ভাবি না—'

'কেন?'

'আমার সামনে একটিমাত্র পথই খোলা আছে—'

'কী?'

'আত্মরক্ষা—'

'কিন্তু স্বয়ং সুবাদার যদি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গ দেন তাহলে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবেন।'

'না পারি মরব। তা বলে সুবাদারকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে পারি না তো?'

'তা বটে—'

'আমার কথা তো অনেক জিজ্ঞেস করলেন,' তিনি চোখ তুলে তাকালেন, 'এবার আপনার কথা। আপনি কী করবেন?'

'আমি?'—সূর্যকান্ত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না, একটু দেরি হল। বললে, 'ভাগ্যক্রমে আপনার আশ্রয় লাভ করেছি, আপনি যা করতে বলেন তাই করব—'

'আপনার আত্মীয়া উদ্ধার করাই সর্বপ্রধান কাজ, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ—'

'কারা আপনার আত্মীয়া অপহরণ করে নিয়ে গেছে জানি না, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, পর্তুগীজ পাদ্রী আরও ভয়ানক। আপনার আত্মীয়া পাদ্রীদের হাতে পড়ে থাকলে উদ্ধার করা কঠিন হবে।'

'সে কী! পাদ্রীরা তো—'

'রোমক স্বর্গের পথ ওরাই দুর্গম করে তুলেছে। ধর্মের নামে অকথ্য অত্যাচার। সপ্তগ্রামে হয়ত তার দু-একটা নমুনা পাবেন।'

'আমরা কী কালই সপ্তগ্রামে পৌছোব?'

সূর্যকান্তর স্বরে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল।

'না, দিন দুই লাগবে। সাধারণ নৌকো সপ্তাহের পূর্বে পৌছুতে পারবে না—'

'ফিরিঙ্গিদের কোশা কদিনে পৌছুবে?'

'দিনরাত যদি চলে কাল সন্ধ্যাবেলা পৌছুতে পারে—'

'আমরা তাই একদিন পরে পৌছুব,' সূর্যকান্ত বললে বিচলিত স্বরে, 'তাতে কী খুব ক্ষতি হবে?'

'বলা শক্ত—'

'আচ্ছা সপ্তগ্রামে আপনার বন্ধু আছেন কে কে?

'অনেকেই।'—তিনি চটপট বলে গেলেন কয়েকটি নাম : 'বন্দরের মুনসী হাফিজ আহ্‌মদ খাঁ, নাওয়ারার মীর আতেশ এনায়েত উল্লা খাঁ, খালিশা-মহলের নায়েব-দেওয়ান রামতারণ মজুমদার এবং ফৌজদারের খাজাঞ্চি রাধানাথ শীল—এঁরা সবাই আমার পরিচিত ও বন্ধু। এঁদের মধ্যে রামতারণ মজুমদার ও রাধানাথ শীল এখনও সপ্তগ্রামে আছেন। বছর দুই পূর্বে হাফিজ আহ্‌মদ খাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং এনায়েত উল্লা খাঁ জাহাঙ্গীরনগরে গিয়েছেন খবর পেয়েছি। — আপনার সঙ্গে ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁর-পরিচয় নেই?'

'পিতৃপরিচয়ে কেউ কেউ হয়ত চিনতে পারেন। সে চেষ্টাই করব।' সূর্যকান্ত পিতৃসূত্র ধরে বললে, 'সুলতান শাহজাহানের সঙ্গে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম

আহমদ বেগ খাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, তখন পিতা ও কলিমুল্লা খাঁ পিপলি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন। আকবরনগর ও জাহাঙ্গীরনগরের যুদ্ধে পিতা আহমদ বেগ খাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন বলে শুনেছি।—আচ্ছা বলতে পারেন, নাওয়ারার কোনো কর্মচারী কী এখনও সপ্তগ্রামে আছেন?'

'নাওয়ারার কর্মচারী?' তিনি একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ আছেন, আমীর-উল-বহর সৌকত আলী খাঁ কিছুদিন পূর্বে সপ্তগ্রামে এসেছেন বলে মনে পড়ছে।'

'তবে তো ভালই হল।' সূর্যকান্ত যেন আশার আলো দেখতে পেল, খুশী হয়ে উঠল। বললে, 'তিনি আমার পিতৃবন্ধু—মহবৎ খাঁ ও খানাজদ খাঁর সুবাদারীর সময়ে পিতা বহুদিন সৌকত আলী খাঁর সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহদমন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। যা হোক, একজন প্রভাবশালী লোকের কথা জানতে পারলাম যার সঙ্গে সপ্তগ্রামে দেখা করা যেতে পারে। ফৌজদার কলিমুল্লা চিনতে পারেন তো ভালই না হলে সৌকত আলী খাঁর সাথে দেখা করব—'

'ও'দের সাক্ষাত কী সহজে পাবেন?'

'চেষ্টা করব—'

'কিন্তু রাত যে অনেক হল। আপনার হাই উঠছে। এখন বিশ্রাম দরকার।'

সত্যি হাই উঠছিল সূর্যকান্তর। সে লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'বাস্তবিক কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনাকে জাগিয়ে রেখেছি। আপনি শয়ন করুন—'

'আপনি উঠে দাঁড়ালেন কেন?' তিনি যেন মৃদু ভর্ৎসনা করলেন, 'প্রশস্ত শয্যা। আমাদের দুজনের যথেষ্ট জায়গা হবে। আপনিও শয্যা গ্রহণ করুন।'

সূর্যকান্ত দ্বিরুক্তি না করে সুবোধ বালকের মতো শুয়ে পড়ল। প্রৌঢ় আলো কমিয়ে দিয়ে তার পাশে শয্যা নিলেন। রাতের অন্ধকারে বজরা ভেসে চলল।

তখনও ভোর হয়নি ভাল করে। আবছা অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে পুব আকাশ জুড়ে। কালি-আঁধার। রাত্রি ও উষার সন্ধিক্ষণ।

রাত্রি হয়ে গিয়েছিল শুতে—ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল চোখ ভোরের দিকে। প্রথমে জাগল সূর্যকান্ত, তারপর প্রৌঢ়। ডাকছিল কার্তিক। বজরা থেমে আছে, চলছে না। কার্তিক ডাকের ওপর ডাক দিচ্ছিল।

'হুঁজুর—হুঁজুর—'

বেশ উদ্বিগ্ন ডাক।

কী ঘটল? বজরা থেমে গেছে কেন?

'হুঁজুর—হুঁজুর—শিগগির উঠুন—'

সূর্যকান্ত তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। একাই বেরিয়ে আসবে বলে

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রৌঢ়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বললেন, 'দাঁড়ান, আমিও যাচ্ছি—'

বেরিয়ে এল দুজনে।

কার্তিক বললে, 'ওই দেখুন হুঁজুর, সামনে অনেক নৌকো—সমস্তই গরাব ও কোশা—'

'সেজন্যেই বজরা থামিয়েছিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কী করব বুঝতে পারছিনে।'

'দাঁড়া দেখতে দে—'

'আমি ঠাহর করে দেখেছি হুঁজুর, ওর মধ্যে একখানা পঞ্চাশ তোপের গরাব গঙ্গার ঠিক মাঝখানে নোঙর করে আছে।'

'কারা ওরা?'

'বুঝতে পারছিনে। বজরা কী চালাব?'

'দাঁড়া। দেখতে দে—'

তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়েছিলেন তিনি, দেখতে পাচ্ছিলেন আশংকা করার মতো অবস্থা বটে, অহেতুক ভয়ে বজরা থামায়নি কার্তিক। সুসজ্জিত বিরাট বহর। গঙ্গাবক্ষে আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলদস্যুদের বহর হলে এত জলুস ও আভিজাত্য থাকত না। এরা নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত কোনো দল—নদীপথে কোথাও যাচ্ছে কিংবা ফিরছে। মাঝে মাঝে এরকম বাদশাহী বহরের সাথে দেখা হয়। গঙ্গাবক্ষকে নোঙ্গর করে ওরা এখন বিশ্রাম করছে, যাত্রা করবে দিনের আলো ফুটে উঠলে। হয়ত সপ্তগ্রাম যাবে কোনো প্রয়োজনে, কিন্তু ভয়ের কোনে কারণ নেই বলেই মনে হয়।

অভিজ্ঞচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'বোধহয় বাদশাহী বহর। কার্তিক, তুই ধীরে ধীরে ছিপ নিয়ে চল্ গরাবের কাছে। আটকে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। আমাদের তাড়াতাড়ি সপ্তগ্রামে পৌঁছুতে হবে—'।

'বজরা ছাড়ব হুজুর?'

'ছাড়্—'

কার্তিকের নির্দেশে মাঝিরা বজরা খুলে দিল এবং মন্থরগতিতে এগিয়ে চলল থেমে-থাকা সেই নৌবহরটির দিকে।

বড় শান্ত, সুসজ্জিত নৌবহর। চতুর্দিকে পাহারা। গঙ্গাবক্ষ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে রাজকীয় মহিমায়।

নৌবহরের কাছাকাছি যেতেই, গরাবের ওপর থেকে শাস্ত্রীপাহারা হাঁকল, 'নৌকো তফাৎ—কার বজরা?'

এ জিজ্ঞাসাবাদে অভ্যস্ত প্রৌঢ়। তিনি উত্তর দিলেন, 'সপ্তগ্রামের বণিক সর্বেশ্বর সেনের বজরা—'

'কোথা যাবে?'

'সপ্তগ্রাম—'

'আসছ কোথা থেকে?'

'জাহাঙ্গীরনগর—'

'ছাড় আছে?'

'আছে।'

'দাঁড়াও—'

ছাড়পত্র দেখাতে হবে।

গরাব থেকে একখানি ছোট নৌকো এসে লাগল বজরার গায়ে, একজন নাখোদা লাফিয়ে উঠল বজরায়। সূর্যেশ্বর দেখালেন জাহাঙ্গীরনগর বন্দরের ছাড়পত্র। নাখোদা তা দেখে ফিরে গেল নিজের নৌকোয় এবং সেখান থেকে গরাবে।

শান্ত্রীপ্রহরী হেঁকে বললে, 'ঠিক আছে—বজরা চালাও। কিন্তু সাবধান, ফিরিঙ্গিদের একখানি কোশা গেছে এ পথে—'

এতক্ষণে উৎকর্ণ হল সূর্যকান্ত। ফিরিঙ্গির কোশার হদিসই পাওয়া যাচ্ছিল না। এরা তা দিল।

সে জিজ্ঞেস করল উচ্চকণ্ঠে ঃ 'কতক্ষণ আগে?'

শাস্ত্রী জবাব দিল, 'দণ্ড দুই হবে—'

সূর্যকান্ত ফিরে তাকাল সর্বেশ্বরের পানে। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা।

সর্বেশ্বর বললেন, 'কার্তিক, জোরে বজরা চালা। যত তাড়াতাড়ি পারিস আমাদের সপ্তগ্রামে পৌছে দে—'

।। পাঁচ।।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে সপ্তগ্রামে পৌছুল ওরা। পথে কোনো হামলা হয়নি, কিন্তু ফিরিঙ্গি কোশার দেখাও পায়নি। নবদ্বীপ পার হয়ে স্বচ্ছন্দে বন্দরে বজরা ভিড়ল।

বিরাট বড় বন্দর। চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে। মাঝিমল্লার হল্লা—লোকেদের কলরব। বন্দর-প্রহরীকে ছাড়পত্র দেখাতে হল আবার—ঘাটে বজরা বেঁধে সর্বেশ্বরের সঙ্গে ওপরে উঠে এল সবাই। কার্তিক দলবল নিয়ে চলে

গেল বাজারের দিকে। আহার্য সামগ্রী কেনাকাটা করে ফিরে আসবে বজরায় আহারাদির পরে অবস্থান করবে বজরার পাহারায়।

সূর্যকান্ত চলল সর্বেশ্বরের সঙ্গে তাঁর বাসায়। দেখতে দেখতে আসছিল সূর্যকান্ত, সপ্তগ্রামের বন্দর-বাজারে নানা শ্রেণীর লোকের সমন্বয়, নানা জাতের আনাগোনা। বন্দরে ভিড়ে রয়েছে বড় একখানা জাহাজ—জিনিস বোঝাই হচ্ছে তাতে। চাল, লাক্ষা, কাগজ, চিনি ও মসলিনের কাপড় স্তূপীকৃত হচ্ছে জাহাজে—যাবে বিদেশে। অন্যদেশে এসব জিনিসের খুব চাহিদা। বন্দর তৎপর হয়ে উঠেছে বাণিজ্য-সম্ভারে।—বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচিত্র পোশাক-পরা কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ, স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের আচার-ব্যবহারে বিস্তর তফাত। সূর্যকান্ত দেখল ওই সব বিদেশী বণিকেরা চলাফেরা করছে বীরদর্পে, যেন সপ্তগ্রাম তাদের খাসদখলে। কুঠিনির্মাণ ও ব্যবসায়ের অনুমতি তারা অবশ্য পেয়েছে কিন্তু চালচলন দেখে মনে হয়, ওরাই যেন এখানকার সর্বেসর্বা। পণ্য ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলছে উদ্ধত ভঙ্গিতে, জিনিসপত্র কিনে টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছে অবহেলায়, শিস দিতে দিতে রাস্তায় চলেছে নবাবের মতো। বলদর্পী অর্থলোভী জাত—মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি এখনও। অধিকন্তু জলপথে অত্যাচার—সম্পত্তিনাশ ও নারীহরণ। নিঃসন্দেহে লুটেরার দল—সপ্তগ্রাম ছারখার হবে ওদের অত্যাচারে।

সূর্যকান্ত দাঁতে দাঁত ঘষল—এগিয়ে চলল দেখতে দেখতে।

আগেই শুনেছিল তার আশ্রয়দাতার বাড়ি সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে, হেঁটে যেতে হবে এটুকু পথ। দুদিন ও দু-রাত্রি বজরায় কেটেছে—হেঁটে যেতে ভালই লাগছিল। মনিবের তাড়া খেয়ে কার্তিক যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে বজরা চালিয়ে এনেছে, কিছু আগেই পৌঁছে দিয়েছে তাদের। এখনো বেশ দিনের আলো রয়েছে, কিছু আগেই পৌঁছে দিয়েছে তাদের। এখানে বেশ দিনের আলো রয়েছে, সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্র-উদ্ভাসিত সপ্তগ্রামের কোলাহল মুখরিত বন্দর ও বাজার পার হয়ে তারা দুর্গের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলল আরও দক্ষিণে। সুদৃঢ় দুর্গ—নগর ও বন্দর রক্ষার জন্য সৈন্য মোতায়েন। কিছু কিছু সেনানায়কদের সাথে সাক্ষাৎ হল—সঙ্গী সর্বেশ্বর তাঁদের অভিবাদন করে কুশল-সংবাদ নিলেন। তিনি এ অঞ্চলে পরিচিত, পথ চলতে চলতে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে তার সমান হৃদ্যতা। অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন জানাতে জানাতে তিনি পথ চলছিলেন।

কলরব স্তিমিত হয়ে এল—দুর্গ পড়ে রইল পিছনে। ক্রমে এল বাড়িঘর—লোকজনের যাওয়া-আসা। সূর্যের তেজ আরও ম্রিয়মান। আকাশগাত্রে সাদা

আলোর ঝলক—বেড়ে উঠল পাখিদের কলরব। সন্ধ্যা সমাগত। অস্পষ্ট অন্ধকার নেমে আসতে লাগল অঞ্চল জুড়ে।

অনেকখানি দূরে চলে এসেছে ওরা। গৃহস্থ বাড়ি হতে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—বাড়িঘর আবার ঘনীভূত হয়েছে। ছোট একটা পাড়ার মতো। চোখে পড়েছিল, বড় একটি দ্বিতল গৃহ অন্যান্য বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে। কে যেন দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে খবর দিল ওই গৃহে। ছোট দুটি ছেলে ও মেয়ে এসে দাঁড়াল দ্বারদেশে। হাততালি দিয়ে সংবর্ধনা জানাল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

গৃহস্বামী বাহু প্রসারিত করে তাদের বক্ষে টেনে নিলেন।

'আসুন—'

'সূর্যকান্ত সর্বেশ্বর সেনের বাড়িতে উঠল।

ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ ব্যস্ত—তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া মুশকিল। পিতার পরিচিত তিনি—আলাপ হলে পিতৃপরিচয় প্রদান করত সূর্যকান্ত। কিন্তু ফিরিঙ্গি হাঙ্গামার সঙ্গে চুরি-ডাকাতি বেড়ে উঠেছে বেজায়—তিনি কখন কোথায় থাকেন সঠিক কেউ বলতে পারল না। তার মানে সাক্ষাৎ সুদূরপরাহত।.....পিতার অন্যতম পরিচিত ব্যক্তি, সৌকত আলি খাঁ সম্বন্ধেও সেই একই বৃত্তান্ত। নাওয়ারার কর্মচারী তিনি, জাহাঙ্গীরী আমলের নামকরা আমীর একজন, প্রথম দিন সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তিনি সপ্তগ্রামেই আছেন, তবে আবাসগৃহে না থেকে বেশির ভাগ সময় কাটান দুর্গমধ্যে। কোন্ সময়ে আবাসগৃহে পাওয়া যায় জেনে নিয়ে সেদিনের মতো এসেছিল সূর্যকান্ত।

বাস্তবিক পদস্থ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাওয়া বড় সহজ নয়। ইচ্ছা হলে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, প্রয়োজন ফুরোবার পর হয়ত তাঁর দেখা মেলে। বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়—উপহার, খোশামোদে, যদি অধস্তন কর্মচারীদের মন জয় করা যায় এবং দয়া করে তারা যদি হদিস বা এত্তেলা দেয় তবেই সাক্ষাৎ সম্ভব। সূর্যকান্ত দ্বিতীয় দিন ঘোরাঘুরি করে এই জ্ঞান সঞ্চয় করল। এবং জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির করল, তাড়াহুড়ো করার দরকার কী, সবেমাত্র সপ্তগ্রামে এসেছে সে, দিনকতক অবস্থান করে এখানকার হালচাল বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই হবে।......সেই ফিরিঙ্গি কোশার সন্ধান পাওয়া যায়নি, তবে সপ্তগ্রাম বন্দরে তারা এসেছে এতে ভুল নেই। বাদশাহীর নৌবহরের শাস্ত্রীপ্রহরীর কাছ হতে তার হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। ইন্দিরাকে তারা সপ্তগ্রামেই এনেছে—এটাই ফিরিঙ্গি বণিক-সম্প্রদায়ের ঘাঁটি। কিন্তু এই বিপুল জনারণ্যে ইন্দিরা কোথায় তার সন্ধান কে দেবে?

আর, ফিরিঙ্গিরাও হীনবল নয়। নির্বিচারে গুলি ও তোপ চালাতে পারে—

নির্দ্বিধায় গ্রাম জ্বালাতে তাদের মনুষ্যত্বে বাধে না—নির্বিকার চিত্তে লুটতরাজ তাদের স্বভাব। এ রকম একটি দস্যুজাতের অবস্থান কেন্দ্রে একা ইন্দিরার অনুসন্ধানে ঘোরাঘুরি ঠিক নয়। এখন তার হাতে কোনো শক্তি নেই। এখন সম্পূর্ণরূপে সে পরনির্ভর। আশ্রয়দাতা সর্বেশ্বর বিব্রত নিজের ক্ষয়ক্ষতিতে—তাঁকে সর্বদা লোক মোতায়েন রাখতে হয় বন্দরে ও গৃহে। সাহায্য চাইলে হয়ত তাঁর কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে কিন্তু তা কী যথেষ্ট শত্রুর শক্তির তুলনায়?.....ভাল হত, যদি ফৌজদার কিংবা সৌকত আলি খাঁ-র সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যেত। তাঁদের সাক্ষাৎই পাওয়া গেল না—সাহায্য তো দূরের কথা! তাহলে অবশিষ্ট থাকে কী? একমাত্র অপেক্ষা। — রাঘব রণসাগরে ফিরে গেছে, কুল-পুরোহিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে যদি লোকবল সংগ্রহ করে আনতে পারে তাহলে বুকে জোর পাওয়া যায়, দস্যুদের মোকাবিলা সম্ভব। অন্তত নিজের কিছু লোকবল না থাকলে ফিরিঙ্গিদের মুখোমুখি দাঁড়ানো চরম হঠকারিতা। তাতে না হবে ইন্দিরা-উদ্ধার না হবে ফিরিঙ্গি-দলন। মাঝখানে পণ্ড হয়ে যাবে সব।

সূর্যকান্ত ভেবে দেখল গুরুতর একটা ব্যাপারে সে হাত দিতে যাচ্ছে, ইন্দিরার জন্যে যদিও তার হৃদয় ব্যথিত ভেবেচিন্তে না এগোলে ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। হয়ত ইন্দিরার ওপর পীড়ন বৃদ্ধি পাবে আরও। সেটা অসহ্য। আর, ইন্দিরা যদি বুদ্ধিমতী হয়ে থাকে, সে যে বুদ্ধিমতী তা তার চেহারা ও উপস্থিতিতে অনায়াসে অনুমান করা যায়, তাহলে বিপদে বিভ্রান্ত না হয়ে একটা কোনো পথ আবিষ্কার করে আত্মরক্ষা করতে পারবে। — বিপদে সব সময় মধুসূদন রক্ষা করে না, নিজেকে নিজে রক্ষা করতে হয়। ইন্দিরা যদি তা পারে, পারবে বলেই মনে হয়, তাহলে বর্তমানে যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাতে অপেক্ষা করাই সমিচীন।

সূর্যকান্ত উত্তেজনা দমন করল এবং সুসময়ের অপেক্ষা করতে লাগল।

দুদিন ঘোরাঘুরি করে সে কারো সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি—এ যেন এক হট্টমালার দেশ, কে তার তোয়াক্কা করে! নীতি নেই, শাসন নেই, যথেচ্ছাচারে টগবগ করে ফুটছে সপ্তগ্রামের বন্দর। গঙ্গার জল ঘোলা করে বিদেশী পণ্য-জাহাজ এসে ভিড়ছে, জিনিসপত্র কিনছে আর চলে যাচ্ছে। কোথাও জুলুমবাজি—লোক-জনের আর্তনাদ। ক্ষমতার জুলুম, ধর্মের জুলুম। ফিরিঙ্গি পাদ্রীরা দিকে দিকে ওঁত পেতে বসে আছে, নিরীহ লোকেদের ধরছে আর জোর করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। যারা ধর্মান্তরিত হতে চায় না তাদের ওপর নিদারুণ অত্যাচার।—একটা দানবীয় উল্লাস সর্বত্র। সুপরিকল্পিত প্রতিরোধ না হলে সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এখন সপ্তগ্রামে ফিরিঙ্গি বণিক ও পাদ্রীদের প্রভাব অপ্রতিহত।

বুঝল সূর্যকান্ত - বুঝে তৃতীয় দিন সকালে সে চলে গেল গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে। বন্দরের কাছাকাছি একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে চেয়ে রইল উত্তর দিকে। রাঘব যদি আসে তবে এ পথ দিয়েই আসবে। রাঘব না আসা পর্যন্ত সহসা সে কিছু করতে চায় না। উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত গঙ্গা—পশ্চিম থেকে এসে মিশেছে সরস্বতী। এটা উত্তরের সঙ্গমস্থল—বেনী মুক্ত করে উভয়ে ছুটে চলেছে সাগরে। সে কারণেই জায়গাটার নাম, মুক্তবেণী। দুটো নদীর পানে চেয়ে দেখল সূর্যকান্ত, গঙ্গা রীতিমতো পরিপূর্ণা, কিন্তু সরস্বতী যেন বিগতযৌবনা—ক্রমশঃ স্রোতহীনা হয়ে আসছে সরস্বতী। গঙ্গার কলেবরের তুলনায় শীর্ণা মনে হলেও, সূর্যকান্ত দেখতে পাচ্ছিল সরস্বতীর বুকে নৌচলাচল অব্যাহত, চার পাঁচ হাজার মনের একখানি প্রকাণ্ড মহাজনী নৌকো মোহানা ডিঙিয়ে স্বচ্ছন্দে ভেসে যাচ্ছে সরস্বতীর স্রোতে। মাঝি মল্লাদের হাত উঠছে আর পড়ছে।

বড় বড় নৌকোর পানে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে সূর্যকান্তর। মনে হয় সে-ও দূরান্তের যাত্রী, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাত্রা বুঝি। সরস্বতীর তরঙ্গ -ভঙ্গে দুলতে দুলতে, দুপাশের ঘন বনরাজিনীলায় নৌকোখানা মিলিয়ে যেতে যেতে যেন একখানি ছবি হয়ে উঠল—সূর্যকান্তর মনে হল তার ইচ্ছাটা বুঝি ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আর কি! রাঘবের সঙ্গে সে বেরিয়েছিল, কিন্তু এসে ঠেকল কোথায়? এখানে আসবে তা কী সে একবারও ভেবেছিল? কিন্তু ঘটনাচক্র তাকে নিয়ে এল সাতগাঁয়ের বন্দরে—!

ভাবতে ভাবতে নৌকোর ছবি নয়—সর্বেশ্বর সেনের গৃহচ্ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। বাঙালি বণিক সর্বেশ্বর সেন, বণিকসুলভ ব্যবসায়ী আচরণ নেই স্বভাবে। যথার্থই অতিথিপরায়ণ। বজরায় যেমন বাড়িতেও তেমনি। দুটি ছেলেমেয়ে — ছেলেটি বড়, নাম সুরেশ্বর, বয়স বারো। কন্যার নাম লীলাবতী, সবে ন'য়ে পড়েছে। সুস্বাস্থ্য দুজনেরই, ফুটফুটে চেহারা, সুন্দর দেখতে। সূর্যি মামা বলে ডেকে এক নিমেষে অপরিচয়ের দূরত্ব দূর করে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ বলে বিশেষ রেয়াত করল না — তাদের সরল শোভন ও আন্তরিক ব্যবহারে খুশি হয়ে আছে মনটা। কিন্তু তাদের মায়ের আচরণে লজ্জা পেতে হল। ছেলে-মেয়েদের মামা হয়েই সে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ শুনে ওদের মা ঘটি করে জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিলেন বারণ সত্ত্বেও — আড়ষ্ট হয়ে যেতে হয়েছে তখন। আহারাদির ব্যবস্থা করেছেন অতি যত্নে—বিশ্রামের বন্দোবস্ত করেছেন আলাদা একটি ঘরে। পুরো একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্যে। অসুবিধা নেই এতটুকু।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সূর্যকান্ত। নানা ভাবনা আসছে।

উত্তরদিকে তাকাল আবার। বেলা বেড়ে উঠেছে। রাঘব কী আজও আসবে না?

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবে সূর্যকান্ত। তার মন বলছে আজ রাঘব আসতে পারে। যদি আসে, তারই দেখা করা উচিত। না হলে রাঘব খুঁজে পাবে কী করে?—রাঘব তো জানে না সে সর্বেশ্বরের ঠিকানায় আছে।

সূর্যকান্ত উন্মুখ হয়ে বসেছিল উত্তরদিকে তাকিয়ে। গঙ্গার জলে সূর্যের ঝিকিমিকি। প্রসন্ন সকাল।

....তাকে যে কেউ লক্ষ্য করছে তা সে ভাবেনি।

কিন্তু একজন লক্ষ্য করছিল।

সরস্বতীর মোহনায় ছোট বড় অনেক নৌকোর ভিড়। বন্দরে কেনা-বেচার কাজে এরকম ভিড় জমে থাকে প্রায় প্রতিদিনই। জিনিসপত্র কেনাবেচা করে ব্যবসায়ী বড় নৌকোগুলো চলে যায় যে যার নির্দিষ্ট পথে। কেউ যায় সরস্বতীর পথে হিজলীর দিকে কেউবা গঙ্গার স্রোত ধরে জাহাঙ্গীরনগর অভিমুখে। ছোট ছোট নৌকোগুলো ছোট ছোট ব্যবসায়ীর—নৌকো বোঝাই করে দূরের কোনো স্থানে চলে যায় কেউ, অধিকাংশই ফিরে যায় স্ব স্ব গ্রামে—গ্রাম-কেন্দ্রিক বিচারে ব্যবসা তাদের। সব শ্রেণীর মানুষই সপ্তগ্রাম বন্দর-নির্ভর। এখানে আসতে হয় ছোট বড় সকলকেই—বাঙলা মুলুকের বিরাট একটা অংশের অন্নসংস্থান জোটে এ অঞ্চল থেকেই। মানুষে ও পণ্য-সম্ভারে গমগম করে সপ্তগ্রাম বন্দর ও বাজার।

অতএব মৌচাকের মতো দেশ-বিদেশের নৌকো এসে ভিড় করবে তাতে আর বিচিত্র কি।

বাসোপযোগী দু-একখানা প্রশস্ত শৌখিন বজরাও দেখা যায় কখনও কখনও। নৌকোর ভিড় থেকে সরে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জলে ভাসে ভালোভাবে। দেখে বোঝা যায়, ধনী বা অভিজাতশ্রেণীর বজরা। বন্দর অপেক্ষা জল-ভ্রমণেই তাদের অধিক আনন্দ। মহিলারা থাকেন—নাচ-গান-বাজনা চলে। জলের ওপর যেন জলসাঘর বসে যায় পুরো দস্তুর। —আমিরী ঢঙে বিলাস উপভোগ।

ফিরিঙ্গিদের উপদ্রবে এ ধরণের বজরার আনাগোনা ইদানীং কমে গিয়েছিল বেশ—সাহস করে কেউ আসত না বড় একটা। প্রাণ নিয়ে যেখানে টানাটানি—প্রমোদের উৎসাহ সেখানে না-থাকাই স্বাভাবিক। তবু দেখা গেল একখানি সুসজ্জিত প্রমোদ-তরুণী নৌকোর ভিড় থেকে অল্প সরে জলে ভাসছে অচল হয়ে। কারুকাজ-করা শৌখন বজরা। মনে হয় বুঝি বাদশাহী নিরাপত্তায় তার এ দুঃসাহস। কিন্তু কাছাকাছি অন্য কোনো প্রহরী নৌকো ছিল না, বাদশাহী নৌবহর নেই কাছে পিঠে। বজরাটি ভাসছে একা একা।

বজরার কামরার সামনে দুজন মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে একজন যুবতী ও সুন্দরী, অপরজন প্রৌঢ়া ও রূপহীনা। বোঝা যায় সুন্দরী কর্ত্রী আর প্রৌঢ়া তার দাসী। সুন্দরীর মাথাভর্তি ঘ০.কৃষ্ণ চুল—পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে নিচে। নাকে ও কানে স্বর্ণাভরণ, গলায় দামী পাথরের হার সকালের রোদে ঝকঝক করছে। পোশাক পরিচ্ছদ দুর্মূল্য সুরুচির পরিচায়ক। কামরার ফোকরে তার মুখ—প্রাণোচ্ছল দুটি বড় বড় চোখ, নিপুণ-হাতে তাতে সুর্মা-টানা, ঘন পক্ষ্ম, ধনুকের মতো বাঁকানো ভুরু। চুলে ঢাকা ছোট কপাল, খাড়া নাক, রক্তের মতো লাল ঠোঁট, পাতলা চিবুকের রেখা টান হয়ে নেমেছে, ফর্সা গায়ের রঙ, শাঁখের মতো বঙ্কিম গ্রীমা, দীর্ঘাঙ্গিনী। .....তন্বী তনু। বজরার গায়ে ফুটে উঠেছে এক জলপদ্ম।

সে-ই লক্ষ্য করেছিল সূর্যকান্তকে। তাকিয়েছিল একদৃষ্টে। কী রকম যেন মুগ্ধদৃষ্টি।

দাসী বলেছিল, 'এলে বাদশাহী নৌবহরের সঙ্গে, তারা চলে গেল— তোমার কী মতি হল বজরা থামালে এখানে, বললে, তোমরা চলে যাও—অমি দুদিন পরে যাচ্ছি। কোন্ ভরসায় এখানে থাকবে শুনি? যদি হাঙ্গামা বাধে কে সামলাবে? তার চেয়ে হুগলীতে চলে যাওয়া ঢের ভাল—এ যেন নাট্টশালা—এখানে মানুষ থাকে?'

দাসী বকবক করছিল।

যুবতী মৃদু হাসল, বললে, 'আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। কত লোক—কী সুন্দর মানুষ—'

দাসী ঝংকার দিয়ে বললে, 'দরবারে নাচেব সময় যে হাজার হাজার মানুষ দেখে তার কাছে এই বন্দরের মানুষ হল সুন্দর?—কী চোখে যে মানুষ দেখছো, বোঝা ভার! তুমি হলে বিখ্যাত দরবারী নর্তকী, তোমার কাছে কত মানুষের আসা-যাওয়া, তাদের সঙ্গে কী এদের তুলনা? তারা রইস আদমি—আমীর আদমি—'

যুবতী কিছু না বলে চুপ করে ফুলের দিকে চেয়ে রইল।

দাসী বললে, 'কী দেখছো?'

যুবতী অঙ্গুলি সংকেতে জানাল, 'ওই যুবকটি অনেকক্ষণ বসে রয়েছে, ভারি সুন্দর দেখতে—'

'ও তো কাফের—'

'তাতে কী।'

'বেহায়ার মতো তাকিয়ে থেকো না। কখন্ কী ঘটে তার ঠিক নেই। সরে এসো—'

'কেন? কাফের কী বাঘ না ভাল্লুক?'

'তার চেয়ে সাংঘাতিক। তোমার যা রূপ—দেখতে পেলে মাথার ঠিক থাকবে কিনা সন্দেহ। ঝঞ্ঝাটে কী দরকার—'

'আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হয়েছে। পরস্ত্রী-জ্ঞানে তারপর থেকে আর এদিকে চোখ ফেরায়নি। দেখে মনে হয় তেজী, ভদ্র, শিক্ষিত যুবক—'

'সারা জীবন এত পুরুষ ঘাঁটলে তবু শখ মিটল না?'

দাসী যেন ক্ষুব্ধ।

যুবতী হেসে বললে, 'সাকিলা, সারা জীবনে তেমন পুরুষ দেখলুম কই। যারা এসেছে তারা সবাই আমাদের সমাজের লোক, আমাকে এগোতে হয়নি—তারাই আমার রূপযৌবন দেখে বাঘ-ভাল্লুকের মতো বাড়িয়ে দিয়েছে থাবা, মায়া-মমতা করেনি এতটুকু, শরীরটা ছিঁড়েখুঁড়ে ভোগ করে চলে গেছে। জানিস, চোখ ফেটে জল এসেছে এক-এক রাত্রে। আমি যেন সকলের ভোগের পাত্রী—আমার নিজের মন বলে ইচ্ছা বলে কোনো আলাদা জিনিস নেই। মাঝে মাঝে ধিক্কার জন্মে যায় এ জীবনের ওপর—'

'তা ও যুবকটিকে পেলে তুমি কী করবে?'

'বড্ড মন টানছে। আলাপ-পরিচয় হলে খুশী হতুম। যা চাইত তাই দিতুম। এমন রূপবান সুন্দর পুরুষ পেলে সব দিতে ইচ্ছা করে—'

'কাফেরের প্রতি অনুরাগ বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে নাকি বিবিজী?'

'এতদিন পরে, এই প্রথম মনে হচ্ছে পুরুষ দেখলুম। ওরে, আমিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ।'

'কী করতে ওকে পেলে? শাদি?'

'সে কপাল কী করছি রে। পায়ে যদি একটু ঠাঁই দেয়, সারা জীবন প্রাণ ভরে ভালোবাসতে পারতুম—'

'এখানে শাদি করার খুব ইচ্ছা হয়েছে, তাই না?'

'যদি করি ওই কাফেরকেই শাদি করব।—'

'গুলরুখ বিবিজী, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে বলে জানতুম কিন্তু এখন দেখছি তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।'

দাসীর কণ্ঠে অভিভাবকত্বের সুর : 'বলি, কী দুঃখে কাফের বিয়ে করতে যাবে? মুসলমানের ঘরে কী উপযুক্ত পাত্র নেই? তারা কী কেউ রূপবান নয়?'

'সাকিলা তুই চটে গেছিস।' যুবতী বললে, 'মুসলমানের ঘরে সৎ ও রূপবান পাত্র নিশ্চয় আছে, আমি সে কথা বলিনি, ওই যুবকটি আমার মনে ধরেছে এবং প্রথম দর্শনের ক্ষণ থেকেই কেন যেন বিচলিত হয়ে উঠেছি। ঠিক এমনটি

আগে কখনও ঘটেনি, জাত-ধর্মের কথা মনেও আসেনি। এ যে কী জিনিস তা তোকে বোঝান শক্ত—'

সাকিলা বললে, 'জন্ম থেকে তোমাকে দেখে আসছি, তোমার মা মারা গেল, তুমি মানুষ হলে আমার হাতে। বড় হলে। মায়ের মতো নাচ শিখলে। রূপ-যৌবন ছিল, ঠাঁই পেলে দরবারে। কত গুণমুগ্ধ আমীর-উজীর তোমাকে পাবার জন্যে লালায়িত—তাকে ছেড়ে কিনা—'

গুলরুখ কপালে টোকা মেরে বললে, 'আমার নসিব।'

'ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যায় গুলরুখ বিবিজী,' সাকিলা বললে, 'কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালে, কত লোকের সঙ্গে মিশলে, কত মানুষ দেখলে—একজনকেও কী মনে ধরল না তোমার?'

গুলরুখ হেসে বললে, 'সাকিলা, তুই আমার মায়ের দাসী ছিলি, মা মরে যাবার পর আমাকে মানুষ করেছিস, সব সময় ছায়ার মতো আগলে আছিস—দাসী হলেও আমাদের সম্পর্ক অন্যরকম। কখনও অভিভাবিকা, কখনও সখি। প্রাণের এত কথা আর কারো কাছে বলি না। যদি অভিভাবকত্ব একটু কমাস তাহলে তোর কথার সত্যি জবাব দিই —'

'অভিভাবিকা বলে কত মানো!' সাকিলা বেজারমুখে বললে, 'আজ পর্যন্ত আমার কথা শুনেছো?' নিজের খেয়ালখুশির মতোই তো চললে! নিজের ভাল-মন্দ যে বোঝে না তার অভিভাবিকা হয়ে থাকতে চাইনে, আমার বাঁদীগিরিই ভাল—'

'তাহলে আর উত্তর দেওয়া হল না!'

'উত্তর যা দেবে তা আমি জানি।'

'কী?'

'এই কাফেরকে তোমার মনে ধরেছে।'

'আমি বাঁচলুম।'

মস্ত নিঃশ্বাস ফেলে গুলরুখ স্বস্তি প্রকাশ করল।

'আমি চললুম—'

সাকিলা রাগ করে চলে যাচ্ছিল।

গুলরুখ বললে, 'আমার সেতারটা দিয়ে যাস—'

সাকিলা ঘুরে দাঁড়াল, 'কী করবে?'

'কেন, বাজাব—'

'বাজাবে?—এত ভিড়ের মাঝে, বজরার সুমুখে বসে সেতার বাজালে লোকে কী বলবে?'

'কিছু বলবে না।' গুলরুখ হেসে উঠল, 'বরং শুনবে।'

'সেটা কী ভাল দেখাবে?'

'কেন দেখাবে না?' গুলরুখ বললে 'আমি কী সুলতানা আরজমন্দ বানু বেগম যে সারা হিন্দুস্থানের লোক আমাকে দুষবে? আমি তওয়াইফের বেটি, গুলরুখ বানু, আমার মা জাহাঙ্গীরনগর হতে লাহোর পর্যন্ত সারা হিন্দুস্থানে নেচে গেয়ে বেরিয়েছে—'

'ছি—এমন কথা মুখে আনতে নেই, তোমার মা বেহেস্তে গেছেন। তিনি তওয়াইফ ছিলেন বটে কিন্তু কসবি ছিলেন না।'

'দূর—আমি কী তাই বলছি? মা তো পেশোয়াজ পরে মজলিসে নামতেন, নামতেন না? তবে আমি যদি বজরার সুমুখে বসে সেতার বাজাই তাতে দোষ কি?'

'তোমার সঙ্গে কথায় পেড়ে ওঠা আমার কর্ম নয়। তার চেয়ে হুকুম তালিম করা ঢের সহজ।'

'তাই করছিসনে কেন?'

'যাচ্ছি—'

সাকিলা সেতার আনতে চলে গেল।

রাগ করেছে। তা করুক। মায়ের কালের দাসী বলে সব সময় ফপরদালালি শুনতে হবে তার কী মানে? একটু-আধটু রাগ করা ভাল। তাতে আর-কিছু না হোক—নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবে। প্রতি কথায় কথায় কৈফিয়ত— যেন বাদশাহজাদী। অন্য দাসী হলে কবে চাকরি চলে যেত, নেহাত মানুষ করেছে আর সুখে-দুঃখে কখনও কাছ-ছাড়া হয় না তাই রাখা। তবু সীমা ছাড়িয়ে গেলে মাঝে মাঝে শক্ত হতে হয় বই কি। যেমন এখন। এ মুহূর্তে ওকে সরানো বিশেষ দরকার ছিল। অনুগত ভৃত্য আজমল রয়েছে বজরার ছাদে বসে, মাথায় বুদ্ধি এসেছে, ওকে পাঠাতে হবে যুবকের কাছে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসুক।

গুলরুখ ইশারায় ডাকল আজমলকে।

আজমল খাঁ একটু অপরিচ্ছন্ন বটে কিন্তু বৃদ্ধ ও বিশ্বাসী। খুব অনুগত। বুদ্ধিমান।

সে ছাদ থেকে নেমে সেলাম করে দাঁড়াল হুকুমের অপেক্ষায়। গুলরুখ বললে, 'আজমল, ওই তেঁতুলগাছের তলায় একজন কাফের যুবক বসে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ?'

আজমল সেদিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল, পাচ্ছে।

গুলরুখ বললে, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। পারবে কী?'

আজমল নিঃশব্দে হাসল। অর্থাৎ একথা জিজ্ঞেস করা বাহুল্য মাত্র। হুকুম হলে তামিল করা তার স্বভাব।

গুলরুখ বললে, 'তোমাকে গোপনে ওর পরিচয় জেনে আসতে হবে। এমনভাবে জানবে যেন কোন সন্দেহ না করে আর আমাদের পরিচয় জানতে না পারে। বুঝতে পেরেছো?'

'বুঝেছি।'

'পারবে?'

'আলবত।'

'যাও—'

আজমল সেলাম করে বজরা থেকে নেমে যাওয়ার পরক্ষণেই সাকিলা ফিরে এল সেতার নিয়ে।

'দে—'

হাত বাড়িয়ে সেতারখানা নিল গুলরুখ। গজদন্তনির্মিত মকরমুখ অত্যন্ত দামী সেতার। গুলরুখের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। সে সেতার বাজাতে বিশেষ নিপুণা।

তারগুলো ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। সে তার টেনে সুর বাজাচ্ছিল। আর আড়নয়নে তাকিয়ে দেখছিল, আজমল তেঁতুলগাছের তলায় যুবকের ঠিক পাশটিতে গিয়ে বসেছে, খুব কাছাকাছি। যেন গঙ্গা শোভা দর্শন ব্যতীত তার অন্য উদ্দেশ্য নেই; নিরীহ, গোবেচারা ভঙ্গি। —পারবে, ওর পক্ষেই সম্ভব। দেখে হাসি পাচ্ছিল, গুলরুখ কষ্টে হাসি থামিয়ে সেতারখানা তুলে নিল বুকে। সুর বাঁধা হয়ে গেছে, না বাজালে সাকিলা কিছু মনে করতে পারে। তাছাড়া মনটা প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে—মনের মধ্যে সুর গুন্‌গুন্ করছে, বহিঃপ্রকৃতিতে সুর, গঙ্গায় সুরলহরী ভেসে যাচ্ছে, আকাশের গা বেয়ে সুরের আলোকধারা গড়িয়ে পড়ছে—এখনই তো আশাবরীর বন্দনা চলে। কড়িতে-কোমলে ললিতে-কঠোরে তার প্রেমময় ব্যথিত রূপ ফুটিয়ে তোলার এই তো সময়!

চাঁপার আঙুলগুলো লীলায়িত হয়ে উঠল। গায়কী তারে লাগল যাদুকরী স্পর্শ। যেন প্রাণ পেয়ে উঠল সেতার। মেজরাবের আঘাতে আঘাতে ফুটে উঠতে লাগল আশাবরীর ব্যথিত সুন্দর রূপ।—খেয়ালই করল না গঙ্গার তীরে জমে উঠেছে রসিক শ্রোতার দল, কাজ ভুলে লোক দাঁড়িয়ে গেছে তার সেতার শুনে। অবাক হয়ে সেতার শুনছে তারা, যেন এক বিস্ময়কর সংগীত-প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়েছে। গুলরুখ চোখ তুলল একবার, দেখতে পেল কাফের যুবকের চোখে মুগ্ধদৃষ্টি, একাগ্রমনে সেতার শুনছে সে। —যুবক তাহলে সংগীত-রসিক বটে! উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তার রূপ ও গুণের দিকে যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। আর কেন? তার গোলাপের মতো সুন্দর অধরে ঈষৎ হাসির রেখা

ফুটে উঠল—সে সেতার রেখে আস্তে আস্তে কামরার মধ্যে প্রবেশ করল। মুগ্ধ যুবক কৌতূহলী হোক।

এখন আজমলের কাজ। সে খবর সংগ্রহ্ করুক।

নদীতীরে দলে দলে ও নদীজলে নৌকোয় নৌকোয় লোকে স্তব্ধ হয়ে সেতারের আলাপ শুনছিল। সেকালে সপ্তগ্রামে সমজদারের অভাব ছিল না—অভাব একালে। যথার্থ—সমজদারের সংখ্যা একালে নিতান্ত অল্প। শুধু সপ্তগ্রাম নয়, সমস্ত গ্রামে ও শহরে, একালে প্রকৃত রসিকের বড়ই অভাব। রাগসংগীতের আসর হয়ত আগের চেয়ে অনেক বেশি বসে—কিন্তু অনুরাগী বিশুদ্ধ সংগীতশ্রোতা কজন তা বলা খুব শক্ত, ঠগ বাছতে আসর উজাড় হয়ে যাবে। একালে রাগসংগীতের আসর হয়ত আগের চেয়ে অনেক বেশি বসে — কিন্তু অনুরাগী বিশুদ্ধ সংগীতশ্রোতা কজন তা বলা খুব শক্ত. ঠগ বাছতে আসর উজাড় হয়ে যাবে। একালে রাগসংগীতের আসরে উপস্থিত থাকা একটা ফ্যাশান-বিশেষ, আধুনিকতার অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু সেকালে তা ছিল না—সমজদার রসিক শ্রোতারা ভিড় করত কাজ ভুলে। তন্ময় হয়ে যেত রাগের আলাপে বিস্তারে, বাহবা দিত। তখন রাগসংগীতের যথোচিত মর্যাদা ছিল।

সেতার থেমে গেলে স্তব্ধতা ভাঙল—সকলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। পারম্পর্যহীন নানা কথা। কেউ বলছে 'এ নিশ্চয় বাদশাহের বেটি, ফিরিঙ্গিরা ধরে এনেছিল, এখন প্রাণের দায়ে ছেড়ে দিয়েছে। সেতার বাজাতে বাজাতে ফিরে যাচ্ছে আকবরনগরে। আহা কী মিঠে হাত—'

আজমল বললে, 'উহুঁ—বাদশাহের বেটি নয়। বাদশাহের বেটি হলে কী দশের সামনে সেতার বাজায় বে আব্রু হয়ে? এ নিশ্চয় ইরাণের কোনো তওয়াইফ, সুবাদারের মজলিসে চলেছে মুজরো নিয়ে। খাস ইরাণী চিজ—দিল্, তরফ করে দিয়েছে একেবারে—'

এক বৃদ্ধ ফকির দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ওসব কিছু নয়। আমার মনে হয় বেটি নিশ্চয় পরীজাদী—আসমান ছেড়ে শিকারের চেষ্টায় মর্ত্যে নেমেছে। নইলে এমন রূপ আর গুণ কারো হয়? রূপ দেখে প্রাণে চক্কর লাগে আর গুণ দেখে বেহুঁশ হয়ে যায় মন—'

প্রথমজন বললে, 'ফকির সায়েব সরে পড়। তোমার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। শেষে জান-প্রাণ জখম করে এ বয়সে একটা কেলেংকারি বাধাবে?

ফকির সায়েব কানে আঙুল দিয়ে বললে, 'তওবা।'

দ্বিতীয়জন হেসে উঠল সশব্দে।

ভিড় আলগা হয়ে যাচ্ছিল—কথা বলতে বলতে যে যার পথে হাঁটা ধরেছিল। সূর্যকান্তকে যেতে হবে অনেকটা পথ, সে উঠব উঠব করছিল। সেই অবকাশে পাশ থেকে আজমল বলে উঠল, 'বাবুসায়েব বোধহয় শহরে নতুন এসছেন?'

অতি বিনীত ভঙ্গি—মোলায়েম কণ্ঠস্বর।

সুরের আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটেনি সূর্যকান্তের—তাও চিত্ত বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। তাই চমকে তাকাল। দেখতে পেল, এক বৃদ্ধ তার পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত মুখ ও মেহেদিসংযুক্ত শ্মশ্রু তার মুখের কাছে নিয়ে এসে প্রচুর পরিমাণে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছে। সূর্যকান্ত বিরক্ত হল। কিন্তু বুড়ে এমনই নম্র ও বিনয়ীর মতো প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে যে বিরক্তি প্রকাশ করতে সে লজ্জা পেল।

বুড়ো বললে, 'উপযাচক হয়ে কথা বলছি বলে মাফ করবেন। অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে লক্ষ্য করেছি। আপনি কী কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

সূর্যকান্ত বললে, 'হ্যাঁ।'

'এ শহরে বোধহয় নতুন এসেছেন?'

সূর্যকান্ত ঘাড় নেড়ে জানাল তার অনুমান সত্য।

'বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

ভদ্রতা করে জানাতেই হল সে বিরক্ত হচ্ছে না।

উৎসাহিত আজমল বললে, 'সপ্তগ্রাম বড় আজব শহর বাবুসায়েব, এমন শহর সুবা বাঙলায় আর দুটি নেই। যেমন রমরমা তেমন জমজমা। দেখবার জিনিস প্রচুর আছে। নতুন এসেছেন, জাফর খাঁ গাজীর দরগাহ দেখেছেন কি? দেখবার মতো জিনিস—এমন বাহারি ইমারত হিন্দুস্থানে বেশি নেই—'

সূর্যকান্ত বিস্মিত হচ্ছিল মনে মনে। কে এই বুড়ো? গায়ে পড়ে আলাপ করে এবং উপযাচক হয়ে সপ্তগ্রামের দ্রষ্টব্য স্থানের কথা জানায়? —উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য যাই হোক, দেখে তো মনে হয় গরীব মুসলমান। আগন্তুকদের কাছে সপ্তগ্রামের গুণগান গেয়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়ে বেড়ানোই হয়ত পেশা—প্রাপ্তিযোগের প্রত্যাশা ছাড়া আর কি হতে পারে? মায়া হল।

'দেখিনি।' সে জানাল।

'চলুন তবে, আপনাকে দেখিয়ে আনি—'

'চলুন।'

অল্প দূরে, তেঁতুল গাছের পেছন দিকে, পাষাণ-নির্মিত সুদৃশ্য সমাধি-মন্দির। জাফর খাঁ গাজীর দর্‌গা। তারা দুজনে সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করল।

বজরার গবাক্ষ থেকে তা দেখতে পেল গুলরুখ। হাসল মনে মনে। চতুর

লোক আজমল—ঠিক খবর সংগ্রহ করে আনতে পারবে। যুবককে দেখা অবধি প্রাণের মধ্যে উথাল-পাথাল করছে—ধ্বক ধ্বক শব্দ হচ্ছে বুকে। কোন পুরুষ দেখে এমন আশ্চর্য অনুভূতি হয়নি কখনও। —একে কী বলে?—গুলরুখ নিজের কথা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু এমন উতলা হলে চলবে না। আজমল খবর আনুক—তারপর দেখা যাবে। আপাততঃ কিছু অর্থের প্রয়োজন। হাওলাত করতে হবে মহাজনের কাছে। এখানে একজন বড় মহাজন আছে—খত লিখে দিলে তার কাছে প্রয়োজনমত অর্থ হাওলাত পাওয়া যাবে। সেটাই এখন প্রধান কথা।—হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও।

'সাকিলা—'

সে ডাকল।

'হুকুম করো?'

সাকিলা পাশে এসে দাঁড়াল।

'দেখ্ তো বসীর আহমদ বজরায় আছে কিনা?'

'আছে বোধ হয়।'

'ডেকে দে—'

বলে বাতায়নের পাশে বসে চিঠি লেখার সরঞ্জাম টেনে নিল।

বাইরে এসে সাকিলা দেখল, বজরার পেছনে একখানি পানসির ওপর দাঁড়িয়ে ফরশিতে তামাকু সেবন করছে বসীর। খানিক আগে আফিঙ খেয়েছে নিশ্চয়, ফরশি টানছে বুঁদ হয়ে। আফিঙ আর তামাক ওর নেশা। লম্বা, সিড়িঙ্গে চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। রোগশীর্ণতা আছে। চেহারাটি এমনই শীর্ণ যে মনে হয় জোরে বাতাস দিলে বুঝি উল্টে যাবে।

সাকিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল। বাতাসে বসীর মিয়ার উসকো চুল উড়ছে—দাড়ি ঝুর ঝুর করছে। পানশির ওপর দাঁড়িয়ে তামাকু সেবন করছে ঠিক একটা সঙের মতো। পড়ো পড়ো ভঙ্গি, কিন্তু পড়ছে না। হেসে ফেলল সাকিলা। বললে, 'ও মিয়া সায়েব, বজরায় উঠে এসো, যে রকম টলটল করছ এখুনি পড়ে যাবে যে!'

তাকে দেখে ফরশীর নল নামাল বসীর আহমদ। করুণ চক্ষে তাকিয়ে বললে, 'ওখানে গেলেই যে টিকে থাকব তার নিশ্চয়তা কি। এখানে বাতাসের ঝাপটা আর ওখানে ওই সুন্দর মুখের ঝাপটা—টলে যদি পড়ি এই নদীবক্ষই প্রশস্ত—হাহুতাশ করতে হবে না, স্রোতে ভেসে জাহান্নমে কি বেহেস্তে যেখানে হোক চলে যাব —'

'খুব হয়েছে বেওকুফ কঁহাকা!' সাকিলা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'শিগগির উঠে এসো—নইলে গর্দান যাবে।'

মৌজ ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এল বসীর আহমদ। বললে, 'এমন ভাবে ধমক দিলে যে পেটের পিলে চমকে ওঠে। টাল সামলাতে পারি কিনা দেখি। কি হয়েছে গো সাকিলা বিবি?'

'হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু।' সাকিলা তেমনি ঝাঁজের সঙ্গে বললে, 'বিবি-সাহেবা তলব করেছেন। যাও শিগগির—'

'কেন গো সাকিলা-বিবি, হঠাৎ এ সময়ে তলব কেন?'

'কী জানি বাপু, আমি জানি না—'

'তুমি জানো না তা কী হয় কখনও?' বসীর আহমেদের নেশা ছুটে গিয়েছিল বললে, 'গতকাল রাত্রে সাহেবা সেতারের মেজরাব খরিদ করতে বলেছিলেন, মনে পড়ছে, আমি সন্ধ্যেবেলায় আফিম খেয়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি জানো আফিঙ ছাড়া একদণ্ড বাঁচতে পারিনে। আর এখানে যে আফিঙ পাওয়া যায়—একেবারে খাস চিজ! খেলেই দিল, তর্‌র্ হয়ে যায়।......আজ সকালে বিবির হাতে সেতার দেখে গতকাল সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল, তাই ডিঙির ভেতরে লুকিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার ওই সুন্দর চোখের দৃষ্টি থেকে কী পরিত্রাণ পাবার জো আছে? জাহান্নমে গেলেও খুঁজে বার করবে—'

'তুমি গেলে আমার হাড় জুড়োয়।'

করুণচোখে চেয়ে বসীর আহমদ বললে, 'একা একা যাব?'

'আবার কে যাবে সঙ্গে?'

বসীর আহমেদ কপাল চাপড়ে বললে, 'হায় আল্লা! মেয়েমানুষের প্রাণে কী দয়ামায়া নেই?—কী নিষ্ঠুর তুমি!

'ফের বেতমিজি হচ্ছে? বলে আসব বিবি-সাহেবাকে?

'দোহাই বিবিজান, ও-কাজটি কোরো না। এই নাক-কান মুলছি আর এমন কথা বলব না। এখন বলো দেখি, বিবি-সাহেবার মেজাজটা কেমন দেখলে?'

সাকিলার মন নরম হল ওর উদ্বিগ্নতা দেখে। দয়াপরবশতঃ বললে, 'মিয়াসায়েব, এটুকু বলতে পারি তোমার নসিবে আজ দুঃখ নেই। মেজাজ বড়ই খোসা, সাহেবার প্রাণে আশিক জেগেছে। তুমি নির্ভয়ে যেতে পারো—'

'তবে এত ভেবে মরছি কেন?' বসীর মিঞা দাড়িগোঁফ চুমরে খাড়া হয়ে দাঁড়াল: 'যাও, তুমি এত্তেলা দিয়ে এসো।'

সাকিলা বললে, 'ভারি আমার মাননীয় পুরুষ রে। এত্তেলা দিতে হবে না সোজা চলে যাও—'

'যাব?'

'নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখবে?'

'বিবিজান, তাই-বা হচ্ছে কই!'

'ফের—'

'আচ্ছা যাচ্ছি।'

বজরার প্রথম কক্ষের কাছে এসে কিংখাবের পর্দা উঠিয়ে ভেতরে ঢুকে বসীর মিএগ। গুলরুখ তখন বজরার বাতায়নের পাশে বসে চিঠিখানা লিখছিল— বসীর মিএগ সেলাম করে তটস্থভাবে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠি লেখা শেষ হয়ে এসেছিল, গুলরুখ আর-একবার পড়ে দেখল। মনোমতো লেখা হয়েছে দেখে ভাঁজ করে লেফাফায় পুরল—কুন্দদন্তে টিপে ধরে বন্‌ধ করল লেফাফা এবং হাতীর দাঁতের তৈরী সুন্দর একটি কৌটো হতে গালা ও মোহর বার করল, তা দেখে বশীর পাশের কক্ষ থেকে প্রজ্জ্বলিত বর্তিকা নিয়ে এল। পরে মোহর করে গুলরুখ সেটা বসীরের হাতে দিল এবং বললে, 'এ চিঠিখানা মীনা-বাজারের সর্বেশ্বর সেনের কুঠিতে দিয়ে এক হাজার আসরফি নিয়ে আসবে। চিঠি দেখালেই টাকা পাবে—'

বসীর আহমদ চলে যাচ্ছিল, গুলরুখ ফের বললে, 'আর শোন, ফেরার পথে আজই একটা বাড়িভাড়া করে আসবে। আমি আকবর নগর যাব না, এখানেই কিছুদিন থাকব। বুঝতে পারলে?'

'জী—'

বসীর মিয়া সেলাম করে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গতকালের জের নয়, মেজরাব টেজরাবের ভয় মিথ্যে—আশিকের ব্যাপারই বটে। কারো প্রাণে আশিকের রোশনাই—কারো দিল, তেতাপের বারুদে ঠাসা!

হায়, সব জানানা এক রকম হয় না কেন?....

সূর্যকান্ত আজমল খাঁর সঙ্গে জাফর খাঁ গাজীর কবর, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি কয়েকটা স্থান দেখে ফিরে এল সেই তেঁতুল গাছের তলায়। রোদ বেড়ে উঠেছে। ঘোরাঘুরি হয়েছে অনেকক্ষণ। এবার ফিরে না গেলে ক্ষুদে 'ভাগনে-ভাগনি' দুটি ভাববে—তাদের মা দুশ্চিন্তায় পড়বেন। সূর্যকান্ত জেব্ থেকে কিছু অর্থ বার করে বললে, 'আপনার খুব কষ্ট হল, এই নিন—'

কিন্তু আজমল অর্থ গ্রহণ করল না। তার উদ্দেশ্য এখনও সফল হয়নি। সায়েবের ঠিকানা জানা হয়নি।

সে বিনীতস্বরে বললে, 'ছি ছি হুজুর, অপরাধী করবেন না। তক্‌লিফ কিছু না—আপনাকে আনন্দ দিতে পেরেছি এই যথেষ্ট। অর্থের প্রত্যাশা করে ওসব দেখাইনি। যদি একান্তই কৃপা করতে চান তাহলে ঠিকানা দিন, কাল ফজেরে

এ বান্দা দুয়ারে গিয়ে হাজির হবে। আর যদি শখ হয়, ফরমায়েশ করবেন, হুজুরকে শহরের বাকি জায়গাগুলো দেখিয়ে আনব—'

সূর্যকান্ত ভেবে পেল না এ অযাচিত অনুগ্রহের কারণ কী? কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে, অপেক্ষা করা যায় না। বললে, 'আপনার বহুত মেহেরবানী। আমি নতুন এসেছি—জায়গাটা দেখার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু, এখন যা ডামাডোল, কখন্ কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি কেন অনর্থক—'

'তা হোক।' আজমল খাঁর স্বরের নম্রতা ঃ 'বুড়ো মানুষ বলেই এক জায়গায় বসে থাকতে পারিনে — হাতেপায়ে খিল ধরে যায়। এখানে ওখানে চক্কর দেওয়াই আমার স্বভাব। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ঠিকানাটা জানতে পারলে বেড়াতে বেড়াতে এক সময়ে গিয়ে হাজির হতে পারি—'

কী উদ্দেশ্য কে জানে। বার বার ঠিকানা জানতে চাইছে। বুড়ো মানুষ অনেকক্ষণ ঘুরেছে তার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থের প্রত্যাশা করে না, ঠিকানা জানলেই যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে ঝামেলা বাড়াবার দরকার কি। দেখে তো মনে হয় নিরীহ, গোবেচারা। হয়ত ভাল লেগেছে তাই ঠিকানা জানার এত আগ্রহ। সূর্যকান্ত বললে, 'আমি মীনা বাজারে সর্বেশ্বর সেনের বাড়িতে থাকি, আমার নাম সূর্যকান্ত। কিন্তু—'

'বড় সুন্দর নাম সায়েব, খোদাতালা যেমন খুবসুরত দিয়েছেন, নামটিও তেমনি সুন্দর হয়েছে। যদি পারি কাল সকালে হুজুরের দৌলতখানায় হাজির থাকব। চলি হুজুর—'

বৃদ্ধ আজমল খাঁ আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

বিচিত্র লোক বটে। সংসারে কত রকম লোক যে আছে !—আজব দুনিয়া, আজব মানুষ। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বড্ড, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। বাজারে বন্দরে ভিড় বেড়ে উঠেছে—কলরব বাড়ছে। পথ অনেকটা—তাড়াতাড়ি না ফিরলে দেরি হয়ে যাবে। নদীর দিকে একবার চেয়ে সূর্যকান্ত হনহন করে হাঁটা শুরু করল। রাঘব আজও এলো না!

একখানা নৌকো তখন ভিড়ছিল বন্দরে। অনেক লোক— মাঝি মাল্লা প্রচুর। নৌকোর সম্মুখভাগে দাঁড়িয়েছিলেন একজন দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ, তিনি তাকিয়েছিলেন কূলের পানে। হঠাৎ সচকিত হয়ে বললেন, 'রাঘব, আমাদের মহারাজ না?'

'কই?' রাঘব ছিল পাশেই, সে উন্মুখ হয়ে তাকাল।

'ওই যে। নদীর পানে একবার তাকিয়েই হাঁটতে শুরু করেছেন। আমাদের দেখতে পাননি।'

'শিগগির ভেড়াও নৌকো'—রাঘব আদেশ দিল তখুনি।

কিন্তু নৌকো ভিড়তে ভিড়তে সূর্যকান্ত চলে গেছে বহুদূরে। কূলে উঠে ব্রাহ্মণ, আর দেখতে পেলেন না। রাঘব নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

'কী করা যায় ঠাকুর,মশায়?'

'থাকতে হবে কিছুদিন। পরে দেখা হবে—'

'এখন?'

'চলো বাজারের দিকে যাওয়া যাক—'

নৌকো থেকে নামল সবাই। দল বেঁধে চলল বাজারের পথে। আহারাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

রাখব এসেছিল সেদিনই। সঙ্গে লোকবল। আর কুল-পুরোহিত স্বয়ং গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য। কিন্তু অল্পের জন্য দেখা হলনা। সূর্যকান্ত তখন চলে গেছে বন্দুরে।

।। ছয়।।

সপ্তগ্রামে এসে সূর্যকান্তর একমাত্র কাজ ছিল সকালে উঠে এই গঙ্গাতীরে আসা—কদিন পর-পর এল। তার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, রণসাগর থেকে, কেউ না কেউ সন্ধানে অবশ্য আসবে। কারণ রাঘব ফিরে গেছে এবং সে যা লোক কখনই চুপ করে থাকবে না। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অসুবিধা থাকতে পারে, তিনি নিজে হয়ত না আসতে পারেন, তাঁর আগমন অতি-প্রত্যাশা হয়ে যায়, তাঁর অনেক কাজ—কিন্তু প্রিয়পাত্রের বিপদাশংকার বার্তা শুনে লোকবল সংগ্রহ করে দিতে পারেন এটা আশা করা যায়। সেই সংগৃহীত লোকবল নিয়ে রাঘব আসবেই এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না বটে কিন্তু উপর্যুপুরি কদিন নদী তীরে আসা ও অপেক্ষা করাই সার হল, রাঘবের দেখা পাওয়া গেল না। বন্দরের ভিড়ে ওদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হচ্ছিল না একই জায়গায় থাকা সত্ত্বেও।

এদিকে যত দেরি হচ্ছে—সূর্যকান্ত ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল। যদিচ বুঝতে পারছিল একক সংগ্রামে সে কিছু করতে পারবে না। তবু ইন্দিরার কথা ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মনে মনে। এ যেন বেড়াতে আসা—পরম নিশ্চিন্তে আরামে কাল কাটনো! করণীয় কিছু নেই—চুপচাপ নদীর শোভা দর্শন আর আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে সুখ শয়ন! সুখ-শয়ন বইকি, পরম সুখে ও শ্রদ্ধায় রেখেছেন সর্বেশ্বর সেনের পরিবার। কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় না, যখন যা দরকার সবই পেয়ে যাচ্ছে হাতের কাছে, এর চেয়ে নিশ্চিন্ত ও সুখকর আশ্রয় আর কী হতে পারে?—কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে না কিছুই, ইন্দিরার সংবাদ পাওয়া যায়নি, লোকবল জোটেনি আজও। অপহৃতা ইন্দিরা কোথায় এবং কেমন আছে জানতে পারলে মনটা তৃপ্ত হত। তা জানবার উপায় নেই। কে জানাবে? কোন উপায়ে জানাবে?—মানুষ সময়-বিশেষে বড় অসহায়!

চারদিন কাটল এভাবে। আরও কতদিন কাটবে কে জানে। সূর্যকান্ত দীর্ঘশ্বাস

ফেলল একটা সেই তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসে। ভাবনার মোড় ঘোরাতে চাইল। তাকিয়ে দেখল, সেই কারুকাজ-করা বজরাটি যথাস্থানেই নোঙর করে রয়েছে, কিন্তু বাতায়ন-পার্শ্বে কারো উপস্থিতি নেই কালকের মতো। কোনো নারীমুখের উপস্থিতি নেই বজরার গবাক্ষে। গতকাল সময়টা কেটেছিল খুব ভাল, সংগীত রসে মন-প্রাণ ভরে গিয়েছিল। বড় মধুর হাত সেতারে—বহুকাল এত ভাল সেতার শোনেনি সূর্যকান্ত। সংগীতে কিঞ্চিৎ দক্ষতা আছে বলে অনুভবের তন্ত্রীগুলো নাড়া খেয়ে উঠেছিল। কিন্তু কে এই সেতারবাদিকা? একবার মাত্র চোখাচোখি হয়েছে, দ্বিতীয়বার তাকায়নি সূর্যকান্ত। অসাধারণ রূপসী—হয়ত কোনো অভিজাত কন্যা। কিংবা, লোকশ্রুতি অনুযায়ী বাঈজী হতে পারে—সুবাদারের দরবারে চলেছে মুজরা নিয়ে, কৃপাভরে গতকাল শুনিয়েছে সেতারের ছিটেফোঁটা। যেই হোক তার হাত অত্যন্ত মিষ্টি এবং সংগীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী—সেতার শ্রবণের ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু পর-নারীজ্ঞানে সেই, একবার ছাড়া দ্বিতীয়বার চোখ তোলেনি। এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছে, সেতার-শ্রবণের মতো তার রূপ-দর্শনও ভাগ্যের ব্যাপার। সচরাচর এমন রূপসী দেখা যায় না। চোখ ফিরিয়ে সে ভুল করেছে। গঙ্গার শোভা বেড়ে উঠেছিল শতগুণ—বোকার মতো নীতিরক্ষা করে সৌন্দর্য-সুখ হতে নিজেকে বঞ্চিত করেছে। সে দৃশ্য আর দেখা যাবে না—সৌন্দর্যের কী জাত আছে? বোকা-সত্যি বোকা। সেই পরম রূপ-সৌন্দর্যের আস্বাদ সে কী আর পাবে?

বজরা ভাসছে জলে—কিন্তু, নারী-মুখের অস্তিত্ব নেই কোনোখানে।

সূর্যকান্তর মনে হল, বজরাটা যেন শ্রীহীন হয়ে গেছে। পরক্ষণে ভাবল, সুন্দরী কী বজরায় নেই? গেছে কোথাও? হতে পারে—না হলে বন্দরে আসবে কেন মিছামিছি? কত লোকের কত কাজ এখানে।—সেই শুধু বসে আছে নিষ্কর্মার মতো। কাজ নেই তার। রাঘব কী এসেছে? তার দেখা কী পাওয়া যাবে?

চিন্তা ঘুরে যাচ্ছিল—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। সে চঞ্চল হলে তার চিন্তাধারা এমন এলোমেলো হয়। চিত্ত বশে থাকে না—ভাবনা বেড়ে ওঠে। সর্বেশ্বর সেন কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বাড়ি ফিরে, কখন্ কোথায় যান, কার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন কিছুই টের পাওয়া যায় না। ভদ্রলোকের সম্পত্তি নাশ হয়েছে প্রচুর—গৃহ ও আত্মীয়স্বজন তেমন নিরাপদ নয় বলেই তাঁর ধারণা, সেজন্যে সতর্ক পাহারা রেখেছেন সর্বদা, আরও লোকজনের জন্যে শক্তি সংগ্রহ করছেন গোপনে। এটা সুসংবাদ।—তিনি এখানে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি, তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব, যত লোকবল সংগৃহীত হবে ততই মঙ্গল। দক্ষ সেনাপতিরা সৈন্যবল না বুঝে

কখনও যুদ্ধে নামেও না। সেটা হঠকারিতার নামান্তর। সর্বেশ্বর সেন দক্ষ সেনাপতির মতো লোকবল ও অস্ত্রবল বাড়িয়ে চলেছেন—সময় নিচ্ছেন সেজন্যে। অপেক্ষা করে থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু রাঘব যদি না আসে—সূর্যকান্তর সম্বল কী? কিছু না শুধু একটি পিস্তল—যা সংগ্রহ করেছে সপ্তগ্রামে আসার পথে নৌকোয় সর্বেশ্বর সেনের কাছ থেকেই। অতি ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র, কিন্তু আত্মরক্ষার কাজে নিশ্চিন্ত নির্ভরযোগ্য। বন্দুক সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখা যায় না—এটি অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায় কোমরে বেঁধে। অপরিচিত স্থানে কখন্, দরকার পড়ে কে জানে, সূর্যকান্ত বাড়ি থেকে বেরোবার সময় প্রতিদিন ওটা কোমরে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে আসে। এখন কোমরে হাত দিয়ে দেখল ওটা আছে কিনা—নিশ্চিন্ত হল। বিপদে রক্ষা করবে ওটাই।

অসংখ্য নৌকো—কিন্তু রাঘব বুঝি আজও এল না। কতক্ষণ বসে থাকা যায়? গাছের ছায়া সরে যাচ্ছে—চৈত্রশেষের রোদ তীব্র হয়ে উঠেছে। শরীরে জ্বালা ধরে যায়। সূর্যকান্ত উঠল। তাকাল এদিক ওদিক। আশা করেছিল কালকের সেই বৃদ্ধ মুসলমানটি হয়ত কাছেপিঠে আছে, যে তার ঠিকানা জেনে আজ সকালেই বাড়িতে হাজির থাকবে বলেছিল, সকালে বাড়িতে যায়নি এখানেও হাজির নেই, অদ্ভুত লোক তো! সূর্যকান্ত ঈষৎ ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হল। —সবই তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। সামান্য একটা লোক সে-ও কথার ঠিক রাখে না। আজব জায়গা বটে সপ্তগ্রাম! মরুকগে—

শহরের পথে উদ্বেল জনতা। ভীষণ ভিড়। দ্রুতপদে চলা অসম্ভব। সূর্যকান্ত গতি মন্থর করে ভাবতে ভাবতে পথ অতিক্রম করছিল। বন্দরের বাজার পার হয়ে সে নামল দুর্গের নিচে—ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। স্বচ্ছন্দে পথ চলা যায়। দুর্গ অতিক্রম করার সময় দেখতে পেল, একজন বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলেছেন আগে আগে। সূর্যকান্ত ক-পা পেছনে—হাঁটতে লাগল যেমন সে হাঁটছিল।

কিন্তু বাধা পড়ল।—বাধা পড়ল সঙ্গী মুসলমানটির হস্তক্ষেপে।

অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠল।

এমন কিছু গুরুতর ঘটনা নয়। সপ্তগ্রামে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে, কেউ তেমন ভ্রূক্ষেপ করেনি। এটাও তেমনি সহজভাবে ঘটে যেত—যদি মুসলমান সঙ্গীটি হস্তক্ষেপ না করতেন।

দুজনে যথারীতি হেঁটে আসছিল। দুর্গের কিছুদূরে, সেখানে বসবাস ঈষৎ শিথিল সেখানে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে সামান্য জটলা। দেখা গেল তিনজন ফিরিঙ্গি দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজনের গায়ে কৃষ্ণবস্ত্রের আচ্ছাদন, দেখে বোঝা যায় তিনি পাদ্রী—অপর দুজন সাধারণ ফিরিঙ্গি সেনা। রাস্তার ওপর বসে রয়েছে

একটি যুবক, যতদূর মনে হয় হিন্দু—মলিন পোশাক, কাতর দৃষ্টি। সহায়হীন ও গরীব। কিছু কৌতূহলী জনতা ভিড় করে রয়েছে বটে কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না, বরং যুবকের দুর্গতি দেখে হাসছে দাঁত বার করে। যুবক কাতর-কণ্ঠে বলছিল, 'আমি হিন্দু, খৃষ্টান হইনি, আমাকে জোর করে খৃষ্টান করতে চায়—দেখুন কী অত্যাচার—' বলে কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত ফিরিঙ্গির পা দুটো জড়িয়ে ধরে মিনতি করছিল, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খৃষ্টান হব না, বাড়িতে আমার মা-বাবা, ভাই-বোন স্ত্রীপুত্র আছে—'

ফিরিঙ্গি পাদ্রী অটল। সে বলছে, 'গতকল্য তুমি খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়েছ, বাড়ি থাকলে তোমার আত্মীয়স্বজন দীর্ঘ নরকবাসের পথ সুগম করে দেবে, আমি তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছি। খৃষ্টা-ধর্ম জগতের সেরা ধর্ম—তুমি নিতান্ত অবোধ তাই এ ধর্মের মহিমা উপলব্ধি করতে পারছো না। স্বেচ্ছায় না গেলে জোর করে ধরে নিয়ে যাব—ওঠো—'

'আমি যাব না।'

'আলবত যাবে।'

'কিছুতেই না—

'বটে..।' তিনি রুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন, 'বেশ যাও কিনা দেখছি। কত জোর আছে বোঝা যাবে। কে রক্ষা করে দেখি? এই বেঁধে নিয়ে চলো ওকে—'

আদেশমাত্র সেনা দুটি এগিয়ে এল বীরদর্পে। তাদের হাতে বন্দুক। জনতা সরে দাঁড়াল।

মুসলমান সঙ্গী আগে আগে ছিলেন, তিনি পৌছুলেন ঠিক এই সময়ে। অল্প তফাতে সূর্যকান্ত।

প্রকাশ্য দিবালোকে এরকম একটা জঘন্য কাণ্ড হচ্ছে দেখে মুসলমান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হট্টগোল কিসের! হয়েছে কী? ওকে বাঁধতে চাইছ কেন?'

পাদ্রী বললে, 'আমি ধর্মযাজক, এই হিন্দু গতকাল পবিত্র খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু তার আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে আজ পালিয়ে এসেছে হুগলী থেকে। আমি ওকে হুগলী নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করছি—পামর জানে না এভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে পালিয়ে থাকা যায় না—সকলের ওপর তাঁর অপার করুণা—'

'হুঁ।' তিনি যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে কথাটা সত্যি। তুমি কী খৃষ্টান হয়েছো?'

'দোহাই হুজুর, হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বরের দিব্যি, আমি খৃষ্টান হইনি।'

সমব্যথী পেয়ে যুবক যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'এই পাদ্রী জোর করে খৃষ্টান করতে চাইছে। ওর ভয়ে হুগলীতে থাকা নিরাপদ নয়। বিবেচনা করে সপ্তগ্রামে পালিয়ে এসেছি। ভেবেছিলুম পরিত্রাণ পাব কিন্তু—'

'পাদ্রী কী মিছে কথা বলছে?'

'হ্যাঁ হুজুর।' সে হাতজোড় করে আত্মস্বরে বললে, 'আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' তিনি পাদ্রীর দিকে ফিরে তাকালেন। 'ফিরিঙ্গি, যুবক যা বললে শুনলে?'

'শুনলাম।' পাদ্রী গম্ভীর স্বরে বললে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, এর শাস্তি ওকে পেতে হবে। যাঁতাকলে ফেলে আঁখের মতো পেষাই করব তবে আমি পাদ্রী আলমিডা—'তার দাঁত কিড়মিড় করে উঠল 'ওকে টেনে বাঁধ, নিয়ে চলে জবরদস্ত—'

মুসলমান বললেন, 'পাদ্রী, তুমি বলপ্রয়োগ করো না, কাজীর কাছে নিয়ে যাও, এই হিন্দুর উপর যদি তোমার অধিকার থাকে তাহলে কাজী তোমার হাতে সমর্পন করবেন—সেটাই আইনসম্মত—'

'আইন—আইনের থোরাই কেয়ার করি আমি' পাদ্রী আলমিডা তেমনি উদ্যত ঃ আমরা কাজীর বিচারাধীন নই, কাজীর পরোয়া করি নে। আমরাই আমাদের বিচারক। এই হিন্দু খৃষ্টান হয়েছে। আমি এখনই ওকে হুগলী নিয়ে যাব।

'এটা শাহানশাহ বাদশাহের এলাকা ফিরিঙ্গি, তোমাদের রোম সাম্রাজ্য নয়।' তার নম্রতা বিলীন, স্বরে উত্তাপের আভাস ঃ 'এখানে বলপ্রয়োগ করলে তোমাকে দণ্ড পেতে হবে।'

'কে দণ্ড দেবে?'

'বাদশাহের যারা আইন রক্ষক—'

'বৃথা বাক্য ব্যয় না করে নিজের কাজে যাও। বড্ড বিরক্ত করছ। শুনে রাখ, বাদশাহের চতুর্দশ পুরুষেরও ক্ষমতা নেই আমাকে দণ্ড দেয়—'

'কি বললে?'

'তুমি কানে খাটো নাকি? শুনতে পাওনি?' পাদ্রী আলমিডা রীতিমত বিরক্ত, বারবার কথার উত্তর দিতে হচ্ছে ক্ষুব্ধ ঃ যেখানে যাচ্ছ যাও, আর একটি কথা যদি বল কিংবা আমাদের ধর্মীয় পবিত্র কাজে বাঁধা দাও—তোমাকে চাবুক মেরে সায়েস্তা করব—'

দপ করে জ্বলে উঠলেন মুসলমান—ক্রোধে তার মুখমণ্ডল অগ্নি বর্ণ ধারণ করল। কি ভয়ঙ্কর দুঃসাহস—কী কদর্য অপমান। পাদ্রী জানে না কার সঙ্গে কথা বলছে—পরিচয় পায়নি এখনও। এখনি এই মুহূর্তে ওর অহংকার চূর্ণ করা যায়। 'ধর্মের পবিত্র কর্মের পবিত্র' প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় অবিচলিত হাতে। অত্যন্ত

বাড়াবাড়ি শুরু করেছে এরা, কথাবার্তা অশালীন, অচার ব্যবহার বর্বরের মতো। এ যদি ওদের ধর্মের পথ হয় তাহলে এখানে থাকতে হবে না বেশিদিন। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে—সেটা পার হয়ে গেলে তারাই ওদের সায়েস্তা করে দেবে। এখন ওদের দম্ভ বড় বেশি, মুখে যা আসে তাই বলে যাচ্ছে, যা ইচ্ছে তাই করছে। শিক্ষা দেওয়া যায় এখনই—।

কোমরে হাত দিলেন তিনি—বিচলিত হলেন। অস্ত্র আনেননি সঙ্গে—হয়তো ফেলে এসেছেন দূর্গে। কিংবা আনেননি বাড়ি থেকে। মনে পড়ছে না। নেই সঙ্গে। আত্মসংবরণ করে নিলেন। জবাব দেওয়া হল না। ক্ষুণ্ণতা দূর করার জন্যেই বুঝি বললেন, 'পাদ্রী তোমার ঔদ্ধত্য মার্জনা করলাম।' সম্ভবত কানে খট করে লাগল, এ যেন দুর্বল ব্যক্তির ক্ষমতাবাণকে ক্ষমা করার মত হাস্যকর উক্তি! যোগ করে দিলেন, 'শাহানশাহ বাদশাহের নামে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করলে হিন্দুস্থানের আইন অনুসারে শূলে যেতে হয়। তুমি বিদেশী, দেশের আইন কানুন হয়তো জান না। ঠাণ্ডা মেজাজে বলছি এই দণ্ডে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ কর নতুবা—'

'ফুঃ।'

পাদ্রী থুতু ফেলল অবজ্ঞায়।

'বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। সমুচিত জবাব পাবে। বড় দম্ভ তোমার—'

আমি পাদ্রী আলমিডা। কে শাস্তি দেবে? তুমি? পাদ্রীর তেমনি দম্ভোক্তি। 'দিতে পারতাম।' কিন্তু—'তোর মতো বিধর্মী কুকুরকে কারাগারে রেখে আমরা শূকরের মাংস খেতে দিই, বুঝলি?'

ফিরিঙ্গি 'তোমার কি মরার ইচ্ছে হয়েছে?' মুসলমান দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন শূকরের মাংস ভোজনের কথা শুনে।

'আমার না তোর?'

উত্তরস্বরূপ আলমিডা মুসলমানের শ্মশ্রু ধরে টান দিলেন, 'আগে তোকে উদ্ধার করি তারপর ওই হিন্দুটাকে—'

মুসলমান অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে পাদ্রীর প্রশস্ত গণ্ডদেশে বসাল এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত—স্থূল ক্ষুদ্রকায় লম্বোদর পাদ্রী আঘাতের বেগ সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তাই দেখে ফিরিঙ্গি সেনাদ্বয় তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল আঘাতকারীকে। সূর্যকান্ত ছিল ঠিক মুসলমানের পাশে—উভয়ের কথোপকথন শুনছিল নির্বাক শ্রোতার মতো। তার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল, সে আক্রমণকারী একজনের পশ্চাদ্দেশে ভীষণ জোরে পদাঘাত করল, ফিরিঙ্গি সেনা তার ফলে চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল মুখ থুবড়ে। তা দেখে তার সঙ্গী ফিরিঙ্গি

বার করল বন্দুক। মজা দেখবার জন্যে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা পালাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। এমন কি যে হিন্দু যুবকের উদ্ধারের জন্যে মুসলমান ফিরিঙ্গি পাদ্রীর সঙ্গে বিবাদ করেছিল—সেও তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিল। রাস্তা ফাঁকা, শুধু তিনজন ফিরিঙ্গি ও দুজন প্রতিরোধকারী। সম্মুখ-যুদ্ধের প্রস্তুতি।

সময় নিতান্ত অল্প—আত্মরক্ষা না করলে ফিরিঙ্গির হাতে প্রাণ যাবে। ফিরিঙ্গি বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল—সূর্যকান্ত পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়াল এবং নিমেষের মধ্যে মুসলমানকে টেনে নিয়ে পথিপার্শ্বের এক অশ্বত্থ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করল। ফিরিঙ্গির দ্বিতীয় গুলি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষকাণ্ডে বিদ্ধ হল। মুসলমান বললে, 'আমাদের দুজনেরই প্রাণ যাবে, ওই দেখ, ফিরিঙ্গি এগিয়ে আসছে—'

'আপনি নিজেকে আড়াল করে দাঁড়ান। কিছু ভাববেন না।' —বলে সূর্যকান্ত কাপড়ের ভেতর থেকে রজত-নির্মিত সেই ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র বার করল।

মুসলমান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ওটা?'

সূর্যকান্ত সম্মুখবর্তী বন্দকুধারী ফিরিঙ্গিসেনার দিকে আগ্নেয়াস্ত্রটি স্থির নিবিদ্ধ করে বললে, 'এটা নতুন ধরনের বন্দুক, এর নাম পিস্তল। বিলাত থেকে অল্পদিন হল এসেছে। বিপদে মস্ত সহায়—'

সে পিস্তল ছুঁড়ল। ওরা নিরস্ত্র জেনেই এগিয়ে আসছিল ফিরিঙ্গি—আচমকা পিস্তলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আহত হয়ে সে পড়ে গেল। প্রথম ফিরিঙ্গি ও পাদ্রী আলমিডা তা দেখে দৌড় দিল রাস্তার অপর পারে, আশ্রয় নিল আর-এক বৃক্ষকান্ডের পেছনে। সূর্যকান্ত ছুটে বেরিয়ে এল এবং আহত ফিরিঙ্গির বন্দুক কেড়ে নিয়ে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে গেল। সেই অবকাশে প্রথম ফিরিঙ্গির বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল এবং তার বামহস্তে বিদ্ধ হল। সূর্যকান্ত তা গ্রাহ্য না করে মুসলমানকে বললে 'আপনার বন্দুক ধরা অভ্যাস আছে?'

মুসলমান হেসে বললেন, 'আছে, আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী।'

'তবে ধরুন—'

মুসলমান বন্দুক ধরে বললেন, 'চালাব কী করে? গুলি আর বারুদ কই?'

'তাড়াতাড়ি শুধু বন্দুকটা নিয়ে এসেছি—ও গুলো আনা হয়নি। দাঁড়ান নিয়ে আসছি—'

সূর্যকান্ত যাবার জন্যে পা বাড়াল।

মুসলমান বাধা দিলেন। ওর ডানহাত ধরে ফেলে বললেন, 'তা হবে না, তুমি আহত হয়েছ, এখন আমার পালা। ফিরিঙ্গি যদি মুখ বাড়ায়, তুমি গুলি চালাও।'

'কিন্তু—'

মুসলমান হেসে বললেন, 'বীরত্ব তুমি খুব দেখিয়েছো, বাহাদুর নওজোয়ান, বীরত্বে আমিও কম যেতাম না এককালে। এখন সুযোগ পেয়েছি, আমাকে যেতে দাও। যদি মরি, ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁকে বোলো জাহাঙ্গীর আমলের একজন আমীর ফিরিঙ্গির হাতে মরেছে—'বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। সূর্যকান্ত দেখল রাস্তার অপর পার্শ্বের বৃক্ষকাণ্ডের আড়ালে ফিরিঙ্গি বন্দুক তুলেছে, তার ললাটের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে এ প্রান্ত থেকে। সে পিস্তল তুলল এবং যথার্থ লক্ষ্যে ভেদ করল ফিরিঙ্গির ললাট। আর্তনাদ করে পড়ে গেল ফিরিঙ্গি। পাদ্রী ভয় পেয়ে গেল—তার পাশে কেউ নেই—সে একা। ধর্মের কাজে কী বাধা! 'পাপী' হিন্দুর পরিত্রাণের আশা ত্যাগ করে সে পা পা করে পিছু হটল এবং দৌড় দিল সোজা হুগলীর দিকে। ফিরে তাকাল না একবারও......

যুদ্ধ শেষ হয়েছে দেখে বৃক্ষকাণ্ডের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন দুজন। সূর্যকান্ত বললে, 'খাঁ সায়েব, এখন আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন, পথের বাধা দূর হয়েছে।'

মুসলমান প্রশংসার চোখে তার পানে চেয়ে বললেন, 'কাফের, তুমি বীর, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো—তুমি আমার দোস্ত। এখন ছাড়ব না, আমার সঙ্গে কেল্লায় চলো। আমার পথ নিবিড় করেছো কিন্তু তোমার যাতে বিপদ না ঘটে সেটা দেখা আমার কর্তব্য। চলো—'

'মানে?'

'তুমি ফিরিঙ্গির রক্তপাত করেছো—ওরা সহজে ছেড়ে দেবে নাকি? এখন এ স্থান মোটেই নিরাপদ নয়। পাদ্রী ফিরে গেছে—শুধু একটা পিস্তল আর বন্দুক নিয়ে তার দলবল প্রতিরোধ করা যাবে না। সে ফিরে আসার আগেই তোমার নিরাপত্তা প্রয়োজন। একদিকে জলদস্যু আর অন্যদিকে এই পাদ্রীদের অত্যাচার—সুবা-বাঙলা ছারখার করে দিলে—'

'কিন্তু আমাকে যে ফিরতে হবে।'

'কোথায় ফিরবে?—তুমি কে এবং কোথা থেকে আসছো আমি জানি না, কিন্তু একা একা ফেরা বিপজ্জনক। যদি আপত্তি না থাকে তোমার পরিচয় জানাবে কী?'

সূর্যকান্ত কুণ্ঠার সাথে বললে, 'সায়েব, বিশেষ কারণে এখন পরিচয় দিতে পারছিনে। শুধু জেনে রাখুন, ফিরিঙ্গি আমার দুশমন, আমার এক আত্মীয়াকে তারা হরণ করে এনেছে; আমি তারই উদ্ধারের চেষ্টায় সপ্তগ্রামে এসেছি—'

'কী করে হরণ করল?'

'নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন—'

'হুঁ।—নদীর কূলে কূলে কালিমা জমে উঠেছে। কড়ায় গণ্ডায় ওদের শোধ দিতে হবে একদিন।' একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'যুবক, আমি তোমার পিতার বয়সী, আমার নিকট সত্য গোপন করে ভালো করছো না। তুমি আমার জন্যে ফিরিঙ্গি হত্যা করেছো, সুবা বাঙলায় বাস করতে হলে তোমাকে আমার সঙ্গে বাস করতে হবে, অন্ততঃ আমার সাহায্য দরকার পড়বে। তোমাকে আমার পরিচয় জানানো কর্তব্য, আমি বাদশাহী নাওয়ারার আমীর, আমার নাম সৌকত আলী খাঁ—

'আপনি—' বিস্ময়ে সচকিত সূর্যকান্ত।

'চমকে উঠলে যে—'

'আপনাকে আমি বহু অনুসন্ধান করেছি কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারিনি।' সূর্যকান্ত যথোচিত শ্রদ্ধায় বললে, 'খাঁ সায়েব, আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আপনার নিকট আর পরিচয় গোপন করব না। আমার নাম সূর্যকান্ত, পরগণা বারবক সিংহেঁর ভূতপূর্ব জমিদার মহারাজা চন্দ্রকান্ত রায় আমার পিতা—'

'বল কি! তুমি চন্দ্রকান্তর ছেলে! সপ্তগ্রামে এসেছ অথচ আমাকে সংবাদ দাওনি।'

'চেষ্টা করেছিলাম।'

'দেখা হয়নি বলে একটা চিরকূট লিখে সংবাদটা জানাতে পারতে—' তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করলেন।

সূর্যকান্ত লজ্জিতভাবে চুপ করে রইল।

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'শুনেছি তোমার খুড়ো মশায় খানাজাদ খাঁর আমলে বারবক সিংহ বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন, সে অনেকদিন হল। তখন যদি তোমার তরফের কোনো উকিল জাহাঙ্গীরনগরে উপস্থিত থাকত তাহলে তিনি তা পেতেন না; তোমার পিতার জমিদারী তুমি পাওনি এ বড় দুঃখের কথা। এখন বড়ো হয়েছো—তুমি কী করছো?'

সূর্যকান্ত বললে, 'সায়েব, শৈশবে মাতৃহারা হয়েছি, আমার ভ্রাতা ভগিনী কেউ নেই। পিতার মৃত্যুর সময়ে আমার বয়স ছিল মাত্র চতুর্দশ বৎসর; সংসার-বিষয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না, তখন খুড়া মশায় গোপনে বাদশাহের সনন্দ আনিয়ে সম্পত্তি দখল করেছেন। তাঁর ন্যায় তাঁর কাছে—আমি কোনো অন্যায় করতে চাইনে—একটা মাত্র পেট যা হোক—চলে গেলেই হল। পিতার মৃত্যুর পরে চার বৎসর শাস্ত্র ও অস্ত্র শিক্ষণ করেছি, ভেবেছিলুম জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় বেরুব—এমন সময় বিবাদ বাধল ফিরিঙ্গির সঙ্গে—'

'এখানে উঠেছো কোথায়?'

'মীনা বাজারে। সর্বেশ্বর সেনের গৃহে—'

'বেশ করেছো। সর্বেশ্বরের মতো পরাক্রান্ত হিন্দু সপ্তগ্রামে বেশি নেই। তুমি কী এখন মীনা বাজারে যেতে চাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কিন্তু তোমার একাকী মীনা বাজারে ফেরা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার সঙ্গে কেল্লায় চলো, সেখান থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। হয়ত কিছু হবে না তবু সাবধানের মার নেই—'

সূর্যকান্ত আর আপত্তি না করে বললে, 'চলুন—'

ও'রা কেল্লায় ফিরলেন। ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ আহারান্তে অহিফেন সেবন করে ঝিমুচ্ছিলেন, নিত্য আহারের পর নেশায় তিনি কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকেন। সূর্যকান্তসহ সৌকত আলী খাঁ ফৌজদারের রাজদুয়ারীতে প্রবেশ করলেন। আচমকা ওদের দুজনকে দেখে বুড়ো ফৌজদার ভয় পেয়ে চৌকি থেকে পড়তে পড়তে কোনো মতে টাল সামলে নিলেন। সূর্যকান্ত হেসে ফেলল। এই 'বীরপুরুষ' ফৌজদারের সঙ্গে চেষ্টা করেও সে সাক্ষাৎ করতে পারেনি।

'সৌকত আলী খাঁ প্রবেশ করেই বললেন, 'খাঁ সাহেব, সেনা তৈরী আছে?'

ফৌজদার তটস্থ হয়ে বললে, 'হাঁ জনাব—'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'এখনই একদল আহদী আর দশটা ভারী তোপ বন্দেলের পথে পাঠিয়ে দাও।'

ফৌজদারের চোখ বড় বড় হল, কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'যো হুকুম খোদাবন্দ, কিন্তু কী হয়েছে?'

'শাহানশাহ বাদশাহ দীন ও দুনিয়ার মালিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যে প্রকাশ্য পথে দিনের আলোকে ফিরিঙ্গি আমার ওপরে গুলি চালিয়েছে—'

'বলেন কি!' বৃদ্ধ ফৌজদার কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল।

।। সাত।।

সপ্তগ্রামের প্রশস্ত রাজপথের ধারে বৃহৎ একটি অট্টালিকা। সন্ধ্যা নেমেছে। বন্দর ঘিরে বিশাল নগরের অসংখ্য পথে জ্বলে উঠেছে সহস্র দীপ—অভিসারিকার অঙ্গরাগের মতো মোহময় রূপ। অট্টালিকার রাস্তাপার্শ্বের দ্বিতল স্নিগ্ধ দীপের আলোয় উদ্ভাসিত, তার ঠিক মধ্যস্থলে কাশ্মীরী গালিচায় সুন্দর একটি ভঙ্গিমায় বসে গুলরুখ। হাতে সেতার—আলাপ শেষ করে গৎ ধরেছে সবে। পূরবীর করুণ-মধুর সুরে বিহ্বল বিষণ্ণতায় আকাশ-বাতাস মথিত। মীড়ে-গমকে লয়ে-গতকারিতে রাগরূপ ফুটে উঠছিল বড় সুন্দর।

গালিচার একপাশে বসে চাঁদির বাটা নিয়ে পান সাজছিল সাকিলা বিবি

আর তবলায় সঙ্গত করছিল বসীর আহমদ; বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে কল্‌কেতে ফুঁ দিচ্ছিল আজমল খাঁ। সেতারের রসঘন পরিবেশনে সকলেই চুপ— কারো মুখে কথা নেই। গুলরুখ আত্মগতভাবে বাজিয়ে যাচ্ছিল, ওরা শুনছিল চুপ করে। যেন গুলরুখেরই অন্তর্বেদনা রূপ পাচ্ছিল রাগিণী সুরে সুরে। ব্যাপারটা অপ্রকাশ থাকেনি কারো কাছে—কেন জাহাঙ্গীরনগর যাবার বাসনা ত্যাগ করে গুলরুখ এখানে অবস্থান করছে তা সকলেই জানে। বসীর আহমদ সেদিনই হাওলতী অর্থ নিয়ে ফেরার পথে এই অট্টালিকাটি ভাড়া করেছে মালিকানের নির্দেশমতো এবং গতকাল বৈকালে বজরা ত্যাগ করে উঠে এসেছে গুলরুখ। কিন্তু যে আশায় এখানে উঠে আসা তা সার্থক হয়নি এখনও—সেরা রূপবান কায়েস্থ যুবক একবারও চোখে পড়েনি দৃষ্টিপথে। আজ সকাল থেকেই পথের পানে চেয়েছিল গুলরুখ, ওরা দেখেছে, কেমন বে-হুঁশ বে-দিল্ নজর; তারপর কেটে গেছে দুপুরের অপরাহ্ণ। এসেছে এই সন্ধ্যা। কিছু ভাল লাগছিল না তার— স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে সেতার—বাজাতে আরম্ভ করেছে পূরবী। ওদের মনে হচ্ছিল, সেতারের আঘাতে আঘাতে বুঝি অশ্রু ঝরে পড়ছে সেতার-বাদিকার অন্তর উচাটন করে!— সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সেতারের বিষণ্ণ সুর মিশে যাচ্ছিল বেদনার নির্ঝর হয়ে। সূর্যকান্তর যাতায়াতের পথ এটা নয় ওরা তা জানত না।

সাকিলা পানের পিক ফেলার জন্যে উঠে এল। দাঁড়াল বারান্দার ধারে। রাস্তার পানে চেয়ে বিস্মিত হল। ভেবেছিল, সেদিন নদীতীরে যেমন ভিড় জমে উঠেছিল সেতারের মুগ্ধ শ্রোতৃ-সমাবেশে, এখানেও সেই দৃশ্য দেখবে, রাজপথ ভরে উঠেছে লোক সমাগমে। সপ্তগ্রামে রসিক-শ্রোতার অভাব নেই তা পূর্বেই জানা গিয়েছিল---বিপুল জনতার একাংশ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেতার শুনছে এটা সে আশা করেছিল। কিন্তু দেখতে পেল রাজপথ ফাঁকা, বিরল লোক-চলাচল— কেমন ত্রস্ত, বিভ্রান্ত ভঙ্গি। আলোকজ্জ্বল বিপণিগুলি দ্রুত ঝাঁপ বন্ধ করছে, ত্রস্ততার মধ্যে কেমন-একটা আতঙ্কের ভাব। সাকিলা ক-মুহূর্ত চেয়ে পানের পিক ফেলা ভুলে গেল, ঢোঁক গিলে ফেলল ভয়ে। ডাকল, 'খাঁ-সায়েব, শোনো এদিকে।'

আজমল খাঁ কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে কাছে এল।

সাকিলা বললে, 'রাস্তার পানে চেয়ে দ্যাখ তো, কী যেন ঘটেছে।'

আজমল খাঁ তাকিয়ে দেখল। বললে, 'গুরুতর কিছু ঘটেছে। লোকজন পালাচ্ছে, চিৎকার করছে।'

'কী ঘটেছে মনে হয়?'

'ডাকাতের উপদ্রব হতে পারে—'

'সন্ধ্যা রাত্রে ডাকাত?'

'দাঁড়াও একটা হল্লা আসছে, শুনলেই বোঝা যাবে কিসের উৎপাত—'

বাস্তবিক চারিদিকে ভীষণ বিশৃংখলা শুরু হয়ে গেছে—কোলাহল বৃদ্ধি পাচ্ছিল উত্তরোত্তর, চিৎকার শোনা যাচ্ছিল নানাকণ্ঠে। তার মধ্যে ভয়ার্ত কতকগুলি সাবধানবাণী ঃ 'ফিরিঙ্গি এল, ফিরিঙ্গি এল, বাজার লুটবে—সামাল—সামাল'

লুণ্ঠনকারী ফিরিঙ্গির দল আসছে। সাকিলার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে সভয়ে তাকিয়ে দেখল, কোলাহলে বিরক্ত বিবিজান ও বসীর আহমদ কখন উঠে এসেছে আসর ছেড়ে। তারাও চিৎকার শুনল। বাজারের গায়েই অট্টালিকা। সাকিলা কথা বলতে পারল না—জর্দা মেশানো পানের পিক গিলে ফেলল আর এক ঢোক।

কেউ কোনো কথা বলছিল না। উপরের বারান্দা থেকে নির্বাক পুতুলের মতো শুধু দেখছিল, দোকান-পাট বন্ধ করে লোকজন যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। আতংককর ভূতুড়ে স্তব্ধতা।

হঠাৎ বসীর আহমদ চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যস্তভাবে বললে 'বিবি সায়েব, সর্বনাশ হয়েছে—আমার আফিঙ ফুরিয়েছে—আমাকে এখন বাজারে যেতে হবে—'

সাকিলা বললে, 'সে কী মিয়াসায়েব! এ হাঙ্গামার মধ্যে তুমি কোথায় যাবে? মারা পড়বে যে।'

বসীর মিঞা বললে, 'তুমি তা জানো আফিঙ না পেলে আমার পক্ষে মরা বাঁচা সমান।— কেনই বা বাঁচা? কে আছে আমার? আমি যাব আর আসব—'

'কিন্তু দোকান যে সব বন্ধ হয়ে গেল।'

'দু-একটা খোলা আছে এখনও—'

বলে বসীর আহমদ বারান্দার দুয়ারের দিকে এগিয়ে চলল, সাকিলা আকুল হয়ে তার একটা হাত ধরল আর কাতরকণ্ঠে বলল. 'মিয়াসাহেব, এ সময়ে আমাদের একা ফেলে কোথায় যাও?'

'দোহাই, অমন করে বোলো না। তুমি আমার দিলের দিল, জ্ঞানের জ্ঞান?' বসীর আহমদ তার ভয়ে-ভরা চোখের পানে চেয়ে বললে. 'জাহান্নামে তো এক আমারই যাওয়ার কথা—তাই যাচ্ছি। যদি ফিরে আসি—দেখা হবে। আফিঙ না হলে আমার চলে না—চলি বিবিজান—'

হাত ছাড়িয়ে বসীর আহমদ চলে গেল। সে যথার্থ আফিঙখোর।

ততক্ষণে নগরের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দূরে নানারকম কোলাহল, আর্তনাদ ও বন্দুকের শব্দ। আকস্মিক হামলা! নগরবাসী সতর্ক ছিল না। বারান্দার ওপর থেকে তারা দেখতে পেল হাজার হাজার দীপমালায় সজ্জিত আলোক-নগরী সপ্তগ্রামে নেমে এসেছে অন্ধকার—কোথাও কোনো আলোর রেখা পর্যন্ত দেখা যায় না। স্তব্ধ, গাঢ় অন্ধকার। যেন নিমেষের মধ্যে ভূতে-পাওয়া নগরীতে পরিণত!

গুলরুখ ভয় পেয়েছিল—বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেও।

বললে, 'সাকিলা এখন কী করি বল্ তো?' বড় ভয় করছে।

সাকিলা কপালে করাঘাত করে বললে, 'খোদাকে ডাকো। তিনি ছাড়া এ বিপদে কে আমাদের রক্ষা করবে? তখন কত করে বললুম সংগ্রামে না থেকে জাহাঙ্গীরনগরে চলো, তা আমার কথা কী শুনলে?—

'তাতে লাভ কী হতো সাকিলা?'

'কেন?'

'তোর কথা শুনে আজ বজরা ছাড়লে এতক্ষণে হুগলী বন্দরে সেই ফিরিঙ্গির খপ্পরেই পড়তুম।—'

'সত্যি সুবা বাঙলার কোথাও বাস করে স্বস্তি নেই।'

'কী করা যায় বল্?' গুলরুখ বেশ চিন্তিত।

সাকিলা কথা না বলে আজমল খাঁর পানে তাকাল।

আজমল বললে, 'বিবিসায়েব, বিপদের সময় বিভ্রান্ত না হয়ে স্থির মস্তিষ্কে কাজ করতে হয়। আমি দুয়ারটা বন্ধ করে আসি—'

'তাই এসো। কিন্তু দুয়ার বন্ধ করে কী দুর্বৃত্তদের আগমন প্রতিরোধ করা যাবে?' সাকিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'খুলে রেখে আসার তো মানে হয় না। হয় কী?'—

আজমল খাঁ নিচে নামল। দুয়ার বন্ধ করে ফিরে এল খানিক পরে - হাতে একখানি পুরনো মরচে-ধরা তলোয়ার। সেটা শান দিতে লাগল মেঝেতে বসে।

সাকিলা তার রকম-সকম দেখে এত ভয়েও হেসে ফেলল। বললে, 'খাঁ সাহেব, ভাঙা তলোয়ারখানা কোথায় পেলে?'

আজমল খাঁ গম্ভীরভাবে বলল, 'ভাঙা নয়, পুরনো। কিন্তু ইস্পাতী তলোয়ার। আমার বাপ দাদার ছিল, আমার দাদা আকবর বাদশাহের ফৌজ আহদী ছিলেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি পেয়েছি—'

সাকিলা বললে, 'তলোয়ার নিয়ে কী করবে?'

'ফিরিঙ্গিরা যদি আসে—তাদের সঙ্গে লড়াই করব—'

'বলো-কি, তুমি লড়াই করতে জানো?'

'জানি-না-জানি—দু-একটার মাথা তো নিতে পারব—'

'কিন্তু তারা যে বন্দুক নিয়ে লড়াই করবে?'

'মরি স্বর্গে যাব! বুড়ো আজমল বেঁচে থাকতে তোমাদের গায়ে কেউ হাত দেবে এ অসহ্য!'

'আমার কথা থাক কিন্তু বিবিসায়েব—'

গুলরুখ বললে, 'সাকিলা, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছি—'

'কী ব্যবস্থা করেছো?'

গুলরুখ অঙ্গরাখার ভেতর থেকে একটি ছোট রূপার কৌটা বার করল। সাকিলা উৎসুক হয়ে বললে, 'কি আছে ওতে?'

'জহর.....'

'কী করবে?'

গুলরুখ হেসে বললে, 'সময় হলে দেখতে পাবে—'

সাকিলা শিউরে উঠল।

এই সময় বন্দুকের আওয়াজ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল দুর্বৃত্তরা কাছে এগিয়ে আসছে। আজমল খাঁ বললে, 'বিবি, আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাজ নেই। ঘরের ভেতরে চলো—'

ওরা দাঁড়িয়ে ক-মুহূর্ত বন্দুকের আওয়াজ শুনল। বাস্তবিক কাছে এসে গেছে দুর্বৃত্তের দল, বন্দুকের আওয়াজ খুবই স্পষ্ট। ওরা বারান্দা পরিত্যাগ করে ঘরের ভেতর ঢুকল। আজমল খাঁ সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিল। প্রহরীর মতো সে দাঁড়িয়ে রইল তলোয়ারখানা হাতে নিয়ে।

অল্পক্ষণ পরে নিচে রাস্তায় ওরা শুনতে পেল আর্তনাদ—মনে হল পরিচিত গলা—অনেকটা বসীর আহমেদের মতো। আর্তনাদটা উঠেই মিলিয়ে গেল। সম্ভবতঃ আর্তনাদকারী গুরুতররূপে আহত কিংবা নিহত। এরা কক্ষের ভেতরে শিউরে উঠতে লাগল। পরক্ষণে অট্টালিকার দ্বারে আঘাত—এত জোরে আঘাতের পর আঘাত পড়তে লাগল যে মনে হল পুরনো অট্টালিকাই বুঝি ভেঙে পড়বে। ওরা কাঁপছিল ঘরের মধ্যে—অট্টালিকার মজবুত দ্বার ভেঙে পড়ল। নিচে স্থিত কিছু লোকের পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল, কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করছে তারা। এবার উঠে আসবে ওপরে এবং ভেঙে ফেলবে এ কক্ষের দ্বার। তখন আত্মরক্ষার পথ পাওয়া যাবে না।

গুলরুখ এটুকু চিন্তা করেই চাপ দিল জহরের কৌটায়—খুলে ফেলল কৌটার মুখ। সাকিলা তা দেখল এবং চেপে ধরল তার হাত, খেতে দিল না। গুলরুখ চাপাস্বরে বললে, 'সাকিলা ছেড়ে দে—'

সাকিলা বললে, 'এখন নয়।'

'ওরা এসে পড়েছে—'

'পরে।'

'সময় পাব না—'

'তা হোক!'

কক্ষের দ্বারে আঘাত পড়ল—ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গুলরুখ বললে, 'সাকিলা—'

'না।'

'আমার ইজ্জত যাবে—'

সাকিলা বললে, 'তখন খেও।'

পর পর কয়েকটি আঘাতে ভেঙে গেল কক্ষের দ্বার—হুড়মুড়িয়ে ঢুকল পাঁচ সাতটি ফিরিঙ্গি। আজমল খাঁ তার পুরনো মরচে ধরা তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের মধ্যে। একজন ফিরিঙ্গি প্রতিরোধ করল সঙিন উঁচিয়ে—তলোয়ারের আঘাত পড়ল সঙীনে।— ভেঙে দ্বিখণ্ড হয়ে গেল তলোয়ার। অপর ফিরিঙ্গির বন্দুকের আঘাতে আজমল খাঁর চেতনা লুপ্ত হল এবং তৃতীয় ফিরিঙ্গি তার হতচেতন দেহ পদাঘাত করে দূরে সরাল। বাধা অপসৃত।

ভয়ে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাকিলা ও গুলরুখ।

হুকুম হল, 'নিয়ে চল ওদের—'

'এখনি?'

একজন ফিরিঙ্গি ঠোঁট চেটে নিল লালসায়।

'যা বললুম তাই করো। স্বেচ্ছায় যেতে না চায় বেঁধে নিয়ে চলো—'

ফিরিঙ্গি একখানি শাড়ি পেড়ে দ্বিখণ্ডিত করল। ওদের হাত বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল নিচে। পেছনে পড়ে রইল অচৈতন্য আজমল খাঁ।

গুলরুখ ও সাকিলা পথে নেমে দেখল ফিরিঙ্গিদের হাতে শুধু তারাই নয়, বন্দী হয়েছে বহুলোক। শ্রেণীবদ্ধভাবে বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা—নির্বিচারে বন্দী করেছে দুর্বৃত্তরা। বন্দীদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে রাস্তার দু পাশে সারি দিয়ে আর বন্দুক হাতে ফিরিঙ্গি সেনার দল পাহারা দিচ্ছে এ প্রান্ত হতে ও-প্রান্ত। যেন কয়েদখানা হয়ে উঠেছে প্রশস্ত রাজপথ। ধনী-নির্ধনী ছোট-বড় কোনো বিচার করেনি ফিরিঙ্গিরা। সপ্তগ্রামের উচ্চমহলের বহু স্ত্রী-পুরুষ বন্দী।

তাদের দুজনকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল বন্দীদের মাঝে। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে গুলরুখ সামলে নিল কোনমতে— সাকিলা ঝাপটা মেরে জায়গা করে নিল গুলরুখের পাশে। ইজ্জতের ওপর হামলা হতে পারে, চোখে চোখে রাখতে হবে—তা না হলে বিবিসায়েবের পক্ষে দুঃসাধ্য কিছু নেই, জহরের কৌটা তো খুলেই ফেলেছিল, মুখে ফেলে দিতে কতক্ষণ! সাকিলা গুলরুখের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

দূরে তখনও যুদ্ধ চলছিল—মুহুর্মুহু ভেসে আসছিল বন্দুক ও কামানের আওয়াজ। জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে কেউ— কামানে-বন্দুকে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলছে। সপ্তগ্রামে যে মানুষ আছে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল যুদ্ধের ভীষণতায়। ফিরিঙ্গিদের ব্যস্ত আচরণে সে ভাব সুপ্রকট। গুলরুখ চাইছিল ফিরিঙ্গিরা এ যুদ্ধে পরাস্ত হোক, কিন্তু তা কী হবে?

তার পাশে বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ মুসলমান। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আগে থেকেই, বললেন, 'বাছা, তোমাকে রক্ষা করার কি কেউ ছিল না? তুমি কী অভিভাবকহীনা?'

গুলরুখ নতনেত্রে ক-মুহূর্ত চুপ করে রইল তারপর বললে, 'খাঁসায়েব, সংসারে আমার অভিভাবক আমি নিজে। এক বৃদ্ধ পরিচিত ছিল, ফিরিঙ্গিরা তাকে মেরে আমাদের ধরে রেখেছে--'

বৃদ্ধ তার রূপলাবণ্যের পানে চেয়ে বললেন, 'মা, তোমার বয়স অল্প, তোমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার মতো রূপসী হিন্দুস্থানে বিরল—আমাদের আশঙ্কা হয় ফিরিঙ্গির হাতে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে। তুমি মুসলমানের কন্যা-- মরতে শিখেছো কী?'

গুলরুখ বললে, 'শিখেছি।' আমার পোশাক মধ্যে জহর লুকানো আছে, অবসর পাইনি বলে খেতে পারিনি। এখন হাত বাঁধা--'

'খেও, অবসর পেলে খেয়ে নিও। আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমার এই পুত্রবধূটিকে খাইও—' বলে সামনের একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিলেন।

গুলরুখ চেয়ে দেখল বোরখা-ঢাকা এক মুসলমান রমণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। বিষাদ প্রতিমা যেন। সে বললে, 'উনি আপনার পুত্রবধূ?'

'হ্যাঁ মা। ফিরিঙ্গিরা জোর করে ধরে এনেছে।' বৃদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার পুত্র সৌকত আলী খাঁর সঙ্গে লড়াই করতে গেছে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, পুত্রবধূকে রক্ষা করতে পারিনি।'

তাঁর পশ্চাতে একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, হুজুর, তখনই বলেছিলাম যে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধাবার আগে সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে

যান, আপনি নতুন সপ্তগ্রামে এসেছেন, এদেশের হালচাল বিশেষ অবগত নন—তা শুনলেন না—'

বৃদ্ধ সখেদে বললেন, 'ভাই, শাহানশাহ নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বে এমন হতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

দোকানদার বললে, ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ আফিমচী, সুবাদার মোকরম খাঁ বহুদূরে জাহাঙ্গীরনগরে, বাদশাহ্ আরও দূরে আগ্রায় অথবা দিল্লিতে। সপ্তগ্রাম নামে মাত্র মোগল বাদশাহের ফৌজদারী, এটা প্রকৃত পক্ষে ফিরিঙ্গি হার্মাদের রাজত্ব—'

'তাই দেখছি। এ যেন ওদেরই দেশ। যা ইচ্ছে তাই করছে।' বৃদ্ধ বললেন, 'আমরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী, আমার পুত্র গোলন্দাজ, তার মুখে শুনেছি সৌকত আলী খাঁ থাকতে বাদশাহের প্রজার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু এখন দেখছি—'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন।' দোকানদার বললে, 'সৌকত আলী খাঁ বীর বটে কিন্তু একা তিনি কী করতে পারেন? ফৌজদার কলিমুল্লা কাপুরুষ, তার কর্মচারীরা ঘুষখোর, কে রক্ষা করবে?'

'এমন জানলে আমি এখানে আসতাম না। ভাই, মানুষে পড়ে শেখে আর ঠেকে শেখে। দায়ে পড়ে পুত্রবধূ নিয়ে সপ্তগ্রামে এসে যা শিক্ষা করে গেলাম তা জীবনে ভুলব না। আর যদি কখনও এ জীবদেহ নিয়ে বাদশাহী তখ্ত গাহের সম্মুখে পৌঁছুতে পারি তাহলে সুবা বাঙলায় ফিরিঙ্গ অত্যাচার যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টা করব—'

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথা হতে আসছেন?'

'জাহাঙ্গীরনগর। দিল্লি যাবার পথে আমার পুত্রের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। তার নাম ইমতিয়াজ খাঁ। সে একজন গোলন্দাজ—'

'দেখে মনে হয় আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আপনার নাম জানতে পারি?'

'পরিচয় দিয়ে লাভ নেই—এখানে আমরা সবাই বন্দী। এদের হাতে বন্দী হবার আগে আমি আমীর ছিলাম, আমার নাম শাহনওয়াজ খাঁ—'

দোকানদার শ্রদ্ধাপূর্ণ চোখে চেয়ে রইল। গুলরুখ আর সাকিলা পরস্পরের পানে তাকাল। ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

ফিরিঙ্গি সেনার দল টহল দিয়ে কাছে এসে গিয়েছিল। ওরা চুপ করে গেল।

যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি দূরে। মনে হচ্ছিল ফিরিঙ্গিরা জোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে—প্রতিপক্ষ সমানে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ লড়াই চলছে।

গুলরুখ ভাবছিল কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে—যেখানে হোক নিয়ে গেলেই

তো পারে। এভাবে দাঁড় করিয়ে বেইজ্জতী করা কেন? নিয়ে চলুক যেখানে ইচ্ছা—খুলে দিক হাতের বাঁধন। অঙ্গরাখার ভেতরে আছে জহরের কৌটো—টুপ করে ফেলে দেবে মুখে। বৃদ্ধ মুসলমানের পুত্রবধূর দিকে বাড়িয়ে দেবে—যদি অবশিষ্ট থাকে। এ ছাড়া পথ নেই। এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছে, কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না কেন?—যুদ্ধ শেষ হলে নিয়ে যাবে? কারা যুদ্ধ করছে? দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে রীতিমতো শক্তি প্রয়োজন। সপ্তগ্রামে কার এত শক্তি? একটাই তো নাম শোনা গেছে—সৌকত আলী খাঁ। আর কে? একা সৌকত আলী খাঁ এত বড় শক্তির মোকাবিলা করছেন?—ধন্য সাহস! ফিরিঙ্গিদের পর্যুদস্ত করে হাঁটিয়ে দিতে পারলে তবে উচিত শিক্ষা হয়।

ভাবছিল গুলরুখ আর দূরে বন্দুক ও তোপের শব্দে চমকে উঠছিল।

টহলদারী সেনার দল ফিরে যাচ্ছিল তাদের সামনে দিয়ে, দেখতে পেল, একজন অশ্বারোহী পর্তুগীজ সেনানায়ক এসে দাঁড়াল পথের ওপর। বন্দীদের পানে ফিরে দেখল একবার। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নায়ক কোথায়?'

প্রশ্ন সেনাদলের প্রতি। একজন সেনা উত্তর দিল, 'তিনি ওদিকে আছেন—'

অশ্বারোহী পর্তুগীজ সেনানায়ক বললে, 'ডেকে আনো। বলবে জরুরী প্রয়োজন। আমি আমীরাল ডি ক্রুজের কাছ থেকে বিশেষ বার্তা নিয়ে আসছি—'

সে ছুটে গিয়ে দলনায়ককে সংবাদ দিল। দলনায়ক এসে দাঁড়াল অশ্বারোহীর সামনে।

'কী সংবাদ?' এসেই জিজ্ঞাসা করল।

অশ্বারোহী বললে, 'এখনই সমস্ত বন্দী মুক্ত করো—'

'মুক্ত করব!' দলনায়ক বিস্মিত ঃ 'কেন? যে অপমান পাদ্রী আলমিডাকে করা হয়েছে তাতে তিনি সমস্ত পৌত্তলিক ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমরা তাঁর আদেশ পালন করছি মাত্র।'

'কিন্তু খবর রাখো কি', অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর তেমনি গম্ভীর ঃ 'পাদ্রীদের ইচ্ছামতো অত্যাচারে, সুবাবাঙলায় পর্তুগীজ রাজত্ব ডুবতে বসেছে—এইভাবে বেশিদিন চললে একেবারেই ডুববে। শোনো, আমীরাল ডি-ক্রুজের আদেশ, বন্দীদের ওপর অত্যাচার চলবে না, ওদের মুক্ত করে দাও।'

'কিন্তু—'

'আরও ভেঙে বলছি। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে।' অশ্বারোহীর গলার স্বর থমথম করে উঠল, 'যুদ্ধের অবস্থা ভালো নয়। সামনে সর্বেশ্বর সেন আর পেছনে সৌকত আলী খাঁ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার—সর্বেশ্বর সেনের একজন বাঙালী সেনানায়ক অসীম

সাহসে ও বীরত্বে আমাদের সমস্ত তোপ দখল করে নিয়েছে। তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। এদের মুক্ত করে তোমার সমস্ত সেনা সামনে পাঠিয়ে দাও—'

দলনায়ক তাড়াতাড়ি বন্দীকে মুক্ত করে দিল—সপ্তগ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা পর্তুগীজ নৌসেনাধ্যক্ষ ডি-ক্রুজের জয়গান করতে করতে যে যেদিকে পথ পেল পালাল। ফিরিঙ্গি সেনাদল দাঁড়াল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুতি। দলনায়কের নির্দেশে তারা এগিয়ে চলল। রাস্তা ফাঁক হয়ে গেল। বৃদ্ধ আমীর, তাঁর পুত্রবধূ, সাকিলা ও গুলরুখ দাঁড়িয়েছিল। সপ্তগ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বলা যায়। বিপদাশঙ্কা সম্পূর্ণ ঘটেনি। কোথায় যাওয়া যায় সেকথাই ভাবছিল গুলরুখ।

বৃদ্ধ বললেন, 'তোমরা এখন কোথায় যাবে?'

গুলরুখ বললে, 'নিকটেই আমার গৃহ, সেইখানেই যাব ভাবছি—'

'কে আছে সেখানে?'

'কেউ না। সেই ভৃত্যটি যদি গিয়ে না থাকে তবে একমাত্র সে-ই আছে—'

'যদি আপত্তি না থাকে, চলো দেখে আসি।'

'আপত্তি কি। আসুন—'

রাস্তা পার হয়ে হাত ক-পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সাকিলা। আবছা অবলম্বন বটে কিন্তু চেনা গেল ঠিক। সাকিলার পা যেন উঠল না। তা চোখ দুটো ভরে গেল জলে।

গুলরুখ বললে, 'কী রে, দাঁড়ালি কেন?'

সাকিলা চোখের জল মুছে নিল, বললে, 'চলো—'

চিনতে ভুল হয়নি, লম্বা সিরিঙ্গে চেহারা, জোরে বাতাস দিলে যে লোকটা পড়ে যাবে বলে আশংকা হয়, জাহান্নমে যাবার যার কত শখ ছিল, সে আর জ্বালাতন করবে না—বরবাদ হয়ে গেল তার জীবনটা। রাস্তায় মরে পড়ে আছে বসীর আহমদ। আফিঙের জন্যে লোকটা সত্যি সত্যি প্রাণ দিল। যথার্থ আফিঙ-প্রেমিক বটে!

গৃহে প্রবেশ করে গুলরুখ দেখল আজমল খাঁ মূর্ছিতের মতো পড়ে রয়েছে আর অস্ফুটস্বরে 'জল জল' করছে। সে জল এনে দিল তাড়াতাড়ি। বন্দুকের গুঁতোয় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল আজমল খাঁ, চোট লেগেছে দেহে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। জল খেয়ে স্বস্তিবোধ করল আজমল খাঁ। আরও খানিক শুশ্রূষা করার পর চাঙ্গা হয়ে উঠল ক্রমে । গুলরুখ জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন বোধ করছো আজমল?'

'ভাল।'

বৃদ্ধ আমীর বললেন, 'তোমরা কী তাহলে এখানে থাকবে?'

গুলরুখ বললে, 'আপনি কী বলেন?'

'আমার মনে হয় নগর এখনও নিরাপদ নয়। সপ্তগ্রামে না থাকাই ভাল। তোমার আর কোনো-আশ্রয় নেই?'

'ত্রিবেণীর ঘাটে আমার একটা বজরা আছে।'

'সেখানে গেলে কেমন হয়?'

'তাই চলুন।—আজমল, যেতে পারবে?'

আজমল খাঁ ঘাড় নেড়ে জানাল, পারবে।

গৃহে যা ছিল লুটতরাজ করে নিয়ে গেছে ফিরিঙ্গিরা। নেবার ছিল না কিছু। ওরা গৃহ পরিত্যাগ করে যাত্রা করল পূর্বদিকে বজরার উদ্দেশ্যে।

রাস্তা অন্ধকার—কোনো গৃহে আলো নেই। নিঝুম, স্তব্ধ পরিবেশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ—খানিক আগে তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে তার স্বাক্ষর। এখন গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, যুদ্ধ থেমে গেছে ওদের গৃহ-প্রবেশের পর। ফিরিঙ্গি সেনাদল অপসৃত। রাস্তায় লোক চলাচল নেই। যুদ্ধের ফলাফল জানতে উৎসুক ছিল গুলরুখ, সৌকত আলী খাঁ ব্যতীত আরও দুজনের কথা সে শুনেছে অশ্বারোহী সেনানায়কের বিবরণে, একজন সর্বেশ্বর সেন অপরজনের নাম জানা যায়নি, কিন্তু সাহস ও বীরত্বে সে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে—চমকিত করেছে ফিরিঙ্গিদের চিত্ত। সর্বেশ্বর সেনের বাঙালী সেনানায়ক—কে হতে পারে? ফিরিঙ্গিদের তোপ দখল করেছে—তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। কে এই বাঙালী দুঃসাহসী সেনানায়ক? আজমলের সংগৃহীত সংবাদ থেকে জানা গেছে সেই রূপবান কাফের যুবক আশ্রয় নিয়েছে মীনা বাজারে সর্বেশ্বর সেনের গৃহেই—সর্বেশ্বরের দল ভুক্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে-ই কী?—তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, একটু চোখের দেখা দেখবে, এই বাসনায় বজরা ছেড়ে সে বাড়িভাড়া করে উঠে এসেছিল। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য সারাদিন পথপানে চেয়ে বৃথাই কেটে গেছে সময়—দেখা তার পাওয়া যায়নি। এখন, এই যুদ্ধের ডামাডোলে, কেমন আছে কে জানে! খবর পেলে মনটা খুশি হত—ভার নেমে যেত একটা। কিন্তু কে খবর দেবে? তাকেই চলে যেতে হচ্ছে গৃহত্যাগ করে—অনেকেই হয়ত চলে গেছে। কে আর সংবাদ রাখে?

গুলরুখের মন খুঁত খুঁত করছিল। সে নীরবে পথ হাঁটছিল।

কিছুদূর চলে আসার পর তারা ফের একটা প্রশস্ত রাজপথ পেল। এ পথ ত্রিবেণীর দিকে গেছে। ত্রিবেণীর গঙ্গার ঘাট অল্প দূরে। পথের চতুর্দিকে স্তূপীকৃত মৃতদেহ—আর্তনাদ ও কাতরোক্তিতে পরিপূর্ণ। বোঝা যায় এখানেই যুদ্ধ হয়েছে সবচেয়ে জোর, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ঢাল, তলোয়ার, আগ্নেয়াস্ত্র।

ফিরিঙ্গিরা সম্ভবতঃ এখানেই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। এখন তারা পলাতক—দুপক্ষের মৃত ও মুমূর্ষু সৈনিক স্থানটি পরিপূর্ণ। পদে পদে বাধা লাগে—ভয় হয় কারো দেহে পা লেগে যাবে বুঝি। মধ্যে মধ্যে শোক দুঃখ বেদনা জমে ওঠে, ফিরিঙ্গিদের অমানুষিত অত্যাচারে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছা করে। কত লোক মারা পড়েছে, কত লোক চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে গেল। গুলরুখের মনে ব্যথা গুমরে উঠেছিল—সে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল কামানের আলোয় পথ চিনে।

কামানের গোলায় চারিদিকে আগুন লেগে গিয়েছিল—অধিকাংশ আগুন নিবে এসেছিল, গুমরে গুমরে কিছু জ্বলছিল। সেই আলো এসে পড়েছিল পথে। গুলরুখ মৃত ও মুমূর্ষুদের দেখে পা ফেলছিল। অস্ফুট কাতরধ্বনি শুনল সে—আহত এক হিন্দু-সৈনিক মুখ ফেরাল যন্ত্রনায়। চমকে উঠল গুলরুখ। ভুল দেখছে না তো! না ভুল নয়, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দিব্যকান্তি। সৈনিকের পোশাকে রক্তক্ষত শরীর বটে কিন্তু ও-মুখ চিনতে কী ভুল হয়? —গুলরুখ আর্তনাদ করে এসে পড়ল সৈনিকের শিয়রে, কোলে তুলে নিল মাথা।

সৈনিক চোখ মেলতে পারল না, সর্বাঙ্গে ক্ষত, চেতনা হারিয়ে ফেলল।

গুলরুখের আচরণে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ: 'বেটি, এ তোমার কে?'

গুলরুখ সহসা ভেবে পেল না কী উত্তর দেবে। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোনোমতে বলল, 'আমার খসম—'

'তোমার খসম?'

বৃদ্ধের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

'হ্যাঁ আমার খসম।' বলে কণ্ঠস্বরে জোর আনল গুলরুখ: 'রাগ করেছিলেন আমার ওপর— চলে এসেছিলেন বাড়ি থেকে। বহুদিন কোনো সংবাদ পাইনি। খোদাতাল্লার দয়ায় এই আমাদের সাক্ষাৎ।'

বৃদ্ধের সন্দেহ কাটল না তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে তোমাকে রক্ষা করার কেউ নেই—'

'আমি জানতাম না আমার খসম সপ্তগ্রামে আছেন।' গুলরুখ অনায়াসে এক মিথ্যা ঢাকতে আর এক মিথ্যায় চলে গেল। বললে, 'এভাবে সাক্ষাৎ হবে আমি কল্পনাও করিনি। এখন একে কী করে রক্ষা করা যায় সে কথা চিন্তা করুন। প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে, প্রাণ সংশয় দেখা দিতে পারে। কী করি বলুন?'

'দাঁড়াও দেখি—'

বৃদ্ধ নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যুবক মারাত্মক আহত বটে কিন্তু এখনও জীবিত—নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা যায়। বললেন, 'আমি আর তোমার

ভৃত্য বহন করে নিয়ে যেতে পারব। এখান থেকে ত্রিবেণীর ঘাট বেশীদূর নয়। চলো—'

তিনি ও আজমল খাঁ হৃতচেতন যুবককে বহন করে নিয়ে চললেন।

।। আট ।।

জাহাঙ্গীরনগরে দুর্গমধ্যে নদীতীরে একটি কক্ষে বসে বাঙলার সুবাদার মোকরম খাঁ বিশ্রাম করছিলেন। ভীষণ গ্রীষ্ম, একজন বাঁদী নবাবের পদসেবা করছিল, দুজন ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে ব্যজন। এবং চতুর্থ বাঁদী সুশীতল পানীয় নিয়ে কক্ষের কোণে দাঁড়িয়েছিল তটস্থ হয়ে—কখন্ হুকুম হয়। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ—অপরাহ্ন আগতপ্রায়। দিবসের উত্তাপে দাবদাহ—আকাশ যেন অগ্নিবর্ষণ করছে। মাঝে মাঝে শেষ অপরাহ্নে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়, কদিন যাবত আকাশে লেশমাত্র মেঘের আভাস নেই, দারুণ গুমোট। মোকরম খাঁর আয়েসী শরীর আইঢাই করে উঠছিল।

একজন খোজা এসে দাঁড়াল কক্ষের দুয়ারে—অভিবাদন করল।

মোকরম খাঁর নিদ্রাকর্ষণ দেখা দিয়েছিল, তিনি বিরক্ত হয়ে আলস্য বিতাড়িত কণ্ঠে তার আগমনের কথা জানতে চাইলেন।

খোজা পুনর্বার অভিবাদন করে বললে, 'বন্দানওয়াজ, দেওয়ান রামতারণ সদরে অপেক্ষা করছেন—'

নবাবের কণ্ঠে তেমনি বিরক্তি ঃ 'রামতারণ এ অসময়ে কেন? তার কি সময় জ্ঞান-নেই?'

খোজা বিনীতস্বরে বললে, 'বান্দা তাঁকে জানিয়েছিল যে সুবাদার এখন খোয়াবগাহে, কিন্তু দেওয়ান সায়েব বললেন, বাদশাহের দরবার থেকে জরুরী পাঞ্জা নিয়ে একজন সওয়ার এসেছে— সে সুবাদারের সাক্ষাৎপ্রার্থী—'

'এ গরমে লোকটা এল কী করে?' তবু বিরক্তির অবকাশ থাকল না তিনি বললেন, 'যাও, রামনারায়ণকে গোসলখানায় অপেক্ষা করতে বলো, আমি যাচ্ছি।'

খোজা পুনরায় অভিবাদন করে প্রস্থান করল।

সদর খালিসার দেওয়ান রামতারণ মজুমদার, বঙ্গজ কায়স্থ, খর্বাকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তিনি বুদ্ধিবলে সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতি করে এই উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। তখন সামান্য বংশজাত হিন্দুর পক্ষে এর চেয়ে উচ্চতর রাজপদ লাভ প্রায় অসম্ভব ছিল।

হুগলী থেকে তিনি এসেছেন সৌকত আলি খাঁর নির্দেশে—আসতে আসতে

দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে দেখে চিন্তায় পড়েছিলেন, এখন সুবাদারের বিশ্রামের সময়, সাক্ষাতের আর্জি পেশ করলে বিরক্ত হতে পারেন। নবাবের দেওয়ান-খানায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন। বাইরে ঘোরার ক্ষুরের শব্দ শুনে দেখলেন এক সওয়ার এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন সে বাদশাহের পত্রবাহক—সুবাদার মোকরম খাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। মাঝে মাঝে বাদশাহের পত্রবাহকেরা আসে এবং যথাবিহিত পত্র প্রদান করে চলে যায়। বাদশাহের পত্র যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা—তার হাতেই অর্পণ করা নিয়ম। সুতরাং রামতারণ সাক্ষাতের অজুহাত পেল, বাদশাহী সওয়ারকে অপেক্ষা করতে বলে খোজা-মারফত সুবাদারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করল। নিজের প্রয়োজনের কথা না বলে সওয়ারের উপস্থিতির কথা জানাল।—এখন যত আরামই করুক সুবাদার-সায়েব, স্বয়ং বাদশাহের আহ্বান, তাঁকে দর্শন দিতেই হবে।

খোজা ফিরে এসে সে কথাও জানাল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না—ফটকে বেজে উঠল নাকারা। দেওয়ান-খানার দুয়ারে দাঁড়িয়ে নকীব তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করল। আশা, সোটা, মহীমরাতব নিয়ে অসংখ্য হরকরা ও পাইক দেওয়ান-খানায় প্রবেশ করল সারি বেঁধে—বাঙলার নবাব মোকরম খাঁ এসে উপস্থিত হলেন তাদের মাঝদিয়ে। দেওয়ান রামতারণ মজুমদার কুর্নিশ করে বাদশাহী দরবারের সওয়ারকে ডেকে আনলেন। সওয়ার দাঁড়াল অভিবাদন করে—নবাব স্বয়ং তিন পদ অগ্রসর হয়ে তিনবার কুর্নিশ করে পত্রানুগত্য জানালেন। একজন হরকরা একখানি রজতের পাত্র এনে নবাবের হাতে দিল এবং কুর্নিশ করে সরে গেল। সওয়ার সেই পাত্রে বাদশাহের পত্রখানি রাখল। নবাব বললেন, 'দেখতো দেওয়ান, পত্রে কি লেখা আছে?'

বলে তিনি পাত্রসহ পত্রখানি দেওয়ানের দিকে বারিয়ে দিলেন। রামতারণ পত্র খুলে তার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'বাদশাহ সুবা বাঙলার সংবাদ জানতে চান—'

'কেন?' সুবা বাঙলা তো বেশ সুখে-শান্তিতে আছে/ কোথাও গোলমাল দেখা দিয়েছে নাকি?'

সুযোগ পেলেন রামতারণ মজুমদার। বললেন, হুজুর, আমি সপ্তগ্রাম থেকে আসছি। সেখানকার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—'

'কি হয়েছে?' 'হুজুর' পর্তুগীজরা বড়ই উৎপাত করছে। সেখানকার মানুষের জান-প্রাণ বিপন্ন—

'হুঁ—'

'গতকাল একটা ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে সপ্তগ্রামে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। ওদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে হুজুর। গ্রামে নগরে লুটপাঠ করছে, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—'

'হুঁ।—'

'আমার একটা অনুরোধ আছে হুজুর—আমার এক বন্ধুর কন্যাকে মুখসুদাবাদ থেকে ফিরিঙ্গিরা অপহরণ করে এনেছে সপ্তগ্রামে। তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টা খুব গুরুতর হয়ে উঠেছে।'

'হু।—'

'কি করতে বল?'

'হুজুর, বাদশাহ্ হলেন ঈশ্বরের ছায়া।' রামতারণ মজুমদারের কণ্ঠস্বর অতি বিনীত ঃ 'আপনি তার প্রতিনিধি, আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত অসহায় বালিকার উদ্ধার অসম্ভব—'

'কিন্তু দেওয়ান' নবাব দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, 'ফিরিঙ্গি লড়াইয়ে বড়ই ওস্তাদ। তারা শাহানসাহ বাদশাহের হুকুম তামিল করে না অনেক সময়, আমার অনুরোধ কি গ্রাহ্য করবে?'

কথাটা সত্যি। তবু বাঙলার নবাবকে নিজ দলে টানতে হবে। রামতারণ মজুমদার কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই করবে হুজুর—'

বলে তোষামোদের সুর তুলে ধরলেন উচ্চে ঃ 'জনাবালি হিন্দু স্থানের রুস্তম, বাদশাহী দরবারে আফ্‌তাব্ ও মাহ্, সুবা বাঙলায় এমন কে বেওকুফ আছে যে হুজুরের ফরমান বরদারী করবে না? জনাবালির মুখ থেকে ফরমানীর আওয়াজ বার হতে না হতে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের সমস্ত ফিরিঙ্গি তা তামিল করবে। সুবা বাঙলার ভাগ্য বিধাতা হুজুরের আদেশ সবাই মান্য করবে—'

তোষামোদে খুশি হলেন বাঙলার নবাব। কিন্তু কেঁপে উঠলেন না তেমন। বললেন, 'তবু যদি না মানে বড় অপ্রস্তুতে পড়ব। তার থেকে এক কাজ কর, ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে মেয়েটি খরিদ করে আনো, অর্থলোভে ওরা এদেশে এসেছে। সেটাই সহজ পথ—'

'তারা যদি বিক্রয় না করে?'

'তাহলে ভাববার বিষয়—'

'কি করবেন?'

'তখন কলিমুল্লা খাঁকে হুকুম দেব, সে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে'

'অর্থলোভে অথবা নবাবের খাতিরে পর্তুগীজ সেনাপতি তাকে ছাড়তে চাইলেও', রামতারণ মজুমদার আরও গভীরে ডুব দিলেন, 'পাদ্রীরা ছাড়তে চাইবে না। ওদের উৎপীড়ন আরও ভয়ানক—'

'তুমি কি সেই বালিকাকে খরিদের চেষ্টা করেছিলে?'

রামতারণ বললেন, এ বালিকার জন্যে করিনি বটে, কিন্তু পূর্বে দু-একবার করেছি এবং তখন এই জবাব পেয়েছিলাম—'

'ঠিকা আছে'। নবাব গরমে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বললেন, 'আমার পরামর্শে আরেকবার চেষ্টা করে দেখ। আমি এখন বেরুব।' তোমার আর কিছু বলবার আছে?'

না 'কোথায় বেরুবেন হুজুর?'

'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

বড্ড গরম লাগছে, মুরশলা বজরায় নদীবক্ষে কিছুক্ষণ বেড়াব। ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো স্বস্তি পাব।'

'কিন্তু—'

'তারা আছে নাকি?'

'তারা অবশ্যই ছিল. ফিরে গিয়ে সৌকত আলী খাঁর সঙ্গে দেখা করে নবাবের মনোভাব জানাতে হবে! কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এই সময়ে নদীবক্ষে বিহার কোনোমতেই উচিত নয়। বিশেষ এই অপরাহ্নে। সারাদিন অসহ্য গুমট। দু-একবার মেঘের সঞ্চার হয়েছে, কে বলতে পারে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা নেমে আসবে না। প্রায়ই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে— আজও হবে না তার নিশ্চয়তা কি? মাঝনদীতে ঝড়বৃষ্টি দেখা দিলে, বড় মুরশলা বজরা উল্টে যাবে এবং মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু একথা বলার মত সাহস তাঁর নেই। অথচ বাঙলা নবাবের ইচ্ছাকে অমান্য করলে তাঁর রোষের কারণ হতে হয়। ঘামতে লাগলেন রামতারণ মজুমদার।

পাইক চলে গিয়েছিল নবাবের আদেশ নিয়ে, ফিরে এসে জানাল বজরা প্রস্তুত। 'কি হে'?

রামতারণ মজুমদার বললেন, 'হুজুর কদিন যাবৎ আমার শরীর অসুস্থ,' কবিরাজের নির্দেশে বেশি ঘোরাঘুরি বারণ।'

'বেশ। তুমি বিশ্রাম করো, আমি চলি—'

নবাব চলে গেলেন।

দেওয়ান-খানায় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন খালিসা দেওয়ান রামতারণ মজুমদার। নদীতে তার নৌকো বাঁধা আছে। ফিরে যেতে হবে সপ্তগ্রামে। সৌকত আলি খাঁকে বলতে হবে সব কথা। যেটুকু কথাবার্তা হল তাতে বোঝা যায় বাঙলার নবাব বেশ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি কিংবা এও হতে পারে, ফিরিঙ্গিদের পক্ষ হতে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে বশ করে রাখা হয়েছে। তিনি সোজাসুজি আদেশ প্রচার করতে রাজী নন—কারণ কী? ফিরিঙ্গিরা এত সাহস পায় কোথা থেকে? নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে বশ করা আছে। না হলে,

খরিদের কথা বলেন? আপোস-নিস্পত্তির এই চেষ্টা থেকেই বোঝা যায় তিনি ফিরিঙ্গিদের ঘাঁটাতে ইচ্ছুক নন। পাছে উপঢৌকন বা বিলাস উপকরণের পথ বন্ধ হয়।—তার চেয়ে সৌকত আলি খাঁ অনেক বলিষ্ঠ চিত্ত পুরুষ। অন্ততঃ বাঙলাদেশের প্রতি তাঁর দরদ অকৃত্রিম। ও-রকম একটি লোক বাঙলার সুবাদার হলে ভাল হত। গতকাল যে কাণ্ড ঘটল সপ্তগ্রামে, সৌকত আলী খাঁ আর সেই তরুণ যুবক না থাকলে গোটা নগর ছারখার হয়ে যেত। অবশ্য সর্বেশ্বর সেন সাহায্য করছেন যথাসাধ্য, গোপনে তাঁর সৈন্য সংগ্রহ করা ছিল, সৌকত আলী খাঁর সঙ্গে সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে সর্বেশ্বরের আশ্রিত সেই যুবক—প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল, বাহাদুর বলতে হবে— ছেলেটা কে, কোথা থেকে এসেছে, পরিচয় কি—কিছুই জানা নেই। তার আত্মীয়ার উদ্ধারের অনুরোধ নিয়ে এখানে আসা, কিন্তু সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। বাঙলার নবাব ফিরিঙ্গি-তোষণের পক্ষপাতী। বৃথা আসা এতদূর—সপ্তগ্রামে এখন কী ঘটছে কে জানে। অবশ্য সৌকত আলী খাঁর ভয়ংকর মারমূর্তি দেখে ফিরিঙ্গিরা আজ আর হামলা করতে সাহস করবে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, সেই যুবকটির কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, যুদ্ধের পর তাকে আর দেখা যায়নি, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে—জীবিত কিংবা মৃত কোন হদিশ মিলছে না—।

ভাবতে ভাবতে দেওয়ান-খানার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রামতারণ মজুমদার। দেখতে পেলেন অদূরে বুড়ি গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ভাসতে ভাসতে সুবাদারের প্রচণ্ড মুরসলা বজরা কেল্লার ঘাটে এসে ভিড়ল। ভ্রমণোপযোগী সুসজ্জিত বিলাসী বজরা বটে। সুবাদারের সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে এলে হতো। তাঁর ইচ্ছার সম্মান রক্ষা হত এবং বেরিয়ে আনন্দলাভ করা যেত। কিন্তু শরীর সত্যি ভাল না এবং আকাশের অবস্থা আরও খারাপ। ভারি ভারি মেঘ আনাগনা করছে আকাশে—কখনও কালো কখনও ছায়া। এ অবস্থায় নদীবক্ষে কেউ কী বিলাস বিহার করে? বজরা ছেড়ে দিয়েছে, তিনি দেখলেন, বাঙলার সুবাদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্মচারীগণ বজরায় উঠেছেন। বজরা ভাসতে ভাসতে নদীর মাঝখানে গিয়ে পড়ল। পারলে বাতাস লেগে হু হু করে ভেসে যাচ্ছে বজরা।—কিন্তু ওকি! যেন চমকে উঠেছেন রামতারণ মজুমদার। তাঁর আশঙ্কা সত্যি হল নাকি? ঈষাণ কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। আকাশের আলো ঢেকে গেল অকস্মাৎ। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথায়, ঘন ঘন চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস—ঝড়ের গর্জন। শান্ত নদী হয়ে উঠল উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল কেল্লার গায়ে। কেল্লার ভেতর থেকে উঠল হাহাকার রব। তখনও দেখা যাচ্ছিল সুবাদারের বজরা। নাগরদোলার মত কখনও তরঙ্গ শীর্ষে কখনও নিম্নে— কেউ

যেন খুশিমতো তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ আত্মরক্ষা করবে প্রকৃতির এই ভয়ানক তাণ্ডবে? আত্মরক্ষা করতে পারবে কি? অবচেতন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন রামতারণ মজুমদার। বুড়িগঙ্গার করাল গ্রাসে ডুবল বজরা। নাগরদোলার মত আর উঠে এল না। সুবাদারের বজরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রামতারণ মজুমদার চোখ বুজে মাথা নত করলেন। আকস্মিক ও অভাবিত বিপর্যয়। বাঙলার নবাবের সলিল সমাধি।

।। নয় ।।

গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বেঁটে কিন্তু লম্বোদর, মুণ্ডিত শীর্ষ, এক বৈরাগী সরস্বতী ও গঙ্গা সঙ্গমের নিকটে, সে তুঁতুল গাছের নিচে বসে ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছিল। তার পাশে কৃষকায় ও কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির একটি দীর্ঘকার ব্রাহ্মণ যুবক দাঁড়িয়েছিল। দুজনেরই নৌকোর প্রতীক্ষা। সপ্তগ্রাম থেকে তারা হুগলী যাবে। বেলা বেড়ে উঠেছিল অথচ কোন নৌকোই হুগলী যেতে রাজী হচ্ছিল না। বৈরাগীর তাঁরা ছিল বেশী, সেই ঘাটে বাঁধা নৌকোর মাঝিদের উদ্দেশ্যে অনুনয় করছিল, 'চলোনা ভাই, ভাড়া দেব, আমাদের হুগলী পৌছে দেবে—'

মাঝিরা নির্বিকার। এক মাঝি বললে, কতবার বলব আজ আমরা কেউ সপ্তগ্রাম ছেড়ে হুগলী যাব না।'

বৈরাগী কাতরস্বরে বললে, 'কেন যাবে না ভাই? আমার যে বিশেষ দরকার—' মাঝি বললে, হুগলী যাবার কথা ভুলে যাও।'

'কেন ভাই?'

মাঝি কৃপাবশতঃ বললে. 'বাবাজী, আট আনা পয়সার জন্য কে মরতে যাবে। গতকাল রাতে সাত গাঁয়ে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ফৌজদারী সেপাই দলের ভীষণ হাঙ্গামা হয়ে গেছে, ফিরিঙ্গিরা পালিয়ে গেছে বটে, বুঝতেই পারছ তাতে তাদের রাগ বেড়ে গেছে আরও। এখন হাতের কাছে সাত গাঁয়ের লোক এলে গুলি করে মারবে কিংবা শূলে চড়াবে। তোমার দরকার আছে বলে তো আমরা প্রাণ দিতে পারি না! পারি কি?

'তাই তো'! হতাশভাবে সে ব্রাহ্মণ যুবকের পানে তাকাল। ব্রাহ্মণ যুবক পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসী—ব্যাপারটা সে জানত। ব্যস্ততা প্রকাশ করেনি সেজন্যে। বৈরাগী তার মন্তব্য আশা করছে দেখে সে বললে, মাঝিদের কথা সত্যি। ওরা কেউ হুগলী যাবে না। দেখা যাক নৌকো মেলে কিনা। আমারও প্রয়োজন রয়েছে হুগলীতে নৌকো যদি না মেলে হেঁটে যেতে হবে বাধ্য হয়ে—'

'আমি দূর থেকে আসছি। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে তার ওপর রোদ যা কড়া হয়ে উঠেছে, হাঁটতে কষ্ট হবে।'

ব্রাহ্মণ যুবক বললে, 'নৌকো না পেলে এছাড়া উপায় কি।'

'সবই গোবিন্দর ইচ্ছা—' সে এমনভাবে হতাশভঙ্গি করল যে ব্রাহ্মণ যুবক বলে উঠল, 'আমি যজমান-বাড়ি যাব।' তাদের বলেছিলুম দুপুরের আগে পৌছোব, কিন্তু ব্যাপার যা দেখছি, তাতে দিন কাবার হয়ে যাবে। তোমার তারা কিসের বাবাজী?'

'আমার এক শিষ্য গুরুতররূপে অসুস্থ। সেই সংবাদ পেয়ে চিরে-মুড়ি বেঁধে বেরিয়েছি—পথে তা শেষ হয়েছে। এতটা বেলা হল, খিধে পেয়েছে খুব। ভেবেছিলুম তাড়াতাড়ি হুগলী পৌছোতে পারলে—'

ব্রাহ্মণ যুবক বললে, 'মাঝিরা কেউ যাবে বলে মনে হয় না।' অপেক্ষা করলে এমন লোক হয়তো পাওয়া যাবে যার নৌকো আছে এবং হুগলী যাবে। সপ্তগ্রাম থেকে অনেক লোক হুগলী যায়—'

'দেখি রাধাগোবিন্দ কী করেন।'

বৈরাগী কৌটা খুলে এক টিপ নস্য গুঁজে দিল নাকে। অন্যমনস্কের মতো চেয়ে রইল পথের পানে। বহুদূর হতে হেঁটে আসছে সে, পথশ্রমে ক্লান্ত। ব্রাহ্মণ যুবক পায়চারী করতে লাগল তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে।

বেলা বাড়ছিল—বন্দরের কোলাহল শোনা যাচ্ছিল যথারীতি। গতকাল রাতে হাঙ্গামার কথা প্রত্যেক লোকের মুখে-নানারূপ মন্তব্য। জটলা ও আলোচনা। নগর হাঙ্গামার সাক্ষ্য পড়ে রয়েছে ইতস্তত, মৃতদেহ, সমস্ত অপসারিত হয়নি। তাদের কেন্দ্র করে আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন ও চীৎকার। অপেক্ষাকৃত শান্ত এলাকায় দোকানীরা দোকান পাট খুলেছে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দোকানের সামনে আগের মত ভীড়। লোকজন কেনাকাটা করছে। কিন্তু কেমন ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গী। রাত্রি প্রভাত—সপ্তগ্রামের চেহারা হতে আনন্দ উল্লাস যেন অন্তর্হিত—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মচাঞ্চল্য ক্রমশ যেন ফিরে আসছিল।

বৈরাগী ইতিপূর্বে সপ্তগ্রামে আসেনি তাই নগরের চেহারার এ পরিবর্তন তার চোখে তেমন লাগছিল না। অধিকন্তু ক্ষুধার্ত এবং পথশ্রমে ক্লান্ত। অসুস্থ গুরুভাইয়ের কথাই সে ভাবছিল বিশেষভাবে. কিভাবে হুগলীর পথটুকু পার হয়ে গুরুভাইয়ের সাক্ষাৎ পাবে সেই চিন্তা। সপ্ত গ্রামে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ফৌজীদলের হাঙ্গামা হয়ে গেছে। সে জানত না—রাধা গোবিন্দের নাম স্মরণ করে সে বেরিয়ে পড়েছিল গ্রাম হতে। এতখানি পথ হেঁটে এসে ভাবনায় পড়েছে কীভাবে বাকি পথটুকু অতিক্রম করা যায়। মণ্ডিত মস্তক, পরনে গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড। বৈরাগী পথের পানে তাকিয়ে বসেছিল অন্যমনস্কভাবে। এমন সময় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘকায় ব্যক্তি,শ্যামবর্ণ। তাতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করতে দেখে

বৈরাগীর মনে আশার সঞ্চার হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে মস্ত এক প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল। ঠাকুরমশাই, প্রণাম হই, আপনি কী কোথাও যাবেন? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আকস্মিকভাবে প্রমাম ও প্রশ্ন পেয়ে বিব্রত হলেন, বৈরাগী আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ঈষৎ বিরক্তস্বরে বললেন, কেন বল দেখি, আমি কোথাও যাব কিনা তোমার কি দরকার? তুমি তোমার পথে গেলেই তো পার—'

তাঁর বিরক্তি গায়ে মাখল না বৈরাগী। শিশুর মত সরল কণ্ঠে বললে, আজ্ঞে তা আর পারছি কই। এতখানি পথ এসে সাত গাঁয়ে আটকে গেছি নৌকো পাচ্ছি নে। 'কোথায় যাবে তুমি?'

'আজ্ঞে সে প্রভুর ইচ্ছা' আপাতত হুগলী যাবার বাসনা। কিন্তু কোন মাঝি যেতে চাইছে না। রাধা গোবিন্দ হয়তো বিপাকে ফেলে আমাকে পরীক্ষা করছেন—' 'তার পরীক্ষা ভীষণ হে। সবাইকে তিনি পরীক্ষা শুরু করছেন। সুবা বাঙলা ভয়ংকর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে।' তার কথার গূঢ়ার্থ গ্রহণ করার ক্ষমতা বৈরাগীর ছিল না। সে অধৈর্য হয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ চলে যায় দেখে। কথাবার্তায় সে নিতান্ত সরল, কিন্তু গ্রাম্য দোষযুক্ত। সে পিছন থেকে বলে উঠল, 'রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ। ঠাকুর মশাই চলে যাচ্ছেন যে! খুব ব্যস্ত নাকি?' গঙ্গাকিশোর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা একটু ব্যস্ত আছি। তুমি কিছু বলবে।'

'না।' মানে—' বৈরাগী কিছু ভেবে পেল না ঃ 'আপনি কি সাতগাঁয়ে নতুন এসেছেন?—' অগত্যা এই প্রশ্ন।

গঙ্গাকিশোর হেসে ফেললেন, 'কেন বল দেখি?' 'এই চালচলন দেখে বলছি।' 'বটে। কেমন দেখছো?'

'আজ্ঞে।', শহরের লোকের চালচলন আলাদা রকম—' তাদের সঙ্গে আপনার মিল নেই। জানেন, আমিও পল্লীগ্রামের লোক। আমার নাম নবীন দাস বৈরাগী।'

তা বাবাজী, তোমার নিবাস কোথায়? 'কাটোয়ায় গেছেন কখনও?' বৈরাগীর মুখে তেমনি সরল হাসি ঃ কাটোয়ার নিকটে উদ্ধারণপুরে। আপনার?'

'মুখসুদাবাদের নিকটে রণসাগরে—'

'কিসে এসেছেন?'

'নৌকোয়'

কথা বলতে না পারলে আমার বড্ড কষ্ট হয়। আলাপ করে খুশি হলুম। আপনি কী হুগলির দিকে যাবেন?

'এখনই বলতে পারছি না। সংবাদের উপর নির্ভর করছে—'

'কেউ সংবাদ আনতে গেছে বুঝি।' বৈরাগী সরল-প্রসন্নতায় বললে, 'তাহলে বসি। আপনার সঙ্গে হুগলী যাব।'

কথাটা শুনতে পেল এক মাতাল—সে তখন টলতে টলতে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কথা শুনে তার হেঁচকি উঠল। বৈরাগীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'ও-কাজ করো না বাবাজী—হুগলী যাবার কথা ভুলে যাও। তোমার মতো নধর পাঁঠা সেখানে গেলে ফিরিঙ্গিরা লোভ সামলাতে পারবে না, গির্জায় নিয়ে গিয়ে জবাই করবে নির্ঘাত—'

বৈরাগী তা শুনে প্রবলবেগে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করল। প্রাণী-হত্যার সংবাদে কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠল, 'রাধাগোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ! ঠাকুরমশায়, বেটা বলে কী? ওর কী পরলোকের ভয় নেই?'

মাতাল হেসে উঠে বললে, 'পরকাল তো বহুদূর—ইহকালের ভয় যে নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু মিথ্যে বলিনি বাবাজী, তোমার ভুঁড়িটিতে অনেক মাংস, সুন্দর শিব-কাবাব হয়। এ সুযোগ কী ওরা-ছাড়বে?'

বৈরাগী আবার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করল—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তার পানে তাকালেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

মাতাল হলুদ দন্ত বিস্তার করে হাসল। বললে, 'ঠাকুর আপনিও চটেছেন দেখছি। কিন্তু আপনাকে আমি হলপ করে বলছি কাবাব অতি সুখাদ্য বস্তু। একবার স্বাদ গ্রহণ করলে সহজে ভোলে কোন রসিক—'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'সে বস্তু তুমি খাও। আমাদের বিরক্ত করছো কেন? কে তোমাকে কথা বলতে ডেকেছে?'

'কেউ ডাকেনি ঠাকুর, এ হল দ্রব্যগুণ। গন্ধের মতো ভক ভক করে কথা বেরিয়ে আসে—আটকাতে পারি না!' হেঁচকি উঠল, সামলে নিয়ে বললে, 'যাচ্ছি ঠাকুর, আপনি রাগ করবে না। কিন্তু এ পাঁঠাটি হাতছাড়া করে যাব? যেমন নধর তেমনি পুরুষ্টু—'

'ফের ও-সব কথা?' ধমক দিলেন তিনি, 'যদি ভাল চাও তো শিগগির চলে যাও এখান থেকে।'

মাতালকে ধমক দেওয়া বৃথা। বরং তাতে বিপরীত ফল হয়। এ ক্ষেত্রে হল তাই। মাতাল নড়ল না, সেখানে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। 'আপনাকে তো কোনো কথা বলিনি, আমার সঙ্গে ওই বোষ্টমের কথা হচ্ছিল। আমি যার সঙ্গে খুশি কথা বলব. আপনার তাতে কি!'

হেঁচকি উঠল, কঁক করে থুথু গিলল মাতাল।

বৈরাগী বললে। 'ঠাকুর, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চলুন আমরাই সরে যাই।—সাতগাঁ অতি বদ জায়গা। দেখছেন কিরকম টলছে, কে জানে হয়ত এখুনি বমি করে দেবে। বেটার আক্কেলজ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ—'

'কী বললি? আমার আক্কেলজ্ঞান নেই? আমি মাতাল?' হেঁচকি উঠল, সামলে নিয়ে বললে, 'তবে রে বেটা নেড়ে, তুই আমাকে অপমান করিস? এতদূর স্পর্ধা। চল্ বেটা তোকে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দেব—'

বলে সত্যি সত্যি হাত ধরে টান দিল। বৈরাগী যাতনায় অস্থির হয়ে যত বলে 'ছাড়্ ছাড়্' মাতাল ততই টান দেয়। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির আর বলির কথা মাতাল যত বলে বৈরাগী ততই নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতে থাকে। টানাটানিতে বৈরাগীর মাথার শিখা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। ঘটনাটা রসোভোগের সীমা ছাড়িয়ে যায় দেখে ব্রাহ্মণ যুবক ও গঙ্গাকিশোর স্থির থাকতে পারলেন না—মাতালকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করলেন। মাতাল চলে গেল টলতে টলতে।

মাতাল চলে গেছে দেখে সে বললে, 'লোকটা একেবারে বেল্লিক। কিন্তু যা বলে গেলে তা সত্যি নাকি ঠাকুর মশায়?'

গঙ্গাকিশোর বুঝতে পেরেছিলেন বৈরাগী কী বলতে চায়। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'ওই-যে বেটা যা বললে—'

'আবার গালি দিচ্ছ কেন?'

'দেব না?'

'এখুনি তো মরতে বসেছিলে।'

'এখন আর শুনতে পারবে না—'

'না পাক, অনর্থক গালি দিয়ে লাভ কি।'

'বেশ। কিন্তু ঠাকুরমশায়, কথাটা কি সত্যি?'

'কোন্ কথা?'

'ওই যা বললে—'

'সে তো অনেক কথাই বলেছে, তুমি কোন্ কথা জানতে চাইছো?'

'ওই যে,গীর্জায় নিয়ে গিয়ে—'

'কী?'

'ঠাকুর, সে কথা কী মুখে আনতে আছে? থুঃ—'

ঠাকুরমশায় মজা পেয়ে বললেন, 'স্পষ্ট করে না বললে আমি বুঝব কী করে?'

'ওই-যে গির্জায় নিয়ে গিয়ে', শব্দটা উচ্চারণ করতে সংস্কারে বাধছে বলে সে বললে, 'বুঝতে পারলেন না? আপনারা সেই কালো মাগীর সামনে যা করেন তা-ই।'

'ও, বলির কথা বলছো?'

শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করল।

ওর আচরণে ঠাকুরমশায় ভয়ানক চটে গেলেন। বললেন, 'পাষণ্ড, তুই মহামায়ার নামে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছিস? তোর নরকেও স্থান হবে না—'

বৈরাগী বড়ই বিপদে পড়ল। কদর্যে কথাটা সে বলেনি, সরলভাবেই ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। ঠাকুরমশায় চটে গেল তাঁর নৌকোসঙ্গী হওয়া সুদূরপরাহত—সারাদিন বসে থাকতে হবে এই গাছের তলাতেই। হুগলী যেতেই হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব, অথচ গির্জার নরবলির কথা শুনে সে বড়ই ভীত, কে জানে যদি সে ফিরিঙ্গিদের কবলে পড়ে! সপ্তগ্রামের মতো হুগলীও যে বদ জায়গা সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই—দু-জায়গাতেই ফিরিঙ্গি—যদি ধরে নিয়ে যায়—।

সেটা পরের কথা। আপাততঃ ঠাকুরমশায় চটে গেলেন। নিজের অজ্ঞাতে তাঁর মনে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। ওভাবে না বললেই বোধহয় ভাল হয়। বৈরাগী কুণ্ঠাবোধ করল, হাতজোড় করে বললে, 'ঠাকুরমশায়, আমি পাড়াগাঁর মানুষ, ভুল হয়ে গেছে। অপরাধ নেবেন না—'

তিনি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বৈরাগী আবার বললে, 'আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ছোট-র কথা গায়ে মাখবেন না। কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। গুরুর আদেশ কিনা।'

রাঘব বললেন, 'কী তোমার গুরুর আদেশ?—তোমার গুরু কী মহামায়ার নামে থুতু ফেলতে বলেছে? বড্ড বাড়াবাড়ি—'

বৈরাগী তটস্থ হয়ে বললেন, 'না, না। লোকাচার।'

'এমন লোকাচার সকলে সহ্য করবে কেন?'

'ঠাকুরমশায়, অপরাধ হয়েছে।' হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণে শান্ত হলেন। বললেন, 'বাবাজি, তুমি একটা মাতালের কথা বিশ্বাস করলে? খৃষ্টানরা কখনও নরবলি দেয়?'

'বাঁচলুম—'

'তবে শুনেছি শূলে চড়িয়ে সাজা দেয়—নরবলি সভ্যসমাজে উঠে গেছে—'

দু-দুবার বলি শুনে বৈরাগী থুতু ফেলতে যাচ্ছিল—বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করল। নস্যর কৌটো খুলে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল। বললে, 'ঠাকুরমশায়, একজন লেঠেল এদিকে আসছে।'

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বললেন, 'ভয় পেয়ো না। ওরা আমার লোক। ওদের খবর নিতে পাঠিয়েছিলুম।'

আট-দশজন লেঠিয়াল এসে তাঁকে প্রণাম করল। তাদের মধ্যে রাঘব ছিল।

তিনি বললেন, 'কী খবর রাঘব?'

রাঘব বললে, কোনো সংবাদই পেলাম না ঠাকুরমশায়। সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, যত লোক মরেছে অথবা জখম হয়েছে তাদের সকলকেই দেখে এসেছি। মহারাজ কোথাও নেই—'

তার স্বরে দুশ্চিন্তা ও হতাশা।

গঙ্গাকিশোর চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'তাই তো! অমি ভেবেছিলাম এবার নিশ্চয় সাক্ষাৎ পাব। মুশকিল হল দেখছি।'

'এখন কী করা যায়?'

'ভাবছি। রাঘব, আমাদের নৌকো কোথায়?'

'নিকটেই। বাদশাহী পুলের নিচে।'

'তোমাদের আহার হয়েছে?'

বেলা দ্বিপ্রহরে ঝুঁকেছে। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ব্রাহ্মণ নিজে তখনও স্নানাহার করেননি। তাঁর মুখ শুকনো। রাঘব বললে, 'খাব কী ঠাকুরমশায়? সকাল থেকে তো ঘুরেই বেড়াচ্ছি। চলুন নৌকোয় ফিরে যাই। আপনারও স্নানাহার হয়নি এখনও—'

নৌকোর কথা শুনে বৈরাগী চাঙ্গা হল। বললে, 'তাহলে হুগলী যাওয়া যায়, কী বলেন?'

গঙ্গাকিশোর হেসে বললেন, 'যায় বই কি। এই সংবাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এবার হুগলী যেতে হবে। বাবাজী, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, আমরা অপরাহ্নে হুগলী যাব—'

'গৌরহরি, গৌরহরি!'—কী সৌভাগ্য! বৈরাগী নেচে উঠে একপাক ঘুরে গেল— দেখতে পেল ব্রাহ্মণ যুবক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। বললে, 'উনিও হুগলী যাবেন। ওঁকে সঙ্গে নেব ঠাকুরমশায়?'

'নিশ্চয়। উনিও যাবেন—'

বৈরাগী আনন্দে উদ্বেল হয়ে বললে, 'আপনি মহৎ ব্যক্তি ঠাকুরমশায়। হুগলীতে আমার শিষ্যবাড়ি পায়ের ধুলো দিতে হবে। না গেলে দুঃখ পাবে।'

তিনি জানতে চাইলেন, 'বাবাজী, তোমার শিষ্য কী জাতি?'

'আজ্ঞে তন্তুবায়—'

'বাবাজী, 'তোমার মঙ্গল হোক, কিন্তু আমার যাওয়া হল না।'

'কেন?'

'কিছু মনে কোরো না আমি শূদ্রের গৃহে অন্নগ্রহণ করিনে—'

'অন্নগ্রহণ না করেন, ফলাহার করবেন। উত্তম চিড়া, ঘন ক্ষীর, বাথানের দই আর কাঁচাগোল্লা। তোফা ফলাহার হবে।'

বলতে বলতে তার সৃক্কণী বেয়ে নালা গড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ তা দেখে আর হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না—হেসে উঠলেন উচ্চস্বরে। বৈরাগী লজ্জিত হয়ে নস্যের কৌটো খুঁজতে লাগল।

রাঘব বললেন, 'আমরা শূদ্রগৃহে ফলাহারও করিনে বাবাজী। ও-সব তুমি গ্রহণ কোরো। কিন্তু তোমাদের বোধহয় এখনও আহার হয়নি, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'তোমরা আজ আমার অতিথি। চলো।'

বৈরাগী বড় লোভী। চলতে চলতে বললে, 'প্রভু যে কার কোথা আহারের সংস্থান করেন, বোঝা কঠিন। খুবই ক্ষুধার্ত—আজ ঠাকুরমশায়ের অন্নপ্রসাদ পাব, না ফলাহার?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'এ-বেলা অন্নপ্রসাদ, ও-বেলায় ফলাহার কোরো।'

'বেশ, বেশ—'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাঘব, মহারাজ হয়ত ফিরিঙ্গির হাতে বন্দী হয়েছেন, সপ্তগ্রামে অবস্থান করে আর কী হবে? আহারান্তে নৌকো নিয়ে হুগলী যাব, তুমি নৌকোয় পাকের উদ্যোগ করো।'

বাদশাহী পুলের কাছে এসে গিয়েছিল সকলে। রাঘব বললে, 'যে আজ্ঞা—'

সকলে নৌকোয় আরোহণ করল।

।। দশ ।।

সেই দিন অপরাহ্নে ত্রিবেণীতে মুকুন্দদেবের ঘাটের অনতিদূরে একখানি বৃহৎ বজরা বাঁধাছিল। কিছুক্ষণ আগে ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন আকাশ পরিষ্কার। ঠাণ্ডা বাতাসে নদীবক্ষে শিহর উঠছে অল্প অল্প, গৈরিকবসনা গঙ্গার ঘোলা জলের আবর্ত সৃষ্টি করে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নদীতীরের বৃক্ষগুলি হতে ঝড়বিপর্যস্ত পাখ-পাখালির কূজন ভেসে আসছে। সেই কলকূজন ছাপিয়ে বজরার ভেতর থেকে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সঙ্গীতের পরিবর্তে সেতারের মিঠা আওয়াজ ভেসে এসে নদীতীরের আবহাওয়া আরও জমাট করে তুলেছিল। ঝড় শান্ত হবার পর লোকজন গমনাগমন শুরু হয়েছিল নদীতীরে—তারা অবাক হয়ে এই গীত ও বাদ্য শুনছিল। বাইরে থেকে বজরার ভেতরের কাউকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু গীত শুনে বোঝা যাচ্ছিল, গায়িকা কোনো নারী, কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিনী। সেতার যিনি বাজাচ্ছেন তার হাত আরও মিষ্টি—সুরের মায়াজাল রচিত হচ্ছে যেন। স্নিগ্ধ শীতল নদীতীরে সঙ্গীতের মনোরম আসর বসেছে। শ্রোতারা তা উপভোগ করছিল মনেপ্রাণে।

বজরার মধ্যে একটি প্রশস্ত কক্ষে গালিচার ওপর বসে একটি যুবতী সেতার বাজাচ্ছিল আর তার পার্শ্বে বসে এক প্রৌঢ়া কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করছিল

কিছুক্ষণ যাবৎ। সেতারবাদিকা অভ্যাশ বশে মাঝে মাঝে সেতারে সঙ্গত করছিল বটে কিন্তু তার মন ও দৃষ্টি অন্যত্র নিপতিত—সেটা বোঝা যায় তার আচরণে। সে ক্ষণে ক্ষণে তাকাচ্ছিল কক্ষের প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র হস্তিদন্তের খাটের পানে, সেই খাটে এক গৌরবর্ণ যুবক শায়িত। দেখে বোঝা যায় যুবক চেতনাহীন—তার সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন। ক্ষতস্থানগুলি অতি যত্নে বহু বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ, সেগুলি স্থানে স্থানে রক্তাক্ত। যুবক বিশেষ ভাবে আহত।

সে সূর্যকান্ত। যুবতী তার পানে তাকিয়েছিল কাতর নয়নে। একসময়ে বললে, 'সাকিলা, গান থামাও। ভাল লাগছে না—'

নিজে সেতার নামিয়ে রাখল।

সাকিলা গান থামাল। ঈষৎ ক্ষুদ্রস্বরে বললে, 'গাইতে বলেছিলেন তাই গাইছিলুম, থামতে হুকুম দিলেন, বেশ থামলুম। বলো এবার কী করব?'

যুবতী বললে, 'কিছু করতে হবে না চুপ করে বস। হকিমকে খবর দিতে বলেছিলুম, দিয়েছিস?'

'আজমল খাঁ কখন্ চলে গেছে—'

'এখনও আসছে না কেন?'

'সময় হলেই আসবে।'

'কিন্তু কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে মানুষ? জ্ঞান কী ফিরবে না? সাকিলা, আমার প্রাণের ভেতরটা কী যে হচ্ছে—'

'কী হচ্ছে?'

'সে তোকে বোঝাতে পারব না। কিছু ভাল লাগছে না। একবার যদি চোখ মেলত, প্রাণে শান্তি পেতুম—'

'এতে অশান্তির কী আছে। জলে তো পড়ে নেই। এর চেয়ে ভাল পরিচর্যা কী ওর আপন লোকেরাও করত?'

'বড় কষ্ট পাচ্ছে—'

'তা তো পাবেই। আঘাত যে গুরুতর।'

'না-আসে হকিম না-আসে জ্ঞান। কী করি বল্ দিকিন?

'ওই যে জ্ঞান ফিরেছে—'

সূর্যকান্ত অস্ফুট কাতরধ্বনি করে উঠল। যুবতী তাড়াতাড়ি তার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে জিজ্ঞেস—করল, 'খুব কী কষ্ট হচ্ছে?'

সূর্যকান্ত চোখ মেলে চাইল। বিকারগ্রস্ত লাল চোখ। শিয়রে যুবতীর কাতর মুখ দেখে বললে, 'কে? ইন্দিরা? কখন্ এলে?'

যুবতী শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করে তার কপালে হাত রাখল। বললে, 'আমাকে কী তুমি চিনতে পারছো না? দেখনি আগে?'

সূর্যকান্তর অধরে ক্ষীণহাস্যরেখা খেলে গেল। বললে, 'দেখেছি তো। নদীর ঘাটে। তারপর প্রতিক্ষণ দেখছি হৃদয়ে—'

যুবতী শিহরিত হল। বললে, 'বলো দেখি আমি কে?'

সূর্যকান্ত নিশ্চিন্ত স্বরে বললে, 'তুমি' ইন্দিরা—'

'ইন্দিরা কে?' যুবতী আকুল হয়ে উঠল, 'আমি যে গুলরুখ।'

'মিথ্যা কথা। তুমি ইন্দিরা। আর এ হল রাঙামাটি।' সূর্যকান্ত তেমনি বিকারগ্রস্ত ঃ 'ইন্দিরা, তুমি কখন্ এলে? আমি কী ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? জাগিয়ে দাওনি কেন?'

'এসব কী বলছো? রাঙামাটি কোথায় এ যে সপ্তগ্রামে, সরস্বতী গঙ্গার মোহনায় আমাদের বজরা লেগেছে।' যুবতীর স্বরে আকুলতা ঃ 'আমি গুলরুখ, তুমি কী এখনও আমাকে চিনতে পারোনি?'

'চিনেছি।' সূর্যকান্ত পূর্বের মতো নিশ্চিন্ত ঃ 'ইন্দিরা' তুমি বুঝি একটা নতুন মুসলমানী নাম নিয়ে ভোলাতে এসেছো? অত সহজে আমি ভুলব না। ঠিক চিনেছি তুমি ইন্দিরা—'

চাপা ও ব্যথিত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল একটা। গুলরুখ সামলে নিল নিজেকে। বললে, 'বেশি কথা বলো না। তোমার কষ্ট হবে—'

'কষ্ট একটু হচ্ছে বটে। তা হোক। ইন্দিরা, সন্ধ্যাবেলা গোপালের মন্দিরে আরতি দেখতে যাব বলেছিলাম, চলো যাই।'

বিকারের ঘোরে সূর্যকান্ত শয্যা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করল, তা দেখে গুলরুখ বলপূর্বক চেপে ধরল এবং বললে, 'উঠো না, উঠো না, এখনই ক্ষতমুখে রক্তস্রাব দেখা দেবে। সেরে ওঠো, তখন যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব—'

তার বাহুমূলে এলিয়ে পড়ল সূর্যকান্ত। বললে, 'ইন্দিরা, তুমি কী সুন্দর!'

গুলরুখ গোপনে চোখের জল ফেলল। এ প্রশংসা তার নয়—ইন্দিরা নাম্নী অপর কোনো রমণীর। বললে, 'বেশী নড়াচড়া করো না, চুপ করে শুয়ে থাকো—

'তোমার শরীর কি কোমল!' বাহুর শিথানে শুয়ে থেকে সূর্যকান্ত বললে, 'বড় বেদনা, উঠতে পারছিনে। তুমি শরীর সরিয়ে নিলে আমি পড়ে যাব।'

আবার জল এসে পড়ল চোখে। কত কাঙ্খিত স্পর্শ, কিন্তু কী বেদনাসঞ্চারী। এ প্রশংসাও তার প্রাপ্য নয়। গুলরুখ বললে, 'তুমি শুয়ে থাকো, আমি শরীর সরাব না—'

'আমার কী হয়েছিল ইন্দিরা?' সেইভাবে শুয়ে শুয়ে মুখ তুলল সূর্যকান্ত।

'ইন্দিরা কে?' গুলরুখ নিচু হয়ে তার মুখের পানে চাইল।

'তুমি ইন্দিরা নও?' সূর্যকান্তর চোখে আবিল দৃষ্টি।

'আমি যে গুলরুখ প্রিয়তম, তুমি চিনতে পারছো না কেন?'

চক্ষু সজল, ওষ্ঠের ওপর নেমে এল তার মুখ।

'চিনতে পারছি, তুমি নিশ্চয় ইন্দিরা।'

তার ওষ্ঠের কম্পন লক্ষ্য করেছিল সূর্যকান্ত।

'তবে আমি ইন্দিরা। এ মুহূর্তের জন্যে ইন্দিরা—'

তার ওষ্ঠ নেমে এল সূর্যকান্তের ওষ্ঠে: গাঢ়, গভীর আবেগে ওষ্ঠসুধা পান করল গুলরুখ। কিন্তু চোখে তার জল।

'এতক্ষণ তাহলে দুষ্টামি করছিলে কেন?' ওষ্ঠ বিমুক্ত করে সূর্যকান্ত সামান্য নড়ল, বললে, 'ইন্দিরা, আমার সর্বাঙ্গে বড় বেদনা। এত বেদনা কেন?'

গুলরুখ চোখের জল মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললে, 'প্রিয়তম, তুমি যে যুদ্ধে আহত হয়েছো।'

'যুদ্ধ?' সূর্যকান্ত সচকিত: 'কোথায় যুদ্ধ?'

'কেন সপ্তগ্রামের যুদ্ধ?' গুলরুখ বুঝতে পারছিল ওর বিকারের ঘোর কেটে আসছে: 'যুদ্ধে আহত হয়ে তুমি সৈন্যস্তূপে পড়েছিলে। আমি দেখতে পেয়ে তোমাকে তুলে এনেছি—'

'এটা কোন জায়গা?'

'সপ্তগ্রাম।'

'অথচ আমার মনে হচ্ছিল আমি রাঙামাটিতে আছি—'

'তুমি তখন থেকে শুধু রাঙামাটির কথাই ভাবছো।'

'তা হবে—' সূর্যকান্ত ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

গুলরুখ বুঝতে পারছিল আজমল খাঁ ফিরে এসেছে—কক্ষের বাইরে সাকিলার সঙ্গে কথা বলছে। পূর্বদিনের সেই বৃদ্ধ—শাহনওয়াজ খাঁর গলা শোনা গেল দু-একবার। গুলরুখ উঠবে কিনা ভাবছিল, শাহনওয়াজ খাঁ কক্ষের পর্দা অপসারিত করে দ্বারদেশে দেখা দিলেন। বললেন, 'আমার পুত্রবধূকে বাড়িতে রেখে তোমার কাছে আসছিলুম, পথে আজমল খাঁর সঙ্গে দেখা। সে হকিম ইমামুদ্দিন খাঁর সঙ্গে আসছিল। হকিম সায়েব এসেছেন, মা—'

'আপনার পুত্র কেমন আছেন?'

'ভাল। তার কোনো ক্ষতি হয়নি—'

'হকিম সাহেবকে নিয়ে আসুন,' গুলরুখ শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করে বললে, 'আমি এ কক্ষেই থাকব।'

শাহনওয়াজ কক্ষের পর্দা সরিয়ে দিলেন, হকিম ইমানুদ্দিন খাঁ প্রবেশ করলেন। তিনি খ্যাতনামা হকিম, বয়স হয়েছে যথেষ্ট, পোশাকে আভিজাত্য সুপরিস্ফুট। মুখখানা বুদ্ধিদীপ্ত, বোঝা যায় তাঁর পসার ও প্রতিপত্তি খুব।

উচ্চমহলেই তাঁর যাতায়াত। যুদ্ধের ডামাডোলে তিনি ব্যস্ত ছিলেন—সৌকত আলী খাঁ ডাক দিচ্ছিলেন ঘন ঘন। বজরায় আসার সময় ও ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর ছিল না, কিন্তু আজমল খাঁ যে দক্ষিণা কবুল করল তাতে না-আসা বোকামি বলেই বিবেচনা করলেন ; আজমল খাঁর ওপর নির্দেশ ছিল যত টাকা লাগে, সেরা হকিম আনা চাই। সকালে যে হকিম ডেকে আনা হয়েছিল তার ওপর নির্ভর করা যায়নি বলে এঁকেই ডেকে আনতে পেরেছিল গুলরুখ।

ইমানুদ্দিন খাঁ রোগী পরীক্ষা করছিলেন। গুলরুখ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখছেন হকিম সায়েব? আঘাত কী গুরুতর?'

'গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে। তবে যুবা বয়স, সম্ভবতঃ আরোগ্য হবেন। যুবা বয়সে রক্তের তেজ মানুষকে দ্রুত আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়।' পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি ঃ 'এঁকে নতুন দেখছি। ইনি কোথায় আহত হয়েছেন?'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'গতকাল রাত্রির যুদ্ধে—'

'ইনি কী বাদশাহী ফৌজের সেনা?' প্রশ্ন অব্যাহত।

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি সর্বেশ্বরের একজন সেনানায়ক বিপুল বিক্রমে লড়াই করছে। সৌকত আলী খাঁ বলছিলেন, তাঁর জন্যেই প্রকৃতপক্ষে সপ্তগ্রাম রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—'

'সে কী কাফের, হতভাগ্য নিহত হয়েছে। কিংবা বন্দী—'

'ফিরিঙ্গির হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। খোদামালিক নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যে এ অত্যাচার অসহ্য।'

বৃদ্ধ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন।

হকিম বললেন, 'একটা প্রলেপ পাঠিয়ে দেব, সেটা ক্ষতস্থানে লেপন করবেন। দু-রকম ওষুধ থাকবে—প্রতি প্রহরে পর পর খাইয়ে যাবেন। আশা করি তাতে খানিক আবাম পাবে।'

'কিন্তু রোগী বড়ই অস্থির—চাঞ্চল্য বাড়লে রক্তপাত হয়—'

'যাতে চঞ্চল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সব সময় লোক রাখবেন ওর কাছে।'

'তবু চঞ্চল হয়ে পড়েন—'

'একটা জাফরান বর্ণের চূর্ণ পাঠিয়ে দেব—অস্থির হলে সেটা শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেবেন—ঘুমিয়ে পড়বে। আপনাদের ভৃত্যটি কী আমার সঙ্গে যাবে?'

'নিশ্চয়—'

হকিম ও বৃদ্ধ বাইরে চলে গেলেন। আজমল খাঁ যাবে হকিমের সঙ্গে। সে দাওয়াই নিয়ে আসবে। তাই আনুক আজমল খাঁ। যত তাড়াতাড়ি পারে আনুক। আঘাত গুরুতর—সকালের হকিম বলেছিলেন ইনিও বলে গেলেন। কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর হকিম ইমামুদ্দীন খাঁর কৌতূহল—জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি প্রায় সব জেনে গেলেন। আর জানা গেছে সৌকত আলী খাঁ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন তাঁর হিন্দু সেনানায়ককে—যিনি অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে সপ্তগ্রাম রক্ষা করেছেন। সন্ধান পেলে ছুটে আসবেন এবং চিনতে পেলে তার শুশ্রুষার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করে নিয়ে যাবেন নিষ্ঠুরের মতো। এ সেই সেনানায়ক, সন্দেহ নেই। তখন কী নিয়ে থাকবে গুলরুখ? কাকে নিয়ে থাকবে?

ভারাক্রান্ত মনে গুলরুখ শয্যা-কিনারে গিয়ে বসল।

সূর্যকান্ত জেগে ছিল। সে বললে, 'ইন্দিরা, বৈদ্য দাড়ি রাখল কবে? আমাদের বৈদ্য তো বৈষ্ণব, সে তো দাড়ি গোঁফ চুল সব কামিয়ে ফেলেছিল—'

গুলরুখ অন্যমনস্কভাবে বললে, 'বৈদ্য হবে কেন? ইনি সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ হকিম ইমামুদ্দীন খাঁ সাহেব।'

'তুমি কী সপ্তগ্রামের স্বপ্ন দেখছো?'

গুলরুখ বললে, 'স্বপ্ন কেন? এ সত্য সত্যই সপ্তগ্রাম—'

'সপ্তগ্রাম!—এর আগেও কবার তুমি একথা বলেছো। তবে কী আমিই স্বপ্ন দেখছি! আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছে এ সপ্তগ্রাম নয়, রাঙামাটি; তুমি ইন্দিরা আমি সূর্যকান্ত। আশ্চর্য এত ভুল হয় মানুষের! আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

গুলরুখ কপালে হাত রাখল : 'চুপ করে ঘুমোও। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার জ্বর এসেছে—তাই ভুল বকছো—'

'ওঃ।'—অবসাদে ভেঙে পড়ল সূর্যকান্ত, ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

গুলরুখ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তাদের মুখের পানে। তৃপ্তি ও অতৃপ্তির বিচিত্র লীলা-লহর তার দৃষ্টিতে। সেই প্রিয়পুরুষ তার কত সন্নিকটে কিন্তু কী সুদূর! কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, স্পর্শসুখ পাওয়া যাচ্ছে, দৃষ্টির রম্যতা লাভ করা যাচ্ছে, দৈহিকভাবে সবই উপস্থিত : তবু কী—যেন নেই, কোথায় যেন বাধা, কে যেন আড়াল করে আছে! একবার, শুধু একবার যদি গুলরুখ বলে ডাকত—!

নসীব, একে নসীব ছাড়া আর কী বলা যায়? সহ্য করতে না পারলে আরও কষ্ট, আরও দুঃখ, আরও ব্যথা।—

গুলরুখ নিঃশ্বাস চেপে উঠে পড়ল। সূর্যকান্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধ আমীর শাহনওয়াজ খাঁ কী করছেন দেখা দরকার। তিনি কৃপা-বশতঃ আবার দেখা করতে এসেছেন। ফিরিঙ্গির ব্যবহারে তিনি যেরকম বিরক্ত তাতে চুপ করে থাকার পাত্র

তিনি নন। পুত্রবধূকে রেখে এসেছেন গৃহে—নিজে হয়ত চলে যাবেন দিল্লি। সপ্তগ্রামে বাস করতে তাঁর মোটেই ইচ্ছা নেই। সে পাশের কক্ষে প্রবেশ করে দেখল দুগ্ধফেনিভ শয্যার উপর বসে বৃদ্ধ একমনে চিঠি লিখছেন। সে এসে দাঁড়িয়েছে—বৃদ্ধের খেয়াল নেই। গভীর মনোযোগ। গুলরুখ আরও কাছে এসে দাঁড়াল। তার পদশব্দে সচকিত হয়ে বৃদ্ধ মুখ তুলে তাকালেন।

'কখন্ এসেছো মা?'

'এইমাত্র।'

'রোগী কেমন?'

'ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি কাকে পত্র লিখছেন?'

'সৌকত আলী খাঁকে।' বৃদ্ধ জানালেন, 'শুনে এলুম ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ পলায়ন করেছে—বহুলোক নিরাপত্তার অভাবে সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। আমি পুত্র ইমতিয়াজ খাঁর সঙ্গে দিল্লি চলে যেতে চাই, তাই সৌকত আলী খাঁর অনুমতি চেয়ে এই পত্র লিখছি। অনুরোধ করছি, আজ রাত্রে তিনি যেন এই বজরায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তোমার কী খুব অসুবিধা হবে মা?'

গুলরুখ প্রমাদ গণল। একেবারে সৌকত আলী খাঁ!—যিনি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন তাঁর প্রিয় সেনানায়ককে। তিনি এলে কী আর যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত থাকবে? বজরায় কী রেখে যাবে তারপর?—বিচলিত হল গুলরুখ। মনঃক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছা হয় না, আবার সৌকত আলী খাঁর আগমনে অনিচ্ছা। সে একটু দ্বিধা করে বললে, 'আপনার প্রস্তাব উত্তম। কিন্তু তাঁকে আজ রাত্রেই আসতে লেখা কী দরকার। তিনি ব্যস্ত আছেন, এত তাড়া কিসের? খোদাতাল্লার দয়ায় আপনার সাথে যখন সাক্ষাৎ হয়েছে, আরও দিনকতক আমার কাছে থাকুন, তারপর দিল্লি ফেরা যাবে। আমি তো বেশিদিন থাকব না, একসঙ্গে ফিরলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যাবে। আপনাকে অভিভাবক রূপে পাব সেটা উপরিলাভ।'

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাই। দরবারে এখানকার ব্যাপারটা পেষ করব। ঠিক আছে, পরে আমিই দেখা করব সৌকত আলীর সঙ্গে। কিন্তু বেলা যে পড়ে এল, মা?'

'চলুন বেড়িয়ে আসি।'

'এখন বেড়াতে যাওয়া কী উচিত হবে?'

'অল্প দূরে যাব।'

'বেশ চলো—'

মাল্লারা বজরা ছেড়ে দিল—বজরা দক্ষিণ দিকে ভেসে চলল ধীরে ধীরে। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছিল, পাতলা অন্ধকারে নদীকূল ঝাপসা হয়ে উঠছিল।

বজরার ওপরে শাহনওয়াজ খাঁ ও আজমল খাঁ, প্রকৃতির বিলীয়মান শোভার প্রত্যক্ষদর্শী যেন। আজমল খাঁর দৃষ্টি তেমন সূক্ষ্ম নয়, সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল কিন্তু বৃদ্ধ আমীরের পাশে দাঁড়িয়েছিল অনুগত ভৃত্যের মতো, মান্য অতিথির কিছু দরকার পড়লে তৎক্ষণাৎ যাতে এনে দিতে পারে। ঠাণ্ডা বাতাস উঠেছিল—নদীকূলে স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডল ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল, রাত্রির কালো পর্দায় দিগমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গঙ্গাবক্ষ শূন্য—ফিরিঙ্গিদের ভয়ে একখানিও নৌকো সপ্তগ্রাম ত্যাগ করেনি।

আজমল ডাকল, 'হুজুর—'

বৃদ্ধ তার পানে ফিরে তাকালেন।

'চলুন ফিরি। মনে হচ্ছে অনেকদূর এসে পড়েছি—'

বৃদ্ধ মৃদু কৌতুকের স্বরে বললেন, 'তোমার ভয় করছে আজমল?'

'হুজুর', আজমল বললে, 'গায়ে হাতে এখনও ব্যাথা।'

বৃদ্ধ হেসে উঠলেন উচ্চৈস্বরে। বললেন, 'ভয় নেই। বেশিদূর যাব না। এইবার ফিরব।'

'হস্-স্-স্—'

'কী?'

'শুনতে পাচ্ছেন?'

বৃদ্ধ কান পেতে শুনলেন জলে অনেকগুলি দাঁড়ের শব্দ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন একখানি বড় নৌকো তরতর করে এগিয়ে আসছে। আজমল খাঁ বললে, 'দেখুন, কী সর্বনাশ হয়।'

'বজরার মুখ ফেরাতে বলো।' বৃদ্ধ বললেন, 'ভয় নেই আজমল। ওটা ফিরিঙ্গিদের নৌকো নয়। আমরা হুগলীর কাছাকাছি এসেছি বটে কিন্তু এখনও বেশ দূর। সাধারণ একখানা নৌকো মনে হচ্ছে—।

তাঁর অনুমান সত্য। বজরার মুখ ফিরেছিল, দেখা গেল একখানি সাধারণ বড় নৌকো বটে। অন্ধকারে তার আগমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাছাকাছি হল ক্রমশঃ। বৃদ্ধ লক্ষ্য করলেন পঞ্চাশ ষাট জন বলিষ্ঠ পুরুষ নৌকোর দাঁড় টানছে এবং তারা সকলেই অস্ত্রধারী। মাঝির পাশে দাঁড়িয়ে একজন শুভ্রবাস পরিহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁর পাশে বলিষ্ঠ দেহ এক অনুচর। রীতিমতো যুদ্ধ সজ্জা যেন। কারা এরা? কোথায় চলেছে? ওদিকে তো হুগলী—।

'মাঝি, এ কোথাকার নৌকো?' জলে ছপাত করে শব্দ হল—মাঝি কী উত্তর দিল দাঁড়ের শব্দে বোঝা গেল না। তিনি তখন মাঝির পাশে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মহাশয়, আপনি নৌকো নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'হুগলী। আপনারা আসছেন কোথা হতে?'

'আমরা সপ্তগ্রাম থেকে জলপথে ভ্রমণে বেরিয়েছি—এখন আবার সপ্তগ্রামে ফিরে যাচ্ছি—'

'তাই যান। তাড়াতাড়ি ফিরে যান। আমিও সপ্তগ্রাম থেকে আসছি, বন্দরে শুনলাম আজ সন্ধ্যার পরে হাঙ্গামা হতে পারে। ফিরিঙ্গিদের সমস্ত ছিপ নৌকো লুটতে বেরুবে?'

'তাই নাকি?' শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'আমরা তো ফেরার পথে, কিন্তু আপনি কেন জেনে শুনে এসেছেন?'

'বিশেষ প্রয়োজন।'

'ফিরিঙ্গিরা কী আপনাদের ছেড়ে দেবে?'

'সেজন্যে তৈরী হয়েই যাচ্ছি।'

'খুব জরুরী।'

'হ্যাঁ।'

'খোদা হাফেজ—'

নৌকো ছেড়ে দিল—অনুকূল স্রোতে ভেসে চলল দূরে। শাহনওয়াজ খাঁ বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, অদ্ভুত লাগল তাঁর। তাঁদের সাবধান করে দিয়ে নিজেরা চলে গেল বিপদসঙ্কুল যাত্রায়। বাঙালী ব্রাহ্মণের সাহস আছে বিলক্ষণ—কিন্তু এত সাহস কী ভাল? ফিরিঙ্গিদের খপ্পরে আগে কখনও পড়েনি নিশ্চয়, পড়লে এ সাহস থাকত কিনা সন্দেহ! জরুরী প্রয়োজন অনেকেরই থাকে—ফিরিঙ্গি অত্যাচারের কথা জেনে কেউ কী স্বেচ্ছায় সপ্তগ্রাম ছেড়ে এমন দুঃসাহসিক যাত্রা করেছে আজ রাত্রে? যত প্রয়োজনই হোক, আজ রাত্রে তাঁর হুগলীর দিকে যাওয়া উচিত হয়নি। কজন মাত্র অস্ত্রধারী দাঁড়ি, তারা কি ফিরিঙ্গি শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে? বিশেষ করে হুগলী যেন পাদ্রীর খাস এলাকা।

বজরার ওপর দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন তিনি—বজরা চলছিল মন্থর গতিতে। প্রতিকূল স্রোত। সমুদ্রের জলরাশি জোয়ারের সঙ্গে নদীতে প্রবেশ করে তখন ফিরে চলেছে। বজরার গতি মন্থর হয়ে গিয়েছিল আপনা হতে। তাড়াতাড়ি না ফিরলেও চলে, কিন্তু ওই ভয় যেন মনের মধ্যে চেপে বসেছে। আজ রাত্রে ফিরিঙ্গিদের ছিপ নৌকো মারতে বেরুবে। শুধু নৌকোই তাদের লক্ষ্য—বজরা পেলে কী ছেড়ে দেবে? তা কখনও হয়? জলপথে নৌকো কিংবা বজরা যা পাবে তাদের আক্রমণ হতে নিস্তার পাবে না কেউ।

তিনি হাঁকলেন, 'ওরে জোরে চল্—জোরে চল্—'

মাল্লারা যথাসাধ্য বজরার গতি বৃদ্ধি করল। কিন্তু যেতে হল না বেশিদূর। ভোজবাজির মতো অন্ধকার ভেদ করে একখানি বড় ছিপ ভেসে উঠল নদীবক্ষে—নিমেষের মধ্যে চলে এল বজরার পাশে। কোনো প্রকার বাধা দেবার আগেই চার

পাঁচজন ফিরিঙ্গি লাফিয়ে উঠে পড়ল বজরায়, তাদের হাতে উদ্যত বন্দুক। মাল্লারা সতর্ক ছিল না—তাদের বেঁধে ফেলল ফিরিঙ্গিরা। শাহনওয়াজ খাঁ এ ভোজবাজির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না আদৌ, তিনি বজরার ভেতর যেতে গিয়ে ধরা পড়লেন। বজরার ভেতরে গুলরুখ রয়েছে আহত সূর্যকান্তের সাথে—সাবধান করে দেওয়া হল না। আজমল খাঁ হতভম্ব। সকলেই বন্দী। ফিরিঙ্গিদের নির্দেশে বজরা চলল হুগলীর পথে।

কিছুই করবার ছিল না কারো। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে ওরা বজরার ভিতরে প্রবেশ করেনি। মহিলাদের সম্মানহানি ঘটেনি। চলুন হুগলীর ঘাটে, তারপর যা আছে তা হবে। তিনি দ্বিতীয়বার বন্দী হলেন—উপর্যুপরি দুদিন। অথচ এটা নাকি খোদা মালিক নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্ব!— বৃদ্ধ আমীর বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁদের বজরা হু হু করে ভেসে চলেছে।

বজরা হুগলী দুর্গের সুমুখে পৌঁছুলে, তিনি দেখলেন ছিপ থেকে একটা হাউই ছাড়া হল। সেটা আকাশে উঠে তিনটি তারা ফোটাল—নীল, লাল আর সাদা। অর্থাৎ সংকেত জানাল। প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল পরক্ষণে। দুর্গের অভ্যন্তর হতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হাউই উঠল, তাতে ফুটে উঠল ওই তিনটি তারা। পারস্পরিক বার্তা বিনিময়। বজরাসহ ছিপ অগ্রসর হল কূলের দিকে।

কিছু আগে সেই উত্তরদেশীর নৌকোখানি কূলে ভিড়েছিল নিঃশব্দে—হাউই দেখে তারা সচকিত হল। বুঝতে পারল ফিরিঙ্গিদের ছিপ আসছে। কিন্তু ছিপের সঙ্গে বজরা দেখে বিস্মিত হলেন সেই ব্রাহ্মণ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, 'রাঘব, ভাল করে দ্যাখ্ তো ওটা সেই বজরা কিনা?'

পাশ থেকে রাঘব বললে, 'তাই মনে হচ্ছে ঠাকুরমশায়।'

'ফিরে যাচ্ছিল সপ্তগ্রামে—হুগলীতে এল কেন?'

রাঘব বললে, 'নিশ্চয় ফিরিঙ্গি হার্মাদের হাতে বন্দী হয়েছে।'

'পথে তো আমরা ফিরিঙ্গির ছিপ বা কোশা দেখতে পাইনি—'

রাঘব বললে, 'দেখব কী করে? আমরা তো আগে এসে পড়েছি। সপ্তগ্রাম থেকে ফিরিঙ্গিদের ছিপটা ছেড়েছে, পথে ওদের দেখা হয়ে গেছে, কিংবা অন্ধকারে কোথাও লুকিয়েছিল, আমাদের নজরে পড়েনি—'

'তা সম্ভব।' গঙ্গাকিশোর গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, 'রাঘব?'

'আজ্ঞা করুন ঠাকুরমশায়।'

'চুপচাপ দেখব?' তাঁর কণ্ঠস্বর থমথম করে উঠল।

'আদেশ করুন—'রাঘব সোজা হয়ে দাঁড়াল।'

'নিরীহ ভদ্রলোক বেড়াতে বেরিয়েছিল, তাকে বন্দী করেছে। আক্রমণ করো—'

তৎক্ষণাৎ ষাটজন বলিষ্ঠ ধীবর একসঙ্গে দাঁড় ফেলল—তীরের মতো ভেসে গেল নৌকো। যুদ্ধপটু শিক্ষিত ধীবরের দল, ক্ষণমাত্র সময় অপব্যয় না করে কাছে গিয়ে পৌঁছুতেই একলাফে উঠে পড়ল বজরায়। ফিরিঙ্গিরা অপ্রস্তুত—তারা চিন্তাই করতে পারেনি এভাবে আক্রান্ত হবে। সামান্য প্রতিরোধের পর তারা বন্দী হল রাঘবের দলবলের হাতে। বজরা কূলের কাছাকাছি এসে গেছে দেখে রাঘব চিৎকার করে বললে, 'হুগলীর ঘাটে যেন না লাগে, বজরার মুখ ফিরিয়ে দে, সপ্তগ্রামে চল্—'

তার কণ্ঠস্বর শুনে বজরার ভেতরে সূর্যকান্ত উদ্বেলিত হল সে যথাসাধ্য জোরে ডাকল, 'রাঘব, আমি এখানে, রাঘব—'

স্পষ্ট নয়, ক্ষীণভাবে এ ডাক শুনতে পেল রাঘব। তার সারা অন্তর শিহরিত হল। সে ব্যাকুলস্বরে বললে. 'মহারাজ, যাই—'

কিন্তু বাধা পড়ল। ঘুরে গেল ভাগ্যের চাকা।

অন্ধকারে দুর্গতীরবর্তী কয়েকটি প্রহরী ছিপ নৌকো ব্যাপারটি লক্ষ্য করছিল গোড়া থেকে। তারা দুর্গের ভেতর সংকেত পাঠিয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল দুর্গের উপর বিশাল অগ্নিকুণ্ঠ জ্বলে উঠেছে পরক্ষণে তীব্র আলোকে নদীবক্ষ উদ্ভাসিত, ভীষণ শব্দে দু-তিনটি তোপ গর্জন করে উঠল। আলো নিবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বজরা ও নৌকো নদীগর্ভে ডুবতে লাগল। রাঘব সম্পূর্ণ করতে পারল না তার বাকি কথা, যেতে পারল না মাহরাজের কাছে। বিপর্যস্ত সব। ভরাডুবির অবস্থা।

তখন চারিদিক হতে পাঁচ সাতখানা ছিপ এসে আরোহী ও নাবিকদের বন্দী করে ফেলল।

।। এগারো ।।

অনেকক্ষণ ইন্দিরার অনুসন্ধান করা হয়নি। তাকে হার্মাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা বহুদূরে চলে এসেছি। সে কেমন আছে কোথায় আছে—জানা দরকার হয়ে পড়েছে।

রাঙামাটির ঘাট হতে তাকে জোর করে হার্মাদেরা তুলেছিল কোশায়—সে তখন অজ্ঞান। কোশা কিছুদূর চলে আসার পর তার জ্ঞান হয়। চোখ মেলবার আগেই বুঝতে পারে কে যেন জলের ঝাপটা দিচ্ছে—মন ভরে ওঠে প্রসন্নতায়। ভাবে, কোনো প্রিয়-পরিবেশেই রয়েছে বুঝি কিন্তু চোখ মেলেই তার চক্ষুস্থির। বিজাতীয় কয়েকটি মুখ—ঝুঁকে রয়েছে তার মুখের ওপর। জলের ঝাপটা দিচ্ছে তাদেরই একজন। চোখ বন্ধ করে বলল সভয়ে কোথায় রয়েছে সে? কারা ওরা? ওদের মাঝে সে এল কী করে?—কোশা দুলছিল, আর সেই দোলায় ধীরে ধীরে ফিরে এল তার পূর্বস্মৃতি। চকিতে মনে পড়ল এটা তার গৃহ-পরিবেশ

নয়, ফিরিঙ্গিদের কোশা। মুখের ওপর যারা ঝুঁকে রয়েছে তারা প্রিয়পরিজন নয়, লালসাদীপ্ত ভোগী জলদস্যুর দল। গঙ্গার ঘাটে সে স্নান করতে এসেছিল দাসীর সঙ্গে—আগের দিন গেছে শিব-চতুর্দশীর উপবাস। এখন খিদে পেয়েছে খুব, শরীর নির্জীব, মনে পড়ছিল, শিবের মতো বর প্রার্থনা করেছিল মনে মনে, উমার মতো সে-প্রার্থনায় ছিল না এতটুকু ফাঁকি। সর্ব দেহমনে প্রগাঢ় শুচিতা, নিয়ম-নিষ্ঠায় ঘটেনি কোন ত্রুটি। তবে? তপস্বিনীর এই কী পুরস্কার? মন বিষাক্ত হয়ে উঠল। ভাবল ঈশ্বর নামক সর্বশক্তিমান দেবতাটি নিতান্ত বধির—তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেনি এ আকুল প্রার্থনা। পরক্ষণে ছি ছি করে উঠল, শিহরিত হল। আজন্ম ঈশ্বরে বিশ্বাসী সে কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারানো তার পাপ। হয়ত এ তাঁর পরীক্ষা।

এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল মাথার ভেতরটা—সঠিক চিন্তার পথ পাচ্ছিল না ইন্দিরা। একান্তভাবে প্রার্থনা করছিল, হরি-মধুসূদন, এ বিপদ হতে আমাকে উদ্ধার করো। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

কেউ নেই?—মনে পড়ল বাবার কথা। তিনি এতক্ষণে নিশ্চয় শুনেছেন এ সংবাদ, শোকে ভেঙে পড়েছেন হয়ত। তারপর সমাজপতির দল হয়ত তাঁকে বিব্রত করছে আরো—সমাজরক্ষার রীতি ও নীতি নিয়ে কষাঘাত হানছে। হয়ত 'একঘরে' করার সালিশী-পরামর্শ দান করছে। কন্যার নামে কলঙ্কের অপপ্রচার শুনছেন তিনি আর বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে আছেন এর-ওর মুখের পানে—যেমনভাবে তাকিয়েছিলেন ভবতোষ ভটচায তাঁর কন্যার পলায়নকালে। সে ছিল ইচ্ছাকৃত পলায়ন—ভবতোষ ভটচায সন্ধান পেয়ে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন কন্যাকে। তখন সমাজপতির দল ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সমাজরক্ষায়—'একঘরে' করা হয়েছিল তাঁকে। সে দলে তাঁর বাবাও ছিলেন, সমাজের পক্ষে বলতে হয়েছিল দু-চার কথা, তা ভবতোষ-জ্যাঠার অনুকূলে যায়নি। সম্পর্কে জ্ঞাতি তিনি—এ সুযোগ কী ছাড়বেন? পাল্টা প্রতিহিংসায় তার নিরীহ পিতাকে ছোবলের পর ছোবল দেবেন নিশ্চয়। অথচ সে স্বেচ্ছায় আসেনি—তাকে জোর করে তুলে আনা হয়েছে। এখন সে কোশায়, ফিরিঙ্গিরা কোথায় নিয়ে চলেছে তা সে জানে না।

ঝিমঝিম করে উঠল মাথার ভেতরটা—বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। ইন্দিরা কষ্টে ঢোক গিলল। শুকনো কণ্ঠনালী—থুথু আসছে না। আপাততঃ উদ্ধারের চিন্তা—কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়? এই পশুগুলোর ভোগের পাত্রী হয়ে বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়—সে স্বেচ্ছায় দেহদান করবে না কিছুতেই। এখন জলের ঝাপটা দিচ্ছে, উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। যেন কত দরদী আত্মীয়। তারপর ছিঁড়ে খাবে তার শরীর—সমস্ত ইহকাল ও পরকাল ডুবে যাবে অনন্ত

নরকে। ঈশ্বরের এ পরীক্ষায় পার হতে না পারলে সে মরবে—মৃত্যুই হবে তার একমাত্র মুক্তির উপায়। গঙ্গায় অনেক জল, টুপ করে ঝাঁপ দিলে তার বক্ষে অগাধ শান্তি। কোশা ভেসে চলেছে এই গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে, চারদিকে ফুটে রয়েছে আলো! প্রকাশ্যে দিনের বেলা গঙ্গার ঘাট হতে তুলে নিয়ে এল ফিরিঙ্গিরা—কেউ এতটুকু বাধা দিল না, রক্ষার জন্য এগিয়ে এল না কেউ। স্রোতে ভাসা কুটোর মতো সে ভেসে যাচ্ছে—অবলম্বন নেই, আশ্রয় নেই, সহায় নেই। কেউ নেই।

কেউ না?—অস্পষ্ট মনে পড়ছে রাজপুত্রের মতো সুউন্নত সৌম্যাকান্তি সুদর্শন এক যুবক। ঘাটের পাশে নৌকোরোহী। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল সেই প্রার্থিত পুরুষ—ঈশ্বর তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন বুঝি। তরুণ শিবই যেন। একবার মাত্র চোখে চোখ পড়েছিল, লজ্জায় ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল দৃষ্টি, কিন্তু দুলে উঠেছিল বিশ্বভুবন। তার কুমারী-বিশ্বে সে-ই যেন প্রথম পুরুষ—এমন বিস্ময়-চকিত শিহরণ এর আগে আর কখনও ঘটেনি। অঙ্গে-অঙ্গে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্য। উপবাস সার্থক মনে হয়েছিল। অন্তরে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল—এখনও সেই আলো জ্বলছে অতি নিভৃতে। ....তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেউ তাঁকে বাধ্য করেনি, তবু তিনি এগিয়ে এসেছিলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, যতক্ষণ পেরেছেন বাধা দিয়েছেন বীরের মতো। আচমকা বন্দুকের গুলিতে বিভ্রান্ত হয়েছিল হার্মাদেরা, বিচলিত হয়েছিল তারা—ছোটোখাটো লড়াই বেঁধে গিয়েছিল একটা। কিন্তু তাঁরা দুজন আর এরা সংখ্যায় অনেক—কতক্ষণ চলতে পারে এ অসম লড়াই? সে দেখতে পায়নি শেষ পরিণতি কী ঘটেছে। তবে এদের ব্যস্ততা ও দ্রুত কোশা চালনা দেখে অনুমান হয়, বীরের প্রচণ্ড বাধায় ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে। সত্যি তিনি বীরপুরুষ! তাঁর মতো পুরুষের পায়ে মাথা নত হয়ে আসে আপনা থেকে!—তিনি কেমন আছেন? জলের ঝাপটা পড়ল—চিন্তা ছিন্ন ভিন্ন। রুক্ষ্মচোখে তাকাল ইন্দিরা। গঙ্গাজল বটে কিন্তু কী অপবিত্র!

লালসাদীপ্ত চোখ, ভোগী নায়কের মতো এক সেনানায়ক সামনে দাঁড়িয়ে। বর্বরের মতো চাহনি, শয়তানের মতো ভঙ্গি। কদর্য দাঁত বার করে হাসল।

পাশের সঙ্গীর উদ্দেশ্যে ফিসফিসিয়ে বললে, 'চোখ মেলেছে। জ্ঞান হয়েছে। চেহারাখানা দেখেছো?'

সঙ্গী উত্তর দিলে, 'সুন্দরী বটে!'

'আমার মনে হয় সবচেয়ে সেরা শিকার।' প্রথমজন বললে, 'এ মেয়ের জন্যে গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়তে হলে তাও লরতুম।'

'কিন্তু গুলি আর তীর ছুঁড়ছিল কারা? আমাদের দলের লোক মারা গেছে কয়েকজন—'

'তুমি সেই আক্ষেপ করছো নাকি?' প্রথমজনের স্বর বেশ হালকা : 'বীরের মতো মরেছে ওরা। তার বদলে যা পেয়েছি—অমূল্য রত্ন। এমন মেয়ের জন্য তাবৎ রোমের লোক নস্যাৎ হলেও আমার দুঃখ নেই।'

দ্বিতীয়জন বরাবরই ঈষৎ গম্ভীর। সে বললে, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, পাকিও। তোমার মাথা ঘুরে গেছে মনে হচ্ছে।'

'এবং তোমার যদি না ঘুরে থাকে', পাকিও তেমনি উদ্বেল : 'বুঝতে হবে নারী-রক্তের জহুরী তুমি নও। কতদূর এলুম বল তো?'

'এখনও দেরী আছে।'

'ওদের আরও জোরে চালাতে বলো—'

'যথেষ্ট জোরে চালাচ্ছে। তোমার জন্যে কী ওরা জান দেবে?'

'বুঝতে পারছো না কেন? তাড়াতাড়ি হুগলী পৌছতে না পারলে—' তাকাল ইন্দিরার পানে, শব্দ করে শ্বাস টেনে নিল : 'আমার জিম্মায় রাখতে পারবে কিছুক্ষণ। নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি-মারামারি করতে চাইনে। ওকে দেখলে কারো মাথা কী ঠিক থাকবে? কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। শেষে একটা লুটের মাল নিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে প্রাণ হারাই আর কি!'

'কী করবে ওকে নিয়ে?'

'মেয়েমানুষ নিয়ে লোকে কী করে? উজবুকের মতো কথা বোলো না—'

'বুঝলাম। তারপর?'

'যতদিন পারি কাছে রাখব। তারপর গতিক ভালো না বুঝলে ছেড়ে দেব বাজারে—নিজে চরে খাক। কিংবা তোমার যা মমতা দেখছি, পাঠিয়ে দিতে পারি তোমার কাছে। ভাল জিনিস একা ভোগ করতে নেই—'

'পাকিও, আগের মেয়েটার কী দশা হয়েছিল মনে আছে?'

'আমরা তার অযত্ন করিনি—'

'ধরে রাখতে পারলে কী?'

'তাতে কী লাভ? আমরাই তো ছেড়ে দিলাম। মেয়েরা পাগল হয়ে গেলে তার চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।'

'এ মেয়েটির চোখে সেই দৃষ্টি। জ্বলন্ত দৃষ্টি—'

'প্রথম প্রথম সব মেয়ের চোখে ওই দৃষ্টি থাকে—খানিকটা আদর-ভালোবাসা পাবার পর আবার ঠিক হয়ে যায়। মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর। এই প্রথম তো মেয়েমানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছি না! ওসব ভেবো না, সোয়ারেজ। কী করে এ মেয়েটাকে চাঙ্গা করা যায় সেই কথা বলো—'

সোয়ারেজ বললে, 'তোমার অভিজ্ঞতা অনেক। আমি নতুন এসেছি। এসব ক্ষেত্রে কী করতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো।'

'রাইট।' পাকিও বললে. 'দাঁড়াও কিছু খাবার নিয়ে আসি। খিদে পেয়েছে মনে হয়—'

সে খাবার আনতে চলে গেল।

মিথ্যে নয়—ইন্দিরার খিদে পেয়েছে সত্যি। কিন্তু ওই বর্বরদের হাত থেকে খেতে হবে নাকি? চোখ বুজে ইন্দিরা ওদের কথাবার্তা শুনছিল, উত্তেজিত হয়ে উঠল। যার হাতের গঙ্গাজলের ঝাপটাই মনে হয়েছিল অপবিত্র তার কাছ থেকে কোনো খাদ্যবস্তুই গ্রহণ করা যায় না—মরে গেলেও না। সে কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা, তার রুচি ও সংস্কার ভীষণভাবে নাড়া খেয়ে উঠেছে।

কিন্তু উত্তেজিত হলে চলবে না। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে এখনই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সোয়ারেজ নামে লোকটা এদেশে এসেছে নতুন—পাকিও-র মতো নির্দয় হতে পারেনি একেবারে। তার কথাবার্তা হতে পরিত্রাণের একটা আভাস পাওয়া গেছে। পন্থাটি সুকঠিন। কিন্তু তাছাড়া আপাততঃ অন্য উপায় নেই। এতগুলো লোকের সামনে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। তার চেয়ে নির্লজ্জের মতো পাগলের ভূমিকা নিতে পারলে হয়ত সাময়িকভাবে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে। পাগল মেয়েদের প্রতি এদের বিরাগ। পাগল মেয়ে কে-ই বা পছন্দ করে? সংকল্প স্থির করে ফেলল ইন্দিরা। অন্য পথ নেই, পাগলই হবে সে। আস্তে আস্তে চুলগুলো টেনে আনল মুখের ওপর—ছড়িয়ে দিল চারদিকে। হঠাৎ হেসে উঠল হি হি করে প্রবল স্বরে।

পাকিও দৌড়ে এল তার হাসির শব্দে।

'কী হয়েছে?'

'হি হি হি হি—'

'আরে, হাসছ কেন? কী হয়েছে?'

'হা হা হা হা—'

'কী মুশকিল! এ যে কেবল হাসে।'

'হি হি হি—হা হা হা—'

চুল এলো করে দিয়েছে ইন্দিরা—উঠে দাঁড়িয়েছে। পাগলের মতো হাত নাড়ছে আর অনর্গল হাসছে। পাকিও আর সোয়ারেজের সামনে এসে দাঁড়াল—ঘুরে ঘুরে তাদের মুখ দেকল। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি, এতটুকু, স্বাভাবিকতার লক্ষণ নেই। আঁচল লুটিয়ে পড়ছে, অগোছালো পোশাক। একবার করে কাছে আসছে আবার দূরে চলে যাচ্ছে, এলোমেলো পদক্ষেপ।

পাকিও তাকাল সোয়ারেজের পানে। সোয়ারেজ বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ পাগলের সংখ্যা আর একটি বাড়ল।

ইন্দিরা ততক্ষণে কান্না শুরু করে দিয়েছে। অঝোর ধারে কাঁদছে। অবিশ্রাম কান্না।

পাকিও বললে, 'আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে তো। এই হাসে এই কাঁদে—আরে, কাঁদছো কেন? খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে?'

তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল ইন্দিরা—প্রচণ্ড শক্তিতে কামড় বসিয়ে দিল তার হাতে। আর্তনাদ করে উঠল পাকিও।

সোয়ারেজ বললে, 'পাগল। ওর কাছে যেও না পাকিও। মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে।'

ইন্দিরা প্রবলভাবে হাসছিল। হাসতে হাসতে ঝিম হয়ে গেল—নড়ে উঠছে মাথার ভেতরে উপবাসী তন্ত্রীগুলো। মোচড় দিল পেট, বুক, মাথা। শিথিল হয়ে গেল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঝুপ করে পড়ে গেল ইন্দিরা—জ্ঞান হারাল। শুধু দেখে নিয়েছিল হুগলীর ঘাট এসে গেছে, আর কিছু মনে নেই তার।

কদিন কেটে গেছে।

হুগলী দুর্গের পাশে গোময়লিপ্ত একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রায় বিগতযৌবনা এক বৈষ্ণবীর বাস। কুটীরটি যথাসম্ভব ঝকঝকে ও তকতকে—সর্বত্র পরিচ্ছন্নতার ভাব পরিলক্ষিত। তাতে কুটীর বাসিনীর রুচি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবী যৌবনে সুন্দরী ছিল—সুরুচি ও সৌন্দর্য তার স্বভাবজাত। যার ফলে কুটীর ও কুটীরবাসিনী একদা অনেকের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন তার সে-যৌবন নেই, রূপ মরে এসেছে অনেকখানি, শরীরের বাঁধন ঈষৎ ঢিলে। শরীরের পরতে পরতে যেটুকু রূপ-যৌবন আজও অবশিষ্ট তার প্রতি তা না-আছে যত্ন না-আছে অবহেলা, উদাসীন অনাগ্রহের হেতু সেখানে একটা আলগা শ্রীময়তা, যা দেখে চোখ ঝলসায় না কিন্তু মন বলে ওঠে, বাঃ, সুন্দর!

লোকে বলে বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণের কন্যা, ফিরিঙ্গিরা ধরে এনেছিল জোর করে। হুগলীতে তার বাস বহুদিনের। কথাটা মিথ্যে নয়। বহুদিন হুগলীতে বাস করছে সে। একজন ফিরিঙ্গি সেনানায়ক তার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয় এবং তাকে নিজের কাছে রাখে। সেই ফিরিঙ্গি স্বদেশে ফিরে গেল একদিন, সে বেরিয়ে এল দুর্গের বাইরে। বাঁধল এই কুটীর। তখন স্থানীয় বাসিন্দাদের রসালো আলোচনার খোরাক হয়েছিল সে, কিন্তু সেটা বেশি উচ্চরোল হতে পারেনি, বেশি বিব্রত করেনি। কারণ তার দাপট। সে জানত দাপটের সঙ্গে বাস করতে না পারলে একা মেয়েমানুষের পক্ষে বেশিদিন কোনোমতেই টিকে থাকা যাবে না—নানান ছিদ্রপথে নানা অশান্তির আগমন ঘটবে। তাই সেই দুর্গের বাইরে এসেও যোগ

রেখেছিল ফিরিঙ্গি-নায়কদের সাথে, যতদূর সম্ভব আত্মসম্মান বাঁচিয়ে মিষ্টি ব্যবহারে। তার সপ্রতিভ কথাবার্তা ও অকুণ্ঠ আচরণে ফিরিঙ্গিমহল খুশি ছিল এবং স্বদেশ-প্রত্যাগত সেই সেনানায়কের কথা ভেবে খানিক সমীহ্ প্রকাশ করত। ফলতঃ, দুর্গের বাইরে কুটীর নির্মাণ করায় যে উৎপাত দেখা দিয়েছিল তা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ফিরিঙ্গিদের হস্তক্ষেপে—তারাই দুহাতে আগলে রাখল বৈষ্ণবীকে। সুচতুর বৈষ্ণবী নিজেকে আগলে রাখল বুদ্ধি ও কৌশলে। তার মানে, কোথা দিয়ে কোনো উৎপাত দেখা দিল না। দিন কাটতে লাগল স্বচ্ছন্দে।

এখন যৌবন গতপ্রায় হলেও ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে তার সেই যোগ আজও অক্ষুণ্ণ। একথা জানে সবাই। তাই অরক্ষণীয়া রমণীকে বিব্রত করার ইচ্ছা থাকলেও, হুগলীর হিন্দু-সমাজের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ঘাঁটাতে সাহস করেনি। লোকে বলে, মনোরমা-বৈষ্ণবী কেল্লার বাইরে ফিরিঙ্গিদের মেয়ে-ফৌজদার—তার কথায় ওঠে বসে অনেক বাঘা বাঘা ফিরিঙ্গি। ঘাটাতে যেও না, প্রাণে মারা পড়বে।

একাই বাস করত মনোরমা বৈষ্ণবী—ইদানীং তার এক সঙ্গিনী জুটেছে। তাকে নিয়ে সে বেশ চিন্তিত। সর্বদা দুর্ভাবনায় আছে। সঙ্গীনী মেয়েটি অসাধারণ রূপসী কিন্তু বিকৃতমস্তিস্কা। তার আচার আচরণ ও কথাবার্তায় কোনো সামঞ্জস্য নেই, যেন একটা বুদ্ধিহীনা অবোধ বালিকা। আগলে থাকতে হয় সব সময়, কখন কী করে বসে। নিজের স্বেচ্ছায় ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছে। নিঃসঙ্গ জীবনে মমতার বন্ধনে। মেয়েটিকে দেখে তার মমতার সিন্ধু উথলে উঠেছিল। চোখে চোখে রেখেছিল প্রথমে, ইদানিং সামান্য স্বাধীনতা দিয়েছে। চলে ফিরে না বেড়ালে মেয়েটি হয়ত আরও জবুথুবু হয়ে যাবে। কাদের বাড়ির মেয়ে কে জানে। মধুসূদন তার সব কেড়ে নিয়েছেন। স্মৃতি চলে গেলে মানুষের আর-কী থাকে?

নিঃশ্বাস ফেলল বৈষ্ণবী। উঠোনে তুলসীর মঞ্চের সামনে জপে বসেছে সে, সকাল। তার চারদিকে তিন চারটে বিড়াল, এমন চুপচাপ যে দেখলে মনে হয় তারাও জপে বসেছে বুঝি! বৈষ্ণবী যতক্ষণ না উঠবে ওরাও বসে থাকে এমনি। আজ নয়—প্রতিদিন। জপের শেষে বৈষ্ণবী উঠে দাঁড়ালেই তার পায়ে পায়ে ঘুরবে আর ম্যাও ম্যাও করবে, অর্থাৎ খেতে দাও। বৈষ্ণবী খেতে দিলেই তারা চুপ। বিড়াল-তপস্বী!—এখন বৈষ্ণবী জপে বসেছে, তারাও চুপচাপ বসে আছে।

বৈষ্ণবীর হাতে মালা ঘুরছিল আর চোখের তারা ঘুরছিল দরজার প্রান্তে। বারে বারে তাকাচ্ছিল কুটীরদ্বারে। কারো প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করছিল সে। কটি উদ্বিগ্ন মুহূর্ত কাটার পর চাঞ্চল্য থামল, দেখতে পেল সেই সুন্দরী যুবতী স্নান

সেরে আর্দ্র বস্ত্রে গৃহে প্রবেশ করছে, সর্বাঙ্গ সিক্ত বসন, —রূপ যেন আরও সুপ্রকট। শরীরের রেখাগুলি স্পষ্ট কিন্তু শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে আড়াল করা। মেঘরাশির মতো ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো, কাঁখে মাটির কলসী। যুবতী কলসী রেখে চুলে গামছার বেড় দিয়ে নিড়োতে লাগল। বৈষ্ণবী উঠে এল কাছে, বললে, 'এত দেরী হল কেন মা? তোর জন্যে আমার মনে একদণ্ড শান্তি নেই। এতটা পথ এলি, মাথার কাপড়টাও তুলে দিসনি? পথে কেউ জ্বালায়নি তো?'

'জ্বালাবে কেন?' চুলে গামছার ঝাপটা দিতে দিতে যুবতী বললে, 'মাথার কাপড় না দিলে লোকে জ্বালায় নাকি? তোমাকে কেউ জ্বালায়?'

'ওরে হতভাগি,' বৈষ্ণবী তার অতুল রূপরাশির পানে বারেক দৃষ্টি পাত করে বললে, 'তোর মতো বয়স আর রূপ থাকলে লোকের অত্যাচারে এতদিন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতুম। তোকে কী করে বোঝাব রূপ যৌবন মেয়েমানুষের কত বড় শত্রু। ভালই হয়েছে যে তুই পাগল হয়েছিস, নইলে ওই রূপের ডালি নিয়ে হার্মাদদের এ শহরে তোর অশেষ দুর্গতি হত। কোনোমতেই রক্ষা পেতিস না—'

তার কথা শুনে কলহাস্যে হিহি করে হেসে উঠল উন্মাদিনী। অনেকক্ষণ হাসল। তারপর বললে, 'কেন মা? আমি এ রূপ কোথা থেকে পেলাম? কে আমাকে পাগল করল?'

'অমন করে? হাসবিনে। তোর হাসি শুনলে আমারই বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে— লোকের দোষ দেব কি।' বৈরাগী বললে, 'যিনি তোমাকে পাগল করেছেন তিনিই দয়া করে ওই রূপরাশি দিয়েছেন। দুই-ই তাঁর দয়া। তাঁর দয়া সব সময় বোঝা ভার! আমি বোঝাতে পারব না আর তোর বুঝেও কাজ নেই। যা, কাপড় ছেড়ে ফুল তুলে আন, আমার জপ এখনও শেষ হয়নি—'

'ফুল দিয়ে কি করবে মা?'

'তোর সব কথার উত্তর দিতে পারিনে বাপু।' বৈষ্ণবী ঈষৎ বিরক্ত ঃ 'ফুল দিয়ে মানুষ কী করে?—শ্রীহরির চরণে দেব। পূজো করব। যা চট করে তুলে নিয়ে আয়। আমাদের বাগানে না পেলে গঙ্গার ধারে চলে যাবি, অন্য কারো বাগান থেকে তুলে আনবি। দেরি করবিনে যেন, যাবি আর আসবি—'

'মাথায় কাপড় দেব?'

'ইচ্ছা হয় দিবি, না হলে যেমন আছিস তেমননি থাকবি—'

'আচ্ছা মা।'

যুবতী চুলের সংস্কার শেষ করেছিল, সে ঘরের ভেতর ঢুকল এবং ভেজা কাপড় ত্যাগ করে একখানি গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করল। ঘরের দেয়ালে ফুলের সাজি টাঙানো ছিল, সেটা তুলে নিল হাতে। কিশোরীর মত চঞ্চল পদক্ষেপে উঠোন পেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

বৈষ্ণবী বললে, 'সাবধানে যাস মা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তোকে কোনো কাজে পাঠাতে আমার বুক ঢিব ঢিব করে। কখন কী ঘটে কে জানে?—'

তুলসীমঞ্চের সামনে গিয়ে বসল আবার। তার জপ এখনও শেষ হয়নি। বিড়ালগুলো ছত্র ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, তারাও দূরত্ব বজায় রেখে ঘিরে বসল যথারীতি।

আধঘণ্টাও কাটেনি।

দূর থেকে শোনা গেল পাগলিনীর মা-মা চীৎকার—ছুটে আসছে চীৎকার করতে করতে। বৈষ্ণবী চমকে উঠে দাঁড়াল। এ যা শহর—যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। কী ঘটল? অমন করে ছুটে আসছে কেন চেঁচাচে চেঁচাতে? হার্মাদেরা তাড়া করেছে? তেমন তো হবার কথা নয়! বেশ কিছুদিন পাগল-মেয়ে আছে এখানে, হার্মাদদের সঙ্গে মোটামুটি বোঝাপড়া হয়েছে, তারা জানে এ মেয়ে তার পালিতা কন্যা। একথাই বৈষ্ণবী বলেছে ওদের। ওরা কেন এখানকার সবাই তা জানে, সেজন্যই এখানে-ওখানে পাঠাতে সাহস পায় বৈষ্ণবী। একটু-আধটু না বেরোলে মেয়েটা সুস্থ হবে কী করে? কদিন ধরেই টুকটাক কাজে বেরোয় মেয়েটা—বৈষ্ণবী ইচ্ছা করেই তাকে পাঠায়। কোনোদিন কিছু ঘটেনি, আজ আবার কী ঘটল?

উঠোনের মাঝখানে উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৈষ্ণবী—পাগলিনী ছুটে এসে তার কণ্ঠলগ্না হল। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর স্ত্রী-পুরুষে ভরে গেল উঠোন। তারা মনোরমা বৈষ্ণবীকে ভয় করত, কিন্তু পাগল বলে এ মেয়েটিকে স্নেহের চোখে দেখত। পথ দিয়ে ছুটে আসতে দেখে তারাও ছুটে এসেছে কৌতুহলী হয়ে। ব্যাপার কী জানতে তারাও উৎসুক। পাগলিনী বৈষ্ণবীর বুকে লুকিয়ে থরথরিয়ে কাঁপছিল, যেন অভাবিত কিছু দর্শন করে এসেছে সে কিন্তু একটি কথাও বলছিল না। সমবেত স্ত্রী-পুরুষের অজস্র প্রশ্নবানেও সে মুখ তুলল না।

বৈষ্ণবী অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। সে বললে, 'কী হয়েছে মা?' মুখ তোল্—'

পাগলিনী বললে, 'ঘরে চলো।'

বৈষ্ণবী বুঝতে পারল এখানে দশের সামনে কথা বলতে তার আপত্তি। এমন আচরণ কখনও করে না পাগলিনী। কী ঘটেছে ফুল তুলতে গিয়ে?—হার্মাদেরা কেউ নেই পেছনে, তেমন কিছু ঘটালে কী এভাবে ছুটে আসতে পারত? ছেড়ে দিত হার্মাদেরা? জ্বালালে তো! বললে, 'বেশ চল্।—'

ঘরে ঢুকে বললে, 'বল্ কী হয়েছে? তুই কাঁপছিস কেন?'

কাঁপছিল সত্যি। কী একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে তার শরীরে। উত্তেজনা আর আবেগ স্থির থাকতে দিচ্ছিল না, কাঁপছিল সেই কারণে। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললে, 'মা, সে এসেছে।'

থামল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল আবেগে। বললে, 'আমি দেখেছি।'

'কে এসেছে?' বৈষ্ণবী হতবাক : 'কার কথা বলছিস?'

পাগলিনীর নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন, বুক ওঠা-নামা করছিল উত্তেজনায় : 'সেই যে, সে।'

চোখ ঘোরাল, তর্জনী তুলে দূরের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। বললে না, 'বুঝলে না? তুমি কিছু বোঝো না মা—'

'সে কে?' বৈষ্ণবী বিস্মিত : 'তোর কে হয়?'

'তা জানি না।' পাগলিনীর মুখে লজ্জার সঙ্গে আনন্দের রক্তাভা : 'স্বপ্নে আমার দেবতার ওই মুখ দেখতুম। উনি আমার দেবতা—'

'বড্ড কথা বলছিস যে! আর কী মনে পড়ে?'

'কিছু না—'

'শুধু ওই দেবতার মুখ?'

'হ্যাঁ—'

'কোথায় দেখলি ওকে?'

'গঙ্গার ধারে। শুয়ে আছে ঘাসের ওপর—'

'ডেকে আনলি না কেন?'

'কত ডাকলুম উঠল না। মা, তার সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন, জ্ঞান নেই। আমার কী হবে মা—'পাগলিনী কেঁদে উঠল ডুকরে।'

বৈষ্ণবী বললে, 'ছি কাঁদিস নে। ব্যাপারটা কী বুঝতে হবে। তার নাম জানিস?'

ঘাড় নাড়ল পাগলিনী : 'না তো—'

'নিবাস?'

'আমাদের গ্রামের কাছে—'

'তোদের গ্রাম কোথায়?'

'মনে পড়ছে না—'

'ওদের গ্রামের নাম?'

'জানিনে—'

'কিছুই জানিসনে অথচ প্রাণের দেবতা করে বসে আছিস? বলিহারী!'

'আমার কী হবে মা—' ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

'চল্ দেখে আসি।'

'চলো মা—'

বৈষ্ণবী ঘর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এল, উঠোন ডিঙিয়ে কুটীর ঘরের

বাইরে। মালা হাতেই চলল পাগলিনীর দেবতা দেখ্‌তে। কৌতুহল তার মনে কম ছিল না। এতদিন পরে পাগল-মেয়ের এ আচরণ কেন? কাকে সে দেখেছে? তার পরিচয় কী? যদি সত্যিই তার গ্রামের মানুষ হয় এবং এখনও জ্ঞান থাকে তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ মেয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে—নাম ও ধামের হদিস মিলবে। তখন পাঠিয়ে দেওয়া যাবে বাপের কাছে। আ-হা কতদিন বাপ-মায়ের কোল ছাড়া? তারা ফিরে পাবে নিরুদ্দেশ কন্যা—আনন্দ করবে কত। এ দায়িত্বটুকুই তো বাকি। ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে হয়ত, কিন্তু চিরকাল কী কাউকে ধরে রাখা যায়? সে হেঁটে যাচ্ছিল হনহনিয়ে—পেছনে পেছনে আসছিল প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষের দল। সকলে সমবেত হল গঙ্গাতীরে। অল্প দূরের পথ, আসতে বেশি সময় লাগল না। গঙ্গাতীরে পৌঁছে বৈষ্ণবী দেখল সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে একটি গৌরবর্ণ যুবক। পাগলিনীর কতা মিথ্যা নয়, যুবকের সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ—কেউ যেন যত্নসহকারে ক্ষতস্থানের শুশ্রুষা করেছে। কিন্তু এমন নিস্পন্দভাবে শুয়ে যে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। হয়ত সেই কারণেই ফেলে রেখে গেছে এখানে। কিন্তু এখানে এল কী করে? ফিরিঙ্গিদের হাতে ধরা পড়েছিল হয়ত—ফিরিঙ্গিরাই ফেলে রেখে গেছে। মৃতদেহ বন্দী করে তাদের কী লাভ?— বৈষ্ণবী ভাবল এটাই সম্ভব। ফিরিঙ্গিরা বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়, এ দেশীয় লোকদের প্রতি তাদের কণামাত্র সহানুভূতি নেই।

বৈষ্ণবী দাঁড়িয়ে পড়েছিল থমকে—তার সঙ্গে সঙ্গে জনতাও। শুধু পাগলিনী গিয়ে বসল পাশটিতে। করুণ চোখে তাকাল আহত যুবকের পানে। চেতনাহীন, অসাড়। জ্ঞান নেই যুবকের।

ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত।

পাগলিনী বলে উঠল, 'মা, মরেনি। বেঁচে আছে। তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? মা, একে বাড়ি নিয়ে চলো—'

যেন সম্বিত ফিরে পেল বৈষ্ণবী। বাস্তবিক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সে তাড়াতাড়ি যুবকের শিয়রে বসল, কোলে তুলে নিল মাথা। পরীক্ষা করতে লাগল। বুঝতে পারল সত্যি সত্যি মরেনি যুবক—ধীরে ধীরে শ্বাস বইছে তখনও। কিন্তু এভাবে খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে এ শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে যাবে, মারা যাবে নির্ঘাত। এখনই চিকিৎসা ও শুশ্রুষা দরকার। সর্বোপরি দরকার একটি আশ্রয়। কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়?

'মা, ওকে বাড়ি নিয়ে চলো—' পাগলিনী আবার বললে।

সেই ভাল। বাড়িতে নিয়ে গেলে ওর যত্ন হবে সেবা হবে। —হয়ত সেরে

উঠবে উপযুক্ত চিকিৎসায়। চেষ্টা করতে দোষ কী। বেঁচে গেলে তারই তো পুণ্য—পাপের বোঝা হালকা হবে। ঈশ্বরের কাছে বলতে পারবে এক পাগল-মেয়ে আর এক আহত-যুবককে নিঃস্বার্থভাবে সে সেবা করেছিল, সংসারে এইটুকু মাত্র ভাল কাজ সে করেছে। বলতেই বা হবে কেন, তিনি তো সব দেখছেন!—মরুকগে পরকালের চিন্তা, এখন একে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সেটাই আগে দরকার।

বৈষ্ণবীর অনুরোধে এগিয়ে এসেছিল দু'চারজন পুরুষ—তারা সাহায্য করল। ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল বৈষ্ণবীর গৃহে। সাবধানে শুইয়ে দিল বিছানায়। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে বেঁধে দিল শুকনো কাপড়। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে—কিন্তু খুব নির্জীব। প্রতিবেশিনীর মধ্যে একজন বললে, 'শিগগির হকিম ডেকে আনো মনোরমা দিদি, রোগী শুষছে—'

চিকিৎসার কথাই ভাবছিল বৈষ্ণবী—যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় প্রতিবেশিনী বড় মুখরা, সে মুখ টিপে হেসে বললে, 'ফিরিঙ্গিমহলে তো মনোরমা-দিদির খুব পসার, একটা ফিরিঙ্গি হকিম ডেকে আনলে কেমন হয়? দুদিনেই সেরে ওঠে তাহলে—'

এ কথার নিহিতার্থ বোঝার মতো বুদ্ধি আছে বৈষ্ণবীর। সে দপ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু এখন বিপদের সময়। তদুপরি পাগলিনী বলে উঠল, 'মা, তুমি গিয়ে ফিরিঙ্গি হকিমই ডেকে আনো। শিগগির যাও মা—'

'যাচ্ছি।' কষ্টে আত্মসংবরণ করে বৈষ্ণবী তার উদ্দেশ্যে বললে, 'ফিরিঙ্গি মহলে আমার যা পসার তা সকলেই জানে, কিন্তু এ পসার জানাতে হলে ভাগ্যের দরকার। এখানকার অনেক ভাগ্যবতী আমাকে হিংসা করে জানি, কে কত সুখে আছে তা জানতে তো বাকি নেই, ঘর ছেড়ে আসার মুরোদ নেই বলে ঠারে ঠারে আমার ওপর নজর। বুক জ্বলে যায় ওদের, বুঝলি মা, ভাগ্যে নেই তো আমার মতো সুখ পাবে কী করে?'

প্রথম প্রতিবেশিনী বললে, 'ঘাঁটালি তো। ওকে সামলাও এখন—'

তৃতীয় মহিলা বললে, 'কী মুখ রে বাবা, কিছু আটকায় না। ঢের হয়েছে, চল্ বাড়ি যাই।'

বৈষ্ণবী নিরীহস্বরে বললে, 'আমি তো বাপু তোমাদের কিছু বলিনি, আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলুম—'

'বুঝি গো সব বুঝি।' দ্বিতীয় মহিলা ফোঁস করে উঠল, 'ঝি, বকে বউ শাসন আমাদের জানা আছে। ঝকমারি হয়েছে তোমার বাড়িতে আসা, নাক-কান মলছি তোমার বাড়ির ত্রিসীমা আর মাড়াব না—'

বেগে প্রস্থান। সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবেশিনীরা।

পাগলিনী বললে, 'মা, এ কী হল?'

'কিছু হয়নি তুই চুপ করে বস্। আমি আসছি—'বলে বেরিয়ে গেল বৈষ্ণবী।'

ঘরে দুজন। শিয়রে বসে পাগলিনী একদৃষ্টে তাকিয়েছিল যুবকের নিদ্রিত মুখের পানে, ব্যজন করছিল ধীরে ধীরে। স্বপ্নের দেবতার মুখ মনে পড়ছিল আবছাভাবে, এ মুখ ও কবে কোথায় দেখেছে, প্রাণপণে স্মরণে আনার চেষ্টা করছিল। বাস্তবিক স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে তার। অভিনয়ের মহড়া দিতে গিয়ে স্নায়ুর ওপর অত্যধিক চাপে সত্য সত্যই বিস্মৃতি। অত্যন্ত ক্ষীণভাবে কী-যেন ধরা পড়ে মগজে, পরক্ষণে মিলিয়ে যায়, চিন্তাগুলো সঠিক অবয়ব পায় না মোটে। ঝুঁকে, যুবকের মুখ দেখছিল পাগলিনী, স্মৃতির বন্ধ দুয়ারে কী-যেন বার বার আঘাত করে উঠছিল, শিউরে উঠল মন, পাগলিনী ছটফট করছিল, কিন্তু স্পষ্টভাবে ধরতে পারছিল না কিছুই। যাতনা হচ্ছিল মনের মধ্যে, বুঝতে পারছিল যুবকের অস্তিত্বেই লুকিয়ে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ-জীবন। কাটা কাটা ছবি, পরস্পর অসংলগ্ন, জোড়া লাগছে না। সব যেন ধোঁয়া......অস্পষ্ট......অস্বচ্ছ.......

যুবকের কষ্ট হচ্ছিল। বহুক্ষণ নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছে। সে চোখ মেলল। ঠাহর করে দেখল এ গৃহস্থের ঘর-দুয়ার, গৃহস্থের শয্যা; বজরার মতো ছিমছাম কক্ষ নয়, সে-রকম পরিপাটি সুখশয্যা নয়। পিঠে, সর্বাংগে ব্যথা। শরীর অবসন্ন, মন অবসাদগ্রস্ত। চিন্তাধারাও কেমন অসুস্থ, সব কথা পরিস্কার মনে পড়ে না। সে তো বজরায় ছিল, এটা কী তবে বজরা? হ্যাঁ তাই—বজরায় ইন্দিরা ছিল তার পাশে বসে, যুবক চোখ তুলে দেখল, এখানেও ইন্দিরা বসে রয়েছে সেইভাবে। সে স্বস্তি বোধ করল। বললে, 'ইন্দিরা, তবে স্বপ্ন নয়, কী বলো?'

পাগলিনী বুঝতে পারল না তার কথা কিন্তু চমকে উঠল নিদারুণ ভাবে। কী নামে ডাকল? সে কে?

যুবক আবার বললে, 'তুমি এ বেশ কোথায় পেলে ইন্দিরা?'

ইন্দিরা!—এতদিন এ নামে কেউ সম্বোধন করেনি. কানের ভেতর এ ডাক পৌঁছে শরীর-মন উতলা করে তুলল। ধোঁয়া যেন সরে যেত লাগল—ঝাপসা দিগন্ত রঙে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। কত কথা মনে এল একসঙ্গে। মনে হল ও-নাম তারই বটে—সে ইন্দিরা। আশ্চর্য, নিজের নামটা মনে পড়েনি এতদিন। সে বললে, 'তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছিনে। এ কী আমার নতুন জন্ম? নিজেকে যেন ফিরে পাচ্ছি নিজের মধ্যে। তোমায় শতকোটি প্রণাম!' ভূমিষ্ঠ হয়ে পায়ের ধুলো নিল ইন্দিরা।

যুবক বিস্মিত। ব্যস্ত হয়ে বললে, 'এ কী করছো? তোমার কথা যে আমি কিছু বুঝতে পারছিনে!'

ইন্দিরা বললে, 'তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছো। ক্ষতি হতে পারে। আমার কথা পরে বুঝিয়ে দেব।'—পাশে বসে পাখার বাতাস করতে লাগল ধীরে : 'কী যেন জিজ্ঞেস করছিলে। সেই কথা বলো। দেখি উত্তর দিতে পারি কিনা?'

সূর্যকান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বলছিলুম তোমার এ বেশ কেন? পেশোরাজ ওড়না কোথায় ফেললে? তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল —'

'পেশোরাজ ওড়না?' ইন্দিরা থই পেল না চিন্তা করে : 'ও-সব কোনদিন পড়েছি নাকি? চোকেই দেখিনি। আমি ও-পোশাক পরতে যাব কেন? আমি কী মুসলমান?'

'কিন্তু তা-ই তো তুমি পড়েছিলে বেশ মনে আছে আমার—'

'বলো কি। আর-কিছু মনে আছে?'

'তোমার হাতে ছিল সেতার।' যুবক চিন্তাচ্ছন্নস্বরে বললে, 'কত রাগ বাজাতে। সকালে আশাবরী ভৈরবী বিকেলে সিন্ধু ভূপালি—বড় মিষ্টি। ইন্দিরা, তুমি সেতার বাজাতে শিখলে কবে?'

ইন্দিরা বললে, 'আমি সেতার বাজাতে জানিনে—'

'জানো না?'

'না।'

'কিন্তু খানিক আগেই তো বাজাচ্ছিলে।—আমার কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বজরা? বজরা কী ঘাটে এসে লেগেছে?'

'বজরা। বজরা কোথায়?—এটা তো বৈষ্ণবীর ঘর!'

'সে কী!' সূর্যকান্ত ফের তাকাল চারদিকে, মনে হল ঘরই বটে। বললে, 'ঠিকমতো ভাবতে পারছিনে। আচ্ছা ইন্দিরা, আমি কী ঘুমিয়ে ছিলাম?'

ইন্দিরা বললে, 'হ্যাঁ—'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম?'

'তা বলতে পারিনে। গঙ্গাতীরে ঘাসের ওপর শুয়েছিলে, ফুল তুলতে গিয়ে দেখতে পাই। এখানকার লোক ধরাধরি করে তুলে এনেছে—'

'এটা কোন জায়গা?'

'হুগলী—'

'বুঝতে পেরেছি।' সূর্যকান্ত কাতরস্বরে বললে, 'ফিরিঙ্গি মৃতজ্ঞান করে ফেলে রেখেছিল গঙ্গাতীরে—তোমার অনুগ্রহে এ আশ্রয় পেয়েছি। আমারও

এ নতুন জন্ম, তোমাকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। দেবি, তুমি প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করো—'

'ছি।' ইন্দিরা তার ঠোঁটে হাত রাখল, 'অপরাধী করো কেন? তুমি যে আমার দেবতা! তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই—'

'আশ্চর্য, আমিও যে দেবীর আসনে বসিয়েছি। স্বপ্নে-জাগরণে কেবল তোমাকেই দেখি। রাঙামাটির ঘাটে সেই যে শুভদৃষ্টি—'

'কী বললে?'

'রাঙামাটি। তুমি তো রাঙামাটির গদাধর গোস্বামীর কন্যা—স্নান করতে এসেছিলে ঘাটে—সেই অবকাশে হার্মাদরা—'

'মনে পড়েছে। তুমি হলে রণসাগরের মহারাজ, ভৃত্যটি সে নামেই ডাকত। ঘাটের পাশে নৌকো বেঁধেছিলে, দেখেছিলুম আমি। দাসী তোমাদের সরে যেতে বললে, তোমরা চলে গেলে বাঁশঝোপের আড়ালে। সেখান থেকেই হার্মাদদের ওপর গুলি আর তীর ছুঁড়েছিলে তোমরা—'

'তাহলে?'

'শোধবোধ।'

'সেই ভাল। উঃ—'

'কী হল?'

'কষ্ট—'

'আরেকটু সহ্য করো। হকিম এলো বলে।'

অল্পক্ষণ পরেই মনোরমা বৈষ্ণবী ঘরে ঢুকল হকিম নিয়ে। ইন্দিরা মাথার কাপড় তুলে উঠে দাঁড়াল স্বাভাবিক পদে। বৈষ্ণবী তাকিয়ে দেখল।

।। বারো ।।

হুগলী দুর্গের বাইরে যখন এ ঘটনা ঘটছে—হুগলী দুর্গের ভেতর তখন অন্য দৃশ্য উদ্ভাসিত। পাপীজন পরিত্রাণের প্রচেষ্টা। প্রধান ভূমিকায় পাদ্রী আলমিডা।

সপ্তগ্রামের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়নি, সঙ্গীদের একজন নিহত হয়েছে, দুঃসাহসী হিন্দু যুবকের দুর্মদ যুদ্ধোদ্যমে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল রক্ষাপুরী হুগলীতে। বেশিদিন আগের ঘটনা নয়—কিছুই ভোলেনি পাদ্রী আলমিডা। সুযোগ পাওয়া যায়নি, এর একটা সমুচিত জবাব দেবার ইচ্ছা ছিল তার। সেই সুযোগ এসেছে এবার। বাহবা দিতে হয় দুর্গপ্রহরীদের অধিনায়ক কারভালো-র অন্ধকার রাত্রে ঠিক চিনতে পেরে শত্রুপক্ষের বজরা আক্রমণ করেছে দারুণ সাহসে ও নিপুণ বিবেচনায়। অবশ্য দুর্গের ভেতর সংবাদ

দিয়েছিল আগে, সেখান থেকে তোপ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল বজরায়। বজরা জলমগ্ন হবার পূর্বে ছুটে গিয়েছিল সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে—বন্দী করে ফেলেছিল আরোহীদের। তাদের মধ্যে সেই হিন্দু যুবকও নাকি ছিল কিন্তু তার সৌভাগ্যবশতঃ সে তখন মৃত, সমস্ত পীড়ন ও পরিত্রাণের বাইরে, তাকে নদীতীরে ফেলে দিয়ে বাকী সবাইকে বন্দী করে দূর্গের ভেতরে এনেছে কারভালো। একসঙ্গে অনেক পাপী। শোধ তুলতে হবে। সপ্তগ্রামে একজন পাপী উদ্ধার করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এখানে কেউ বাধা দেবে না—পাদ্রী আলমিডা সর্বেসর্বা। প্রভু যীশুর স্মরণ যদি নেয় তাহলে বলার কিছু নেই, ওদের মানব-জীবন সার্থক হয়ে যাবে, কিন্তু যদি তা না শোনে তবে এমন পথ সে গ্রহণ করবে যা এদেশের লোক কল্পনাও করতে পারে না। ধর্ম একটাই—তা হল যীশুর ধর্ম। জাতি একটাই—তা হল খৃষ্টান জাতি। এর মধ্যে কোন জাতি বা ধর্ম থাকতে পারে না, সুদূর রোম হতে এতদূর তার আগমন শুধু এ কারণেই, খৃষ্টধর্মের পথ প্রশস্ত করা। দেশ লুণ্ঠন ও ধর্ম প্রসার। এ দুটি ছাড়া অন্য কোনো ইচ্ছা নেই, সবাই তা জানে। লুণ্ঠন কীভাবে হচ্ছে সে-সংবাদ রাখুক লুণ্ঠনকারীর দল—ধর্ম প্রচার ও প্রসার রক্ষার ভার তার। সহজে কেউ প্রভুর পথ অনুসরণ করতে চায় না, এদেশীয় লোকেদের মিথ্যে মোহ ও অসত্য দেবদেবীর নাগপাশ ছিন্ন করে সৎ ধর্মের আলোয় উত্তরণ করতে হবে, বুঝতে যদি না চায় জোর করে বোঝাতে হবে। অনিচ্ছুক রোগীকে ঔষধ গেলানোর মতো। তার ভালর জন্যই পীড়ন দরকার।

একসঙ্গে সবাইকে নয়—দু-একজনকে বুঝিয়ে 'উদ্ধার' করতে হবে। সকলেই বন্দী হয়ে আছে দূর্গের অভ্যন্তরে, দুই ব্যক্তিকে ডেকে এনেছে পাদ্রী আলমিডা। এরা দুজন নিরীহ, অল্প চেষ্টায় যদি রাজী হয়ে যায় তবে এদের দেখাদেখি অন্যেরাও রাজী হতে পারে। কিন্তু বেগ পেতে হচ্ছে। একজন প্রায় কবজায় এসেছে অপরজন ঠিক তার উলটো—অটল, অনড়। কোনোমতেই প্রেমের পরিত্রাতার কাহিনী শ্রবণে মনোযোগ দিতে চায় না—অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক চায়। যেন, এক দুর্বিনীত শ্রোতা। বার বার তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে পাদ্রী ব্যর্থ। আমাদের পরিচিত—বৈরাগী নবীনদাস। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণ যুবক—সপ্তগ্রামের ঘাটে যাকে ক্ষণকালের জন্যে আমরা দেখেছি।

দূর্গের ভেতরে এ কক্ষ অন্ধকার—অস্পষ্টভাবে মানুষ চেনা যায়। ব্রাহ্মণ যুবক পাদ্রীর কথা নিবিষ্টমনে শুনছিল, কিন্তু নবীনদাস বৈরাগীর এতটুকু মনোযোগ নেই, তার ভঙ্গিতে উদাসীনতা সুস্পষ্ট। দেখে, রেগে উঠল পাদ্রী। গম্ভীরভাবে বললে, 'নবীনদাস, তোমাকে বার বার আমার পবিত্র কথা শুনতে বলছি কিন্তু

কিছুতেই তুমি মনোযোগ দিচ্ছ না। তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, দুঃখ পেতে হবে—'

নবীনদাস কথা বলতে পেরে বাঁচল, বললে, 'সায়েব, যখন জন্মেছি তখন থেকেই দুঃখ পাচ্ছি—দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দুঃখ-কষ্টের কথা থাক্ আর তোমার পবিত্র কথাও থাক্, তুমি থাকো তোমার ধর্ম নিয়ে আর আমাকে থাকতে দাও আমার ধর্মে। তাতে তোমার শ্রম বাঁচে আর আমরাও রক্ষা পাই পীড়ন হতে। তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না, কিন্তু সায়েব, ওই অখাদ্য বস্তুগুলো এনে রেখেছো কেন? খাওয়াবে নাকি?'

'হাঁ। সেজন্যেই আনা হয়েছে।'

'সায়েব, পেটুক বলে আমার বদনাম আছে, খাওয়ার কথা শুনলে আমার জিবে লালা ঝরে, কিন্তু তুমি যত চেষ্টাই করো ওই অখাদ্য আমি কিছুতেই খাব না—'

'তুমি কী প্রাণের মমতা করো না?'

বৈরাগী হেসে বললে, 'কই আর করলুম!'

'বেশ।' পাদ্রী অন্যদিকে জাল বিস্তার করলে, 'অখাদ্য না খাও—ত্রাণকর্তার নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করো। খুশি হয়ে মুক্তি দেব।'

'মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না সায়েব। অন্ততঃ তুমি তো নও তার মালিক তোমার আমার চেয়ে ঢের শক্তিমান। আর, পথের কথা বলছো? সায়েব, আমি যে পথ অবলম্বন করেছি তার কর্তব্য শেষ করে উঠতে পারলাম না—নতুন পথ অবলম্বন করে কী হবে? পথের লোভ দেখিও না, ও-মোহ আমার নেই। একটা কথা শুধু জানি, যে যে-পথে চলুক তাকে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় গিয়ে মিলিত হতে হবে। সব পথের শেষ সেখানেই—'

'নবীনদাস, তোমাকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি,' পাদ্রীর কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্যে থমথম করে উঠল, 'তুমি ত্রাণকর্তার নির্দিষ্ট পথে চলবে কিনা?'

'সায়েব জুলুম করছো কেন? তফাত তো নেই, তোমার খৃষ্টও দেবতা, আমার কৃষ্ণও দেবতা। তুমি খৃষ্ট নিয়ে সুখে আছো, আমি কৃষ্ণ নিয়ে—'

'চুপ করো।' পাদ্রী গর্জন করে উঠল অসহিষ্ণু স্বরে ঃ 'প্রভু-খৃষ্টের পবিত্র নামের সঙ্গে তোমার কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ কোরো না। তোমাদের কৃষ্ণ দেবতা নয়, মানুষ; মিথ্যাবাদী আর লম্পট—'

'থাক্ খুব হয়েছে সায়েব, এবার তুমি চুপ করো।' নবীনদাস কানে আঙুল দিয়েছিল, বললে, 'কৃষ্ণনিন্দা শুনলেও পাপ। পাদ্রী, তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো. আমি কৃষ্ণের আশ্রয় ত্যাগ করে কিছুতেই অন্যপথ গ্রহণ করবো না—'

'করবে না?'

'না—'

'বেশ।—' পাদ্রী ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকল, 'গঞ্জালিস, এন্টনি—'

দুজন যমদূতের মতো বিকটাকৃতি ফিরিঙ্গি দেখা দিল দ্বারদেশে। পাদ্রী আলমিডা ইংগিত করল। তারা ভয়াল পদক্ষেপে এগিয়ে এল এবং নবীনদাসকে বেঁধে নিয়ে গেল চক্রের কাছে। বৃহদাকার চক্র—সেটি ছিল ঘরের এক কোণে। চক্রে চাপিয়ে আবার বাঁধল, যেন সে চক্রচ্যুত না হয়। দেখে, তার সঙ্গী ব্রাহ্মণ যুবক সভয়ে চক্ষু মুদল, শিউরে উঠতে লাগল। নবীনদাস কিন্তু বাধা দিল না, চক্রপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে মুদ্রিত নেত্রে সে শুধু বলছিল, 'হরিবোল—হরিবোল—'

পাদ্রী বললে, 'ও কি বলছে? ভয় পেয়েছে? খুলে দেব?'

ব্রাহ্মণযুবক বললে, 'অভয়মন্ত্র আওড়াচ্ছে। কৃষ্ণকে ডাকছে—'

'বটে।—'

ক্রুদ্ধ পাদ্রী তৎক্ষণাৎ আদেশ দিল চাকা ঘোরাতে।

বড় মর্মান্তিক আদেশ। চাকা ঘুরল, সঙ্গে সঙ্গে নবীনদাসের হাত ও পায়ের অস্থি চূর্ণ হতে লাগল। গুঁড়ো হতে লাগল হাড়।

ভীষণ যন্ত্রণায় বৈরাগীর নয়নকোণে দেখা দিল অশ্রুধারা, কিন্তু সে অধীরতা প্রকাশ না করে নীরব রইল। সব যন্ত্রণা সে যেন আত্মস্থ করে নিয়েছে অলৌকিক শক্তিবলে। হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, আর সে গদগদ কণ্ঠে বলছিল, 'আর একবার দাঁড়াও, যন্ত্রণা নেই, ক্লেশ নেই, প্রভু, ওই রূপ আর একবার দেখাও। তোমার ও-রূপ দেখতে দেখতে তোমারই নাম গাইতে গাইতে যেন এ সংসার থেকে চলে যেতে পারি। প্রভু,দয়া কর, সামনে এসে দাঁড়াও—'

শুনে, ব্রাহ্মণের মনে ধাক্কা লাগল। তার ভয়-ভাব দূর হল। বৈরাগীর মনে এত জোর? সে কী ঈশ্বরের রূপ দেখেছে?

এগিয়ে গেল ব্রাহ্মণ—স্পর্শ করল নবীনদাসের অঙ্গ। দেখা যাচ্ছে না কিছু। অন্ধকার ঘর।

নবীনদাস অঙ্গ স্পর্শ মাত্র বলে উঠল, 'এ তো তোমার স্পর্শ নয় প্রভু! এ কার কঠোর করস্পর্শ! রাধাবিনোদ, তোমার নবনীত কোমল করকমল আর একবার আর একবার আমার অঙ্গে বুলিয়ে দাও। জ্বালা জুড়িয়ে যাক, শান্তি আসুক। মধুসূদন, মধু, মধু—'

ব্রাহ্মণ বললে, 'নবীনদাস, তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'কষ্ট? শান্তি, বড় শান্তি। আমার কোনো কষ্ট নেই ঠাকুর—'

ব্রাহ্মণ বললে, 'তুমি কী কিছু দেখতে পাচ্ছো?'

'পাচ্ছি বই কি। বড় সুন্দর, অপরূপ মূর্তি।' নবীনদাসের চক্ষু মুদিত, বললে, 'রাধাবিনোদ স্বয়ং এসেছেন, দেখতে পাচ্ছ না? আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কোমল করস্পর্শে আমার সকল যাতনা দূর হয়ে যাচ্ছে। কী করুণা-ঘন মূর্তি! আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার মনপ্রাণ। ওই যে—'

'তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ—'

'কই, কই নবীনদাস?'

'ওই তো তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘরে। দেখতে পাচ্ছ না? আমি যে স্পষ্ট দেখছি-—'

সহসা ব্রাহ্মণের দেহ রোমাঞ্চিত হল। মিথ্যা নয়—সত্যি একটি জ্যোর্তিময় ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে বৈরাগীর দেহের চারিপার্শ্বে। সে মূর্তি দেখতে পেল না। কিন্তু কারো অলৌকিক অস্তিত্ব অনুভব করতে পারল। শিহরিত হল সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সে লুটিয়ে পড়ে দূর থেকে ছায়ার উদ্দেশ্যে প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গে। মনের মধ্যে উথলে উঠতে লাগল, বিপুল জলরাশি।

নবীনদাস তখন বলছিল, 'রাধাবিনোদ, সমস্ত জীবনের সঞ্চিত বালুকারাশি মার্জনা করে যদি দেখা দিলে তাহলে আর একবার দাঁড়াও, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখা দিও। তুমি দেখা দেবে তা কখনও ভাবিনি, আমার পাপ-জীবন সার্থক হল। কোনো কষ্ট নেই, কী শান্তি, কী শান্তি—'

ব্রাহ্মণের মনে হয় সুগন্ধি ধূপধূমে কক্ষ আমোদিত হয়ে উঠছে। কারো আবির্ভাব ঘটেছে নিঃসন্দেহে। বৈষ্ণবের উন্মাদনা তার চিত্ত স্পর্শ করল, উন্মত্তের মতো নবীনদাসের রক্তাপ্লুত চরণযুগল ধারণ করে সে বললে, 'বৈরাগী, তুমি ধন্য, তোমার জীবন সার্থক। আহা, কী দেখলে। সারা জীবনের ধ্যানেও যা নয়ন-পথে আসে না, সেই দুর্লভরূপ তুমি মুহূর্তের আহ্বানে প্রতক্ষ করলে। তুমি যথার্থ ভক্ত—পরম ভাগ্যবান। আমি ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য নই, চণ্ডালের অধম। কত চেষ্টা করেছি, তাঁর মূর্তি তো আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়নি। পাপী—আমি মহাপাপী। বৈরাগী আমাকে উদ্ধার করো, তাঁর রূপ একবার দেখাও—'

বৈরাগী বললে, 'তুমি করুণাময়! তোমার আকুলতায় তিনি নিশ্চয় দেখা দেবেন। দেখ, তুমিও দেখ—'

ব্রাহ্মণ শিহরণ দূর হল, গভীর আকুলতা ঘনীভূত। তার নয়ন পথে ছায়ারূপ সহসা শরীরী হয়ে উঠল, অন্ধকার কক্ষের একটি কোণ উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই ছায়ারূপ ক্রমশঃ সুন্দর ও সুগঠিত হয়ে শ্যামরূপ ধারণ করল—রাধাবিনোদ বলতে বৈষ্ণবেরা যা বোঝে ছায়া সেই শরীর ধারণ করে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মানসচক্ষুর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল! অবাধে প্রেমাশ্রুধারা নেমে এল

ব্রাহ্মণের নয়ন কোণে, নবীনদাস জয়ধ্বনি দিতে লাগল ছেলেমানুষের মতো : 'জয় রাধাবিনোদ—জয় রাধাবিনোদ—জয় রাধাবিনোদ—'

পাদ্রী আলমিডা ও তার অনুচরদ্বয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

'আলমিডা!—'

গম্ভীর ডাক শোনা গেল একটা।

আলমিডা তাকিয়ে দেখল দ্বারপ্রান্তে একজন সম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গি যুবক। আমীরাল ডি ক্রুজ, হুগলী বন্দরের পর্তুগীজ শাসনকর্তা। ব্যস্তপদে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পাদ্রী আলমিডা।

ফের সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'আলমিডা, তোমার রক্ত-পিপাসা কী এখনও মেটেনি? এসবের অর্থ কী? আমার অনুমতি না নিয়ে এ দুজন বন্দীকে কারাগার থেকে এখানে এনেছো কেন?'

'দুঃখিত।' পাদ্রী আলমিডা ঈষৎ লজ্জিত : 'কিন্তু পৌত্তলিক দলনে ধর্মগুরুর আদেশই আমার গ্রাহ্য; সেজন্যে শাসনকর্তার অনুমতি নিতে হবে তা জানতাম না।'

'জানতে না, অথবা ইচ্ছা করে অনুমতি নাওনি, কোনটা ঠিক?'

আলমিডা চুপ। গজরাতে লাগল মনে মনে।

'ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচার আমি পছন্দ করিনে' তেমনি গম্ভীর স্বর ডি ক্রুজের : 'কারো ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে নিরীহ প্রজাপীড়ন আমার কাম্য নয়। তুমি কী পীড়ন শুরু করেছো?'

'এরা শয়তানের অনুচর। বিশেষ করে ওই নবীনদাস।' শাসনকর্তার হস্তক্ষেপে আলমিডা রীতিমতো বিরক্ত : 'ওদের জন্যে ভারতবর্ষের লোক প্রকৃত ধর্ম গ্রহণে উৎসাহহীন—'

'তা বলে অত্যাচার করবে?'

'মুক্তির আলো দেখতে হলে—'

'খুব হয়েছে। খুলে দাও ওদের।'

আলমিডা নীরব।

'এই, শুনতে পেলে না? গঞ্জালিস, এন্টনি—'

পাদ্রীর অনুচরদ্বয় একবার আলমিডার পানে তাকাল, আলমিডা নির্বাক। স্বয়ং আমীরালের আদেশ। তারা দ্বিধা কাটিয়ে এবার নবীনদাসের বন্ধন খুলে সরে দাঁড়াল। নবীনদাস দাঁড়াতে না পেরে পীড়ন-জর্জরিত দেহে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। একতাল মাংসপিণ্ড যেন।

ডি ক্রুজ বললে, 'কী ব্যাপার আলমিডা? ওভাবে লুটিয়ে পড়ল কেন? তুমি ওকে হত্যা করছো?'

আলমিডা তবু নিরুত্তর।

'কী হল? কথা বলছো না যে—'

অপমানে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল আলমিডা। যথাসাধ্য আত্মসংবরণ করে সে বললে, 'আপনি শাসনকর্তা, সেজন্যে সম্মান রক্ষা করে বলছি যে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি এবং কোনও শাসনকর্তার নিকট আমার কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত নই। আপনি জানেন, স্বয়ং রাজাও আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আমি কারো ভৃত্য নই, ঈশ্বরের প্রতিনিধি যীশু আমার একমাত্র প্রভু—'

বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল।

'পাদ্রী, তুমি জানো, এটা স্পেন নয়, ভারতবর্ষ?' ডি ক্রুজ ফুঁসে উঠল আহত অপমানে : 'জানো কী, এ দুজন পৌত্তলিক আমাদের প্রজা নয়?'

তেমনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর : 'জানি—'

'এই হুগলী বন্দর সমর-বিভাগের কর্তৃত্বাধীন। এখানে কারো ইচ্ছামতো আইন চলবে না এ কথা তোমার জানা উচিত—'

'আমি জানি—'

'তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে তুমি সত্যধর্ম প্রচার করতে এসেছো, নরহত্যা বা দেশ শাসন তোমার অধিকারের বাইরে—'

'জানি।'

'তাহলে তুমি এ কাজ করছো কেন?'

'আগেই বলেছি কৈফিয়ত আমি দিই না। তবু বলছি সত্যধর্ম প্রচারের জন্য যা আবশ্যক তাই শুধু করেছি। —ডি ক্রুজ, এখন তুমি আমীরাল, অনেক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু মনে রেখো একদিন স্পেনে ফিরতে হবে। সেদিন অনুতাপ করতে হবে এজন্যে—'

'পাদ্রী, আমি সৈনিক, সর্বদা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। ও-ভয় দেখিও না। ভরসা করি, তোমার রাজত্বে প্রত্যাবর্তন করবার আগেই আমার মৃতু হবে।' ডি ক্রুজের কণ্ঠস্বর কঠিন : 'আলমিডা, তুমি নরঘাতী পিশাচ—যিষুর পবিত্র ধর্ম তোমার মতো চণ্ডালের জন্যেই ভারতবর্ষে নিন্দিত ও ঘৃণিত হচ্ছে। আশংকা হয় একদিন পতুর্গীজ সাম্রাজ্য এ কারণেই বিনষ্ট হবে। শোনো, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তুমি যা করেছো যথেষ্ট হয়েছে, এর বেশী অত্যাচার চলবে না। দ্বিতীয়বার যেন এমন ঘটনা না ঘটে—'

'চেষ্টা করব।'

'আমার আদেশ—'

'কিন্তু প্রতিটি খৃষ্টান আমার কথা শুনবে।'

'পাদ্রী, ভুলে যেও না আমি আমীরাল। আমার আদেশের বিরুদ্ধে হুগলীর কোনো পর্তুগীজ তোমার আজ্ঞা পালন করবে না। যদি করে তাহলে সমুচিত দণ্ড পাবে—'

'বটে?'

'ওই আমার আদেশ। এবং এখনি তা প্রচারিত হবে। বুঝতে পারলে?'

'হুঁ—'

সেই সময় আর একজন ফিরিঙ্গি যুবা কক্ষে প্রবেশ করল।

অন্ধকারে বুঝতে না পেরে নবাগত ফিরিঙ্গি জিজ্ঞেস করল, 'আমীরাল কী এখানে আছেন?'

ডি ক্রুজ সাড়া দিলে, 'আছি। কী হয়েছে?'

উত্তরে যুবা বললে, 'আমীরাল, গতকাল কারভালো যে বজরা মেরেছিল সেটা নবাব শাহ্ নওয়াজ খাঁর বজরা, আমি কারাগারে গিয়ে তাকে দেখে এসেছি—'

'শাহ্ নওয়াজ খাঁ কে?'

'তিনি শাহজাদা শাহজাহানের একজন প্রধান অনুচর—'

'তাই নাকি? তবে তো—'

'এখনি মুক্ত করুন। নতুবা বুঝতেই পারছেন, শাহাজাদার ক্রোধ নেমে এলে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড হবে—'

'চলে যাচ্ছি।'—বলে ঘুরে দাঁড়াল ডি ক্রুজ, পাদ্রীর অনুচরদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বললে, 'এ দুজন বন্দীকে মনোরমা বৈষ্ণবীর ঘরে নিয়ে যাও। ওরা মুক্ত। আর শোনো, পাদ্রী আলমিডা এখন থেকে বন্দী। তাঁর অঙ্গে হস্তক্ষেপ কোরো না, কিন্তু নজরবন্দী করে রাখবে। এটা আমার আদেশ, অন্যথা যেন না হয়।......চলো—'

আমীরাল ডি ক্রুজ আগন্তুকের সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। পাদ্রী আলমিডা দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, 'আচ্ছা—'

॥ তেরো ॥

সপ্তগ্রাম দুর্গের ভেতরে তোরণের পেছনে আমীর-উল-বহর সৌকত আলী খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন—বিষণ্ণ বদন।

বিষণ্ণতার কারণ, তিনি ভেবেছিলেন সেই কাফের যুবকের কথা, তার সাম্প্রতিক রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা। আলাপ ছিল না আদৌ—তবু পাদ্রী কর্তৃক তার অপমানে সে এগিয়ে এসেছিল অযাচিতভাবে। আরও বহুলোক ছিল

সে ঘটনার সাক্ষী, তারা মজা দেখছিল, অধিকন্তু হাঙ্গামা যখন বেঁধে উঠল তখন নিরাপত্তার জন্য যে যেদিকে পারল সরে পড়ল মুহূর্তে—এমনকি যাকে কেন্দ্র করে বচসার শুরু সেই ব্যক্তিটিও। একেবারে অসহায় ও সঙ্গীহীন তিনি তখন, যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। কিন্তু ওই কাফের যুবক রক্ষা করেছিল সেদিন—রক্ষা করেছিল নিজে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। সাহসী, তৎপর ও যুদ্ধকুশলী বটে। সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য। তখন থেকেই যুবকের প্রতি আকর্ষণ। সে-আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনায়—শহর সপ্তগ্রাম রক্ষার ব্যাপারে। সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল প্রায়, প্রতিরোধ বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হলে ভেঙে যেত একেবারে, সপ্তগ্রামবাসীরা কেউ রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ। শহরবাসীরা বন্দী হচ্ছে দলে দলে, তাদের বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে প্রকাশ্য রাজপথে, আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বাদ যায়নি, ফৌজদার কলিমুল্লা ভয়ে পলাতক। কোথাও কোনো নিরাপত্তা ছিল না—চরম বিশৃঙ্খলা। শুধু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তিনি স্থানীয় মহাজন সর্বেশ্বর সেনের সহযোগিতায়, বাধা দিয়েছিলেন যথাসাধ্য। কিন্তু বিপুল ফিরিঙ্গি ফৌজের তুলনায় তাঁদের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত নগন্য—কতক্ষণ প্রতিরোধ চলত কে জানে, হয়ত ফিরিঙ্গি সেনানায়কের হাতে বন্দী হত সকলেই। সেই দুর্যোগ নেমে আসছিল অনিবার্যরূপে, এমন সময় অভাবনীয় কাণ্ড। একা ওই দুঃসাহসী যুবক ঘুরিয়ে দিল যুদ্ধের গতি—পাশা গেল উলটে। যারা এগিয়ে আসছিল দুর্জয়বেগে জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে, তোপের পর তোপ দেখে, অকস্মাৎ তারা ভীত, সন্ত্রস্ত। স্তব্ধ হল তাদের অগ্রগতি—ফিরে গেল যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে ভীরুর মতো। তোপ দখল করে নিয়েছে যুবক।.......রক্ষা পেল সংগ্রাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সবাই।

কিন্তু যার বিক্রমে এই অপ্রত্যাশিত ফললাভ সে কোথায়? আমীর-উল-বহর সৌকত আলী খাঁ বিষাদগ্রস্ত। বিষাদের সঙ্গে বিস্ময়। বাস্তবিক সম্পূর্ণ নিখোঁজ। কেউ সংবাদ দিতে পারেনি। তাবৎ অনুসন্ধান ব্যর্থ। নানাদিকে চর পাঠিয়েছিলেন তিনি, ফিরে এসে তারা চুপ করে থেকেছে আর ঘাড় নেড়েছে নেতিমূলক। ভোজবাজির মতো শূন্যে মিলিয়ে গেছে, বিস্ময় সে কারণে। এমন ঘটনা তাঁর দীর্ঘজীবনে কখনও ঘটেনি। কী হল? কোথায় গেল যুবক? বেঁচে আছে কী? বিষাদ সে কারণেই।

এ প্রশ্ন শুধু তাঁর মনে নয়, উপস্থিত সকলেই সে কথা ভাবছিলেন।

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ইমতিয়াজ খাঁ, আবুতোয়াব খাঁ প্রমুখ মুসলমান সেনানায়ক ও শেঠ সর্বেশ্বর, রাধানাথ শীল প্রভৃতি সপ্তগ্রামের প্রধানগণ। বিষণ্ণ সকলেই। সৌকত আলী খাঁর সামনে আহত সেনাগণ—তাদের চিকিৎসা ও সাহায্য দানের ভার তাঁর ওপর। আপাততঃ কোনো কথা নেই, সকলেই চুপচাপ।

সংগ্রামের প্রত্যাশা। তখনও সূর্যকান্তর সংবাদ প্রাপ্তির চেষ্টা চলছিল, চর আসবে এখনি।

সৌকত আলী খাঁ অস্থির হয়ে উঠলেন—এত দেরি হচ্ছে কেন? তিনি ঘন ঘন দুর্গদ্বারের পানে তাকাচ্ছিলেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। চর প্রবেশ করেছে। দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তিনি, ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'সংবাদ পেলে?'

চর উত্তর দিল না—অন্যান্য চরের মতো নেতিবাচক ঘাড় নাড়ল কেবল।

'আশ্চর্য—'

আবার নীরবতা।

শেঠ সর্বেশ্বর বিড়বিড় করলেন নিজের মনে: 'ভোজবাজি—ভোজবাজিতেও মানুষ এভাবে উধাও হয়ে যায় কিনা সন্দেহ। তাজ্জব ব্যাপার—'

ফৌজদারের খাজাঞ্চি রাধানাথ শীল বললেন, 'উনি তো আপনার বাড়িতেই অতিথি হয়েছিলেন শেঠ মশায়? কিছু অনুমান করতে পারেন কী?'

'অতি সজ্জন যুবক—অভিজাত-বংশের সন্তান।' শেঠ সর্বেশ্বর বললেন, 'নৌকোয় আলাপ—ভেসে যাচ্ছিল গঙ্গায়। আমার নাবিকেরা উদ্ধার করার পর জানতে পারি তার এক আত্মীয়কে ফিরিঙ্গিরা হরণ করেছে, উদ্ধারের জন্য সে একা চলেছে সপ্তগ্রামে। আশ্রয় ও আহার দিলাম নৌকোয়। আলাপে আলাপে আকৃষ্ট হলাম। সপ্তগ্রামে তার কেউ নেই জেনে আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানালাম—সানন্দে রাজী হল। প্রিয় হয়ে উঠেছিল সকলের—আমার ছেলেমেয়েরা তো মামামশায় বলতে অজ্ঞান। এখন তাদেরও মুখ ভার, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। একটা সংবাদ নিয়ে না গেলে ওদের মাতা-ঠাকুরানী পর্যন্ত—'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

রাধানাথ বললেন, 'আমি কেল্লার ভেতর ছিলাম, ঘটনাটা কী?'

'শোনেননি?'

'শুনেছি! ছাড়া ছাড়া ভাবে। আপনি তো ও'র সঙ্গে ছিলেন আপনার কাছে বিশদভাবে শুনতে পাব আশা করি—'

'এখন তা অবিশ্বাস্য মনে হয়।' সর্বেশ্বর বললেন, 'সপ্তগ্রামের লোকে যখন শুনল ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ ফিরিঙ্গির ভয়ে পলাতক তখন তাদের সমস্ত আশা-ভরসা ডুবে গেল নিরাশার অতল অন্ধকারে—প্রস্তুত হল মৃত্যুবরণে। পলায়ন বা মৃত্যু ব্যতীত অন্য পথ খোলা নেই। ফৌজদারী সেনা পলায়নেরই উদ্যোগ করেছিল কলিমুল্লার দেখাদেখি, তারা চলে গেলে আমি ও সৌকত আলী খাঁ নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়তাম, সমগ্র সপ্তগ্রাম জুড়ে ফিরিঙ্গি তাণ্ডব শুরু হত, রক্ষা পেতাম না কেউ। দেখলাম বটে যুবকের তেজ। সেই যুবক

সাহস ও ভরসা নিয়ে ফিরিয়ে আনল কলিমুল্লাহীন সেনাদের, পরিচালনা করল তাদের। রই রই শব্দে এগিয়ে এল ফৌজদারী সেনা।'

'বাহাদুর বলতে হবে—'

'তার চরম বাহাদুরী ডাকুন্‌হোর তোপ দখল করা—যে তোপ থেকে আগুনের গোলা বেরিয়ে আমাদের সেনা বিধ্বস্ত করেছিল। অতিশয় কঠিন কর্ম, কিন্তু পরোয়া না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোপ দখল করেছিল। কী ভীষণ মূর্তি—মনে হয়েছিল বুঝি ছারখার করে দেবে ফিরিঙ্গিদের। তারই ভয়ে ডাকুন্‌হোর বহর আসতে পারেনি কেল্লার সামনে—সত্যি সত্যি রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছিল সে। তারই উপদেশে আমি আক্রমণ করি ডি ক্রুজকে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় সে-বাহিনী। ত্রিবেণী রক্ষা পেয়েছে তার জন্যেই। সবাই বেঁচেছে। কিন্তু কে জানত তার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হবে না, কোনো সংবাদ পাব না তার—'

আক্ষেপ ধ্বনিত হল সর্বেশ্বরের কণ্ঠে। যথার্থ ব্যথিত তিনি।

রাধানাথ বললেন, 'আপনি বেশি পরিচিত—আপনার মনে লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু কী করা যাবে বলুন? আমার তো কোন হাত নেই। আমীর-উল-বহর কী কম চেষ্টা করলেন? খানিক আগেই তো চলে এল—জীবিত বা মৃত কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারছে না—'

'সে কথাই তো ভাবছি কী হল তাঁর?'

রাধানাথ চিন্তিতস্বরে বললেন, 'বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার। আমিও ভেবে পাচ্ছিনে—'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'রাধানাথ, সেই যুবা কে জানো?'

রাধানাথ বললেন, 'কে হুজুর—'

'তুমি হয়ত চিনবে।' সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'সে চন্দ্রকান্ত রায়ের পুত্র।'

'রণ-সাগরের মহারাজ স্বর্গত চন্দ্রকান্ত রায়? তাঁকে আমি বিলক্ষণ চিনতাম—'

'হ্যাঁ, যাঁর বীরত্বে একদিন শাহজাদা খুর্রমও বিস্মিত হয়েছিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র। আমাদেরই দুর্ভাগ্য ধরে রাখতে পারলাম না—'

'এত চর পাঠালেন, সবাই ব্যর্থ?'

'তাই তো দেখছি—'

নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চুপ করে গেলেন। বিষণ্ণতায় ভরে উঠলেন আবার। দেখতে পাচ্ছিলেন একজন হরকরা এগিয়ে আসছে, তিনি তার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

হরকরা যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করে বললে, 'বন্দানওয়াজ, হকিম ইমামুদ্দীন খাঁ জনাবের সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

তিনি বললেন, 'নিয়ে এসো—'

খানিক পরে সেই বৃদ্ধ হকিম এসে অভিবাদন করলেন।

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'আসুন হকিম সাহেব, আজ সপ্তগ্রামে আপনার মত হকিমের বিশেষ প্রয়োজন—'

হকিম ইমামুদ্দীন খাঁ বললেন, 'জনাব, বন্দা বাদশাহের কাজে সর্বদা প্রস্তুত। যথাসাধ্য আপনার আহত সেনাগণের চিকিৎসা করছি। এখানে ওই যারা উপস্থিত রয়েছে ওদের অনেকেই আমার দ্বারা চিকিৎসিত। কদিন যাবৎ সময়মতো আহার নিদ্রা হচ্ছে না। সেজন্যে কিছু মনে করিনে, মাঝে মাঝে বাইরের ডাক এলেই বিব্রত বোধ করি—'

'আপনার পসার ও সুনাম যথেষ্ট।' সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'অসুস্থ হলে মানুষ তো আপনাকে ডাকবেই—'

'রোগীদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।' হকিম ইমামুদ্দীন খাঁ বিচলিত। 'কিন্তু জনাব, দু-এক জায়গায় রোগী দেখতে গিয়ে এমন সব রহস্যজনক ব্যাপার দেখি—'

'সে কথাই জানাতে এসেছেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বলে ফেলুন।'

'আপনি হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু আপনার কাজে আসবে বলেই ছুটে আসা। আমি সেই যুবকের সন্ধান দিতে পারি—'

'পারেন? কোথায়?' সঙ্গে সঙ্গে সচকিত সৌকত আলী খাঁ : 'শিগগির বলুন।'

'বলছি। বলবার জন্যে তো আসা।' প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখে ইমামুদ্দীন খাঁ খুশি : 'গতকাল সন্ধ্যাবেলা শাহ নওয়াজ খাঁর বজরায় এক আহত যুবকের চিকিৎসা করতে গিয়েছিলাম, পোশাক দেখে কাফের বলেই মনে হল এবং জিজ্ঞাসা করে জেনেছি সে আপনাদের কাছেই ছিল—'

'দেখতে কেমন?'

ইমামুদ্দীন খাঁ বললেন, 'গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ দেহ—'

'নাকে কী অস্ত্রক্ষতের চিহ্ন আছে?'

ইমামুদ্দীন খাঁ বললেন, 'মনে হচ্ছে দেখেছি—'

'তাহলে সে-ই। ইমতিয়াজ খাঁ, নবাব শাহ নওয়াজ খাঁ কোথায়?'

ইমতিয়াজ খাঁ বললে, 'গতকাল সন্ধ্যাবেলা পিতা বজরায় সপ্তগ্রাম ত্যাগ করেছিলেন, তারপর আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমি সেজন্যে চিন্তিত—'

রাধানাথ বললেন, 'বন্দরের দারোগা সংবাদ দিয়েছে যে গতকাল সমস্ত

রাত্রি কোনো নৌকো বা বজরা হুগলী থেকে সপ্তগ্রামের দিকে আসেনি—'

'তার মানে যে বজরা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছিল সেটাও ফেরেনি। তাই না?'

অশ্বস্তির সঙ্গে সকলে চুপ করে রইল।

'হুম।' যেন হুংকার ছাড়লেন সৌকত আলী খাঁ ঃ 'রাধানাথ, তুমি নাওয়ারার একখানি কোশা নিয়ে দক্ষিণদিকে চলে যাও, খুঁজে দেখ সপ্তগ্রাম অবধি শাহ নওয়াজ খাঁর বজরা কোথাও আছে কিনা? ইমতিয়াজ খাঁ, তুমি ত্রিবেণীর বন্দরে গিয়ে নাওয়ারার যে কখানা ছিপ ও কোশা পাবে সেগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখো—দরকার হলে আজই হুগলী আক্রমণ করব। বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে—'

ইমতিয়াজ খাঁ বললে, 'পিতাকে আমি নিষেধ করেছিলাম বাড়ি থেকে বেরুতে। তিনি বলেছিলেন যাব আর আসব। বজরায় কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাত্রে ফেরেননি আমার আশঙ্কা হয়—'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'এক প্রহরের মধ্যে হুগলী আক্রমণ করব। সর্বেশ্বর, তোমার সেনা প্রস্তুত আছে?'

সর্বেশ্বর বললেন, 'আমার সেনা সারারাত্রি সপ্তগ্রাম পাহারা দিয়েছে, কেউ বাড়ি ফিরে যায়নি। তৈরি তারা। দেরি হবে হয়ত ফৌজদারী আহদী সেনার প্রস্তুত হতে— '

'আবুতোয়াব খাঁ, আপনার সেনা কী প্রস্তুত নেই?'

আবুতোয়াব খাঁ বললেন, 'এক প্রহরের মধ্যে যাত্রার জন্যে তারা তৈরি হতে পারবে—'

'ঠিক?'

'আশা করি—'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'আমাদের সমস্তই আছে, নেই কেবল তোপ। রামতারণ মজুমদারের সঙ্গে নাওয়ারা যদি জাহাঙ্গীরনগরে না পাঠিয়ে দিতাম তাহলে হয়ত সপ্তাহ কালের মধ্যে হুগলী দুর্গ অধিকার করা যেত। কেল্লা দখলের উপযোগী একটি তোপও নেই—'

সর্বেশ্বর বললেন, 'অসুবিধা হবে বটে কিন্তু একটা সুবিধার কথা ভেবে দেখেছেন কী? এক বছর গঙ্গার জল বাড়েনি—ফিরিঙ্গির সব জাহাজ আটকে থাকবে হিজলীতে। একটাও আসতে পারবে না। এটা কী কম লাভ?'

'তা বটে। তাহলে—'

হরকরা আবার এসে দাঁড়াল কুর্নিশ ঠুকে। বিরক্ত হলেন সৌকত আলী খাঁ। বললেন, 'কী সংবাদ?'

হরকরা জানাল, জাহাঙ্গীরনগর থেকে দেওয়ান রামতারণ মজুমদার এসেছেন, তিনি এখনই সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

'এত জরুরী?' সৌকত আলী খাঁ ঈষৎ বিচলিত। বললেন, 'ইমতিয়াজ খাঁ, দেওয়ান রামতারণ মজুমদার, সেহ্‌হাজারী মনসবদার, তুমি কুলিমুল্লা খাঁর তরফ থেকে তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো। দেখো যেন ত্রুটি না হয়। যাও—'

হরকরা ও ইমতিয়াজ খাঁ চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরে সুবা বাঙলার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান রামতারণ মজুমদার দেখা দিলেন।

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'আসুন, আসুন দেওয়ান-সায়েব। কী খবর বলুন?'

দেওয়ান রামতারণ অভিবাদন করে বললেন, 'জনাবে আলি, খবরটা খুবই জরুরী। তাই অসময়ে বিরক্ত করতে এলুম। অপরাধ নেবেন না--'

'সে কী কথা।' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সৌকত আলী খাঁ ঃ 'আপনার প্রত্যাগমনের জন্যে আমি পথ চেয়েছিলুম। বলুন, জাহাঙ্গীরনগর থেকে কী সংবাদ এনেছেন?'

'সেকথা বলতেই আমি এসেছি। একই সঙ্গে দুঃখ ও আনন্দের সংবাদ।' দেওয়ান রামতারণের কণ্ঠস্বর বেশ রহস্যময় ঃ 'দুঃখের সংবাদ এই যে নবাব-নাজিম নবাব মোকরম খাঁ ফৌত হয়েছেন আর আনন্দের কথা এই যে, শাহানশাহ বাদশাহের আদেশ অনুযায়ী ইক্‌লিম্‌ যতদিন না বাঙলায় পৌঁছায় ততদিন আপনিই সুবা বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার—'

বলে পুনরায় অভিবাদন জানালেন দেওয়ান রামতারণ মজুমদার।

'আমি!' বিস্ময় সচকিত হয়ে উঠলেন সৌকত আলী খাঁ ঃ 'সে কী! আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কী ছিল না?'

দেওয়ানের সবিনয় নিবেদন ঃ 'আমি অন্তত জানিনে—'

'হুঁ।' সৌকত আলী খাঁ জানতে চাইলেন, 'নাজিম-নবাব মোকরম খাঁ ফৌত হলেন কী ভাবে?'

'সফরে বেরিয়েছিলেন বজরায়', দেওয়ান তেমনি বিনয়ী ঃ 'হঠাৎ ঝড় উঠে বজরা মারা গিয়েছে—'

'উড়িষ্যার বা বিহারের ফৌজদার এ সংবাদ জানে?'

'তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন—'

'তাঁদের কাউকে সুবাদার করলে কী ভাল হত না?'

দেওয়ান বুঝতে পারলেন এই আকস্মিক পত্রপ্রাপ্তিতে সৌকত আলী খাঁ বিচলিত। তাঁর মনের সংশয় কাটাবার জন্যে তিনি বললেন, 'আপনি অনাবশ্যক

কুণ্ঠিত হচ্ছেন জনাবে আলী। এ নির্বাচনে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন সুবা বাঙলা বিহার উড়িষ্যায় পঞ্চ হাজারী মনসবদার একা আপনিই— আপনার দাবি সর্বাগ্রগণ্য—'

'ভেবেচিন্তে যখন এসেছেন, আমি আর কী বলব?'

দেওয়ান বিনীত হেসে বললেন, 'আপনাকে আর একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে, জনাবে আলী—'

'বলুন দেওয়ানজী।'

দেওয়ান বললেন, 'অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার অনুমতি দিন—'

'বেশ!'

তখন দেওয়ানজীর আদেশে নিয়ে আসা হল সুবাদারের স্বীকৃতি চিহ্নস্বরূপ ছত্র ও নিশান, আশা সোটা ও দুর্বাশ, মহি ও মরাতব প্রভৃতি রাজপ্রতীকগুলি। গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল পরিবেশ। সুবাদার বরণ-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবার পর যে কাজটুকু বাকি ছিল সেটাও সেরে ফেললেন দেওয়ান রামতারণ মজুমদার। নবাব সৌকত আলী খাঁর নাজিমী গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেন উড়িষ্যা, জহাঙ্গীরনগর, সপ্তগ্রাম ও পাটনার নায়েব-নাজিমদের উদ্দেশ্যে—নিচে নামসহি ও শীলমোহর করে দিলেন। অনুরূপ পত্র পাঠালেন বাদশাহের দরবারে একখানি। তাঁর কাজ শেষ।

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'দেওয়ানজী, আপনি যদি নাজিমী না এনে নাওয়ারার একখানা গরাব বা দুটো বড় তোপ আনতেন তাহলে যথার্থ খুশি হতাম—আমি এখন হুগলী আক্রমণ করতে যাচ্ছি—'

'তাড়াতাড়িতে আমি একাই চলে এসেছি, গরাব আর তোপ রেখে এসেছি জহাঙ্গীরনগরে।'

রামতারণের কণ্ঠে ঔৎসুক্য : 'কিন্তু হুগলী আক্রমণ করতে যাচ্ছেন কেন হুজুর?'

'তিনদিন পূর্বে হুগলীর ফিরিঙ্গিরা সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেছিল, বহুকষ্টে বাদশাহী বন্দর রক্ষা করেছি।' সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'ওদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা নবাব শাহ নওয়াজ খাঁ বজরায় সফর করতে বেরিয়েছিলেন, তিনি আর ফিরে আসেননি—'

'বলেন কী!'

'সম্ভবত ফিরিঙ্গি হার্মাদ তাঁর বজরা মেরেছে এবং তাঁকে বন্দী করেছে—'

'কিন্তু এই অল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে—'

'তা বলে চুপ করে বসে থাকতে পারিনে!'

রামতারণ বুঝতে পারলেন বাধা দিয়ে লাভ নেই। আয়োজন সম্পূর্ণ। সবাই অল্পবিস্তর উত্তেজিত।

বললেন, 'এবার হুজুর যখন স্বয়ং নিজাম হয়েছেন তখন বাঙলা মুলুক হার্মাদদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে—'

'দেওয়ান, যে কদিন আমি নাজিম থাকব সে কদিন হার্মাদদের অত্যাচার নিবারণ করব বটে', সৌকত আলী খাঁ সামান্য দ্বিধান্বিত : 'কিন্তু একা আমি কতখানি পারব? আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আর পর্তুগীজেরা অমিত শক্তিধর। সবই নির্ভর করছে খোদাতালার ইচ্ছা আর শাহানশাহ বাদশাহের মর্জির ওপর। শাহানশাহ যদি—'

'তাঁর সাহায্য পেতে হলে দরবারে যেতে হয়।' 'তাই ভাবছি—'

এমন সময় দুর্গের তোরণে বেজে উঠল দামামা, ফৌজদারী আহদীসেনা বেরিয়ে এল সজ্জিত হয়ে। সবার অগ্রভাগে সেনানায়ক আবুতোরাব খাঁ।

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'দেওয়ানজি, আপনি বিশ্রাম করুন। ওরা বেরিয়ে পড়েছে আমি চলি—'

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'যদি হুগলী থেকে ফিরে আসি তাহলে জহাঙ্গীরনগর যাব। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি এখানে থাকুন—'

কিন্তু, হুগলী পর্যন্ত যেতে হল না তাঁদের। যে কারণে হুগলী যাচ্ছিলেন সে প্রয়োজন মিটে গেল পথের মাঝেই। হকিম ইমামুদ্দীন খাঁ পরিবেশিত সংবাদের পরবর্তী অংশ তাঁরা শুনলেন যাত্রা করার কিছু পরে। দুর্গ হতে বেরিয়ে এসেছিলেন সৌকত আলী খাঁ, আবু-তোয়াব খাঁ, সর্বেশ্বর সেন প্রভৃতি প্রধানগণ। রাজপথে ক'পা এগিয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনী। সৌকত আলী খাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ ধীবর। বিপর্যস্ত সাজপোশাক—বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কোনো কারণে বিশেষ বিচলিত।

আহদীরা তাড়িয়ে দিচ্ছিল, সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'আসতে দাও, কী বলতে চায় শুনি—'

আশ্বাস পেয়ে বৃদ্ধ অগ্রসর হল, কাছে এসে ঠাহর করে দেখতে লাগল। বললে, 'হুজুর, আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখতে পাইনে। রণ-সাগরের স্বর্গীয় মহারাজ চন্দ্রকান্তর পুত্রের নৌকোয় আমি ছিলাম—বড় বিপদে পড়ে আপনার নিকটে এসেছি—'

সৌকত আলী খাঁ শুধালেন, 'তুমি কী তবে সূর্যকান্তর নৌকোয় ছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' উত্তর দেবার পূর্বে রাঘব আর-একবার সৌকত আলী খাঁর মুখের পানে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'হুজুর, আমার বয়স হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি তেমন প্রখর নয়, আমার অপরাধ নেবেন না। আপনি কী সৌকত আলী খাঁ? পিপলী ও আকবরনগরের যুদ্ধে আপনাকে যেন দেখেছি—'

তিনি হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছো। আমি সেই সৌকত আলী খাঁ-ই বটে। তোমার চোখের ভুল হয়নি।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। হুজুর, ওদিকে সর্বনাশ হতে চলেছে—'

'খুলে বলো, সংক্ষেপে বলো। আমাদের সময় বড় অল্প।'

'তাই বলছি হুজুর। সংক্ষেপেই বলব—'

রাঘব তখন রাঙামাটির ঘাট হতে ইন্দিরা-হরণের কাহিনী, সূর্যকান্তর যাত্রা প্রভৃতি বলে গেল অল্প কথায়। শেষে বললে, 'সেই বুড়ো আমীরের নৌকো থেকে মহারাজ যখন আমাকে ডাকলেন তখনই হার্মাদের গোলা বজরা ও আমাদের নৌকো ডুবিয়ে দিলে। আমাদের নৌকোর ভটচায মশায়, এক বৈরাগী ও দু-তিনজন লোক ধরা পড়েছিল, কিন্তু বন্দী হয়েছে বজরার সবাই—'

এ রকমই তিনি অনুমান করেছিলেন। তবু ভেবে পাচ্ছিলেন না সপ্তগ্রামের নিরাপদ বন্দর ছেড়ে বজরা অতদূরে গেল কেন? জিজ্ঞেস করলেন, 'বজরা হুগলীতে গেল কেন জানো?'

রাঘব বললে, 'হার্মাদদের ছিপ ধরে নিয়ে গিয়েছিল হুজুর—'

'তোমরা তখন কোথায়?'

'আমরা আগেই হুগলী পৌঁছে গিয়েছিলাম।' রাঘব বললে, 'পথে ওঁদের বজরার সাথে সাক্ষাৎ—ওঁরা তখন ফিরছিলেন। তাই অবাক হয়েছিলুম হুগলীর ঘাটে ওঁদের দেখে। হার্মাদদের ছিপ ওঁদের ধরে এনেছিল—'

'আবুতোয়াব খাঁ, সবই শনুলে, তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, এখন হুগলী আক্রমণ ব্যতীত কোনো উপায় নেই।'

'হুজুর, আমরা তো বেরিয়েই পড়েছি—'

'হ্যাঁ, চলো।'

বাহিনী চলতে আরম্ভ করল।

কিছুদূর আসার পর সৌকত আলী খাঁ ডাকলেন, 'আবু তোয়াব খাঁ—'

আবুতোয়াব খাঁ নির্দেশমতো তাকিয়ে দেখলেন, দূরে এক বৃদ্ধ মুসলমান মন্থরপদে হাঁটছেন—এগিয়ে আসছেন এদিকেই। চেনা-চেনা বটে। বৃদ্ধ মুসলমান আরও নিকটবর্তী হলেন। আবুতোয়াব খাঁ ফিসফিসিয়ে বললে, 'হুজুর নবাব শাহনওয়াজ খাঁ—'

'শোভান আল্লা, তিনি যে ছাড়া পেয়েছেন তা দেখছি। কিন্তু ব্যাপার কী বল তো?'

আবুতোয়াব খাঁ বললে, 'সে কথা ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি তো এসেই গেছেন—'

ইমতিয়াজ খাঁ ছিল পেছনে। সে দ্রুতপদে এগিয়ে পিতাকে অভ্যর্থনা করল।

শাহনওয়াজ খাঁ কাছে এসে গেলেন। কেউ কোনো কথা বলার আগেই তিনি বললেন, আমীরলাল ডি ক্রুজ ছেড়ে দিয়েছেন—'

'কারণ?'

'জানি না—'

'সবাই ছাড়া পেয়েছে?'

'সবাই—'

'ইমতিয়াজ খাঁ, তোমার পিতাকে গৃহে নিয়ে যাও। আমরা যুদ্ধে যাব না এখন। আবুতোয়াব খাঁ, দুর্গে ফিরে চলো—'

সৌকত আলী খাঁ দুর্গে ফিরে এলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

দিন দুই পরে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠল সূর্যকান্ত। প্রাণ ঢেলে সেবা করল ইন্দিরা। সব সময় সে কক্ষে আছে। রাত্রেও। সূর্যকান্তর শিয়রে মৃদু জ্যোতি তেলের প্রদীপ জ্বালা থাকত একটা, শিখা ছোট হয়ে এলে সেটা বাড়িয়ে দিত, শিয়রে দাঁড়িয়ে অপলকে তাকিয়ে থাকত তার ঘুমন্ত মুখের পানে। কী-এক তৃপ্তি ও পুলকে ভরে উঠত তার মন-প্রাণ। দুটো রাত তার মুখের পানে চেয়ে চেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে ইন্দিরা। গ্রাম-বালিকাসুলভ সংকোচ নেই, যেন এ তার পবিত্র কর্তব্য। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে সূর্যকান্ত তা দেখেছে, হেসে স্নিগ্ধস্বরে বলেছে, 'রাত অনেক হল, এবার তুমি ঘুমোও।'

ভ্রু-ভঙ্গি করে ইন্দিরা 'ওমা জেগে উঠলে যে! খুব হয়েছে, আমার কথা ভাবতে হবে না। তুমি ঘুমোলেই বাঁচি—' সূর্যকান্ত হাই তুলছে, 'ঘুম আসছে না।'

তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়েছে : 'কষ্ট হচ্ছে? কোথায় কষ্ট?

সূর্যকান্ত ইংগিতে বুক দেখিয়ে দিয়েছে : 'এখানে—'

তাড়াতাড়ি হাত বাড়াতে গিয়ে হাত টেনে নিয়েছে ইন্দিরা ওর চোখের পানে চেয়ে : 'দুষ্টুমি হচ্ছে? হকিম বলেছে এখন তোমার পূর্ণ বিশ্রাম—'

'শুয়ে শুয়ে গায়ে-পায়ে ব্যথা ধরে গেল।'

'উঠে বসবে?'

'মন্দ হয় না। বাইরে চাঁদের আলো, কী সুন্দর জ্যোৎস্না—'

ইন্দিরা সাহায্য করেছে। পিঠের নিচে বালিস দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসিয়ে

'অনেকটা ভাল মনে হচ্ছে। শিগগির সেরে উঠব আমি —'

সূর্যকান্ত বলেছে বসবে।

'না-সারলে ছাড়ছে কে?' ঝুঁকে নেড়ে চেড়ে ঠিক করে বসিয়েছে ইন্দিরা: 'দিনরাত ঠাকুরের কাছে মানত করছি—'

সূর্যকান্ত তাকে বাহুবন্দী করে ফেলেছে: 'আমি সেরে উঠলে তোমার লাভ?'

'কচু।' আলগা বাঁধন খুলে সরে গিয়ে হেসে উঠেছে ইন্দিরা।

'মনে থাকে যেন।'

'থাকবে থাকবে থাকবে—'

ইন্দিরার টলটলে হাসিভরা ঠোঁট দুখানিতে পরম নির্ভরতা।

কিন্তু হাসতে পারল না সূর্যকান্ত। বললে, 'রঙ্গময়ি, এত কৌতুক ভাল নয়। আমার ভাবনা হচ্ছে। সেরে ওঠার পর কী হবে, কোথায় যাব, তা কী ভেবে দেখেছো?'

'বয়েই গেল—'

ইন্দিরার স্বরে তেমনি লঘুতা।

'বড় যে আত্মবিশ্বাস!'

'আমার আবার কিসের ভাবনা?' ইন্দিরা সহজ স্বরে বললে, 'তুমি যেখানে,আমিও সেখানে। ভাবতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'দুদিন ধরে কেবলই ভাবছি। আমার ঘুম হয় না এ কারণে। বাস্তবিক—'

'কিছু ভাবতে হবে না। মধুসূদনের কৃপায় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। অনেকক্ষণ বসে আছো, শুয়ে পড়ো এবার।' মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দিরা।

'তুমি খুব ঈশ্বর বিশ্বাস করো, তাই না?'

ক্লান্ত চোখে তাকাল সূর্যকান্ত।

'বা, তিনি ছাড়া মানুষের গতি আছে নাকি—'

সূর্যকান্ত বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, 'এক এক সময় তাই মনে হয়!' বলে চোখ বুজলে।

বৈষ্ণবী মনোরমা খুশি হয়েছিল ইন্দিরার স্মৃতি ফিরে আসায়। সে লক্ষ্য করছিল ইন্দিরার চালচলন, হাবভাব। একেবারে স্বাভাবিক। কোন বৈষম্য নেই। চারুদর্শনা, স্বভাব-সুন্দরী। পাগলিনী অবস্থায় তাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে কেমন একটা মমতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, শূন্য কুটীর যেন ভরে উঠেছিল ওর কলহাস্যে, দুপদাপ পদশব্দে। বহুদিনের তৃষিত বাৎসল্য যেন উছলে উঠত তাতে। নিঃসঙ্গ জীবনে একটা মস্ত অবলম্বন হয়ে উঠেছিল পাগলী মেয়েটা। মনেপ্রাণে তার স্মৃতি সুস্থতা কামনা করেছিল, এ-বয়স এ-যৌবন যেন বৃথা না যায় ওর। আহা সেরে উঠুক, যাদের কন্যা ফিরে যাক তাদের সংসারে। সুখী হোক। —এখন সেরে উঠেছে উন্দিরা। সেরে উঠেছে ওই আহত যুবকের আগমনের পর থেকেই।

খুলে গেছে স্মৃতির দুয়ার। আনন্দের কথা। কিন্তু তাদের দুজনের সম্পর্ক সঠিক অনুধাবন করা যাচ্ছে না। যুবক ইন্দিরার কে?

প্রাণপাত পরিশ্রম করে যুবকের সেবা করে যাচ্ছে ইন্দিরা। যেন সে তার পরমাত্মীয়। ঘর হতে বার হয় না মোটে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলেছে। আহারের সময় ডাকের পর ডাক দিয়ে বার করে আনতে হয় ঘর হতে, গোগ্রাসে গিলে আবার ঢোকে ঘরে। কথা বলার অবকাশই মেলে না। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এতে সুবিধা হয়েছে এই যে পাগলিনীর সুস্থতার সংবাদ জানে না কেউ—প্রতিবেশিনীরা সেদিনের তাড়া খাওয়ার পর আসেনি আর। সামলে রাখতে হবে ইন্দিরাকে, কেউ যেন টের না পায় সে সেরে উঠেছে। বেশিদিন থাকা যাবে না ওকে নিয়ে এখানে। কখন্ কী ঘটে বলা যায় না—চারিদিকে শয়তানের সহস্র চক্ষু—

'আজ কেমন আছ মা?'

সকালবেলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল মনোরমা।

পাখা-হাতে সূর্যকান্তর শিয়রে বসেছিল ইন্দিরা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চুপ্! আস্তে মা। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, এইমাত্র ঘুমোলেন—'

'কিন্তু তুই নিজের পানে তাকিয়ে দেখেছিস? দুদিনে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেলি!'

'তা হোক। আবার ঠিক হয়ে যাবে—'

'তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব মা?'

'নিশ্চয় করবে—'

তোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় উনি তোর কত কালের চেনা মানুষ। মনোরমা বললে, 'জানতে ইচ্ছা হয় উনি কী জামাই?'

ইন্দিরার মুখে রক্তের ছোপ লাগল। সে আঁচল টেনে জিব কাটল : 'ছি, তা কেন? উনি রণসাগরের রাজার ছেলে আর আমি গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। রাঙামাটির ঘাটে যখন আমাকে হার্মাদেরা ধরে তখন উনি নৌকোয় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গিয়েছিল—'

মনোরমা বললে, 'তবে যে তুই ওকে ঘরে নিয়ে এলি? দেখে যে আনন্দে একেবারে আটখানা হলি?'

'আঃ মা আস্তে। ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে—'

লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল ইন্দিরা।

মনোরমা বললে, 'তোর ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝি না বাপু। শেষে—'

'মাগো!' কাতর মিনিত জানাল ইন্দিরা।

সূর্যকান্তর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওদের ফিসফিস কতাবার্তায়। সব কথাই সে শুনেছে চুপ করে শুয়ে থেকে। বুঝতে পারল আশ্রয়দাত্রীর মনে সংশয় দেখা

দিয়েছে, অন্ততঃ হুগলীতে তার উপস্থিতির কারণ নির্দেশ না করলে ইন্দিরা আরও বিব্রত হবে এবং আশ্রয়-দাত্রীর মন কুটিল হয়ে উঠবে। ইন্দিরাও জানেনা সে কীভাবে হুগলী এসেছে এবং তার হরণের পর কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটেছে। আত্মপরিচয় যখন সে দিয়েছে, বাকিটুকু প্রকাশ করা দরকার।

চৌকির ওপর উঠে বসল সূর্যকান্ত। দেওয়ালে ঠেস দিল। ধীরে ধীরে বলে গেল ইন্দিরা-হরণের পরবর্তী অংশ। কোনো কথাই অব্যক্ত রাখল না।

যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা ও ফিরিঙ্গি-অত্যাচারের কাহিনী শুনে ইন্দিরা শিউরে উঠল।

সে মনোরমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। আপনা থেকে কখন মনোরমার হাত জড়িয়ে ধরেছে খেয়াল করেনি। মনোরমা বললে, 'ইন্দিরা, রাধাবিনোদ রক্ষা করেছেন। ফিরিঙ্গির হাতে পড়ে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে তারা দয়া করে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তা না হলে—'

ইন্দিরা আবার শিউরে উঠল।

বললে, 'আচ্ছা মা, তুমি পেলে কোথায়?'

'কপাল।' মনোরমা বললে, 'হুগলীর পথে পাগলিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি এনেছিলাম। আসতে কী চাও? কতরকম লোভ দেখিয়ে—'

'পাগলের অভিনয় করতে করতে সত্যি তাহলে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—' আশ্চর্য! ইন্দিরা বললে একটু থেমে, 'তুমি অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছো। কিন্তু মা, তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে হয়। তুমি এখানে এলে কী করে?'

মনোরমা বললে, 'সেই পুরনো কাসুন্দি মা। শুনে কী হবে? প্রায় চোদ্দ বছর আগেকার কথা। ফিরিঙ্গি মুখপোড়ার দল গ্রামে হামলা করে ধরে এনেছিল আমাদের দু'বোনকে। আমি বালবিধবা আর আমাব বোনের তখন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। সে তোমার মতোই সুন্দরী ছিল—টনটনে নীতিজ্ঞান। আত্মহত্যা করে সে স্বর্গে গেছে মা। আমার সাহস ছিল না তাই পাপের পসরা এই দেহখানা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি—'

গলা ধরে এল, মনোরমা চুপ করল আত্মগ্লানিতে।

ইন্দিরা বললে কিছু পরে: 'মা, আমি এখন কী করব?'

'এখানে থাকা নিরাপদ নয়।' মনোরমা বললে, 'এখন তোমার জ্ঞান হয়েছে, ফিরিঙ্গিরা জানতে পারলে ধরে নিয়ে যেতে পারে—ওদের গুণে ঘাট নেই। মেয়েমানুষের ওপর বড় লোভ—'

'তাহলে?' ইন্দিরা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'পালাতে হবে এখান থেকে—'

'কোথায় যাব?'

'ভাবতে হবে।' মনোরমা সূর্যকান্তর উদ্দেশ্যে বললে, 'দেখ বাবা, তুমি ইন্দিরার জন্যে অনেক করেছো। আরেকটু উপকার করো। আমি বলি কি, তুমি ওকে নিয়ে রাঙামাটি চলে যাও—'

সূর্যকান্ত বললে, 'আমি সেরে উঠলেই যা-হোক একটা ব্যবস্থা করব।'

'ওর বাবার কাছে পৌছে দেওয়াই ভাল। তিনি হয়ত—'

ইন্দিরা মৃদুস্বরে বললে, 'মা, তিনি কী আমাকে গৃহে স্থান দিতে ভরসা পাবেন? সেখানকার সমাজ-কর্তাদের তো আমি চিনি। ভবতোষ ভট্চায, বাচস্পতি ঠাকুর, তারিণী চাটুজ্জেরা আছেন। তাঁরা কী নিশ্চিন্তে থাকতে দেবেন?'

'তা বটে।' মনোরমা বললে, 'তাই তো! তাহলে উপায়?'

সূর্যকান্ত সে-কথাই ভাবছিল।

মনোরমা বললে, 'আচ্ছা বাবা তুমি যখন ওকে উদ্ধার করতে এসেছিলে তখন কী ঐ বিষয়ে কিছু চিন্তা করেছিলে? এটা লজ্জার সময় নয়। সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল—'

'এসব কথা একবারও আমার মনে হয়নি।' সূর্যকান্ত বললে, 'বিপন্ন দেখে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম, পরের কথা আদৌ চিন্তা করিনি।'

'তা ঠিক। বিপদের সময় অত কথা কেউ ভাবে না।' মনোরমা চিন্তা করেছিল, বললে, 'দেখ বাবা, ইন্দিরা যখন আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে—ওকে ফেলে দিতে পারিনে। এখানে থাকলেও রক্ষা করতে পারব কিনা সন্দেহ, ভাবছি, চলে গেলে কেমন হয়?' 'কোথায় যাবেন? এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে ফিরিঙ্গির ভয় নেই।' মনোরমা বললে 'একটি জায়গাই আছে। সে- জায়গা হল, আগ্রা। সেখানে যেতে পারলে—'

সূর্যকান্ত বললে, 'খুব ভাল হয়।'

'তুমি কী আমাদের সঙ্গে যাবে?'

সূর্যকান্ত বললে, 'নিশ্চয় যাব।'

'বেশ। তবে আমি উদ্যোগ-আয়োজন করি—'

আরও দুদিন কাটল। সূর্যকান্ত সুস্থ হয়ে উঠল। তখন এক নিশীথরাত্রে কুটীরদ্বার রুদ্ধ করে তিনজনে গোপনে বেরিয়ে পড়ল আগ্রার উদ্দেশে।

যাত্রার আর একটি আয়োজন শুরু হল অন্যদিক থেকেও। সেটা আরও দিন দুই পরে।

রাঘবের মুখে সূর্যকান্তর বিপর্যয়-সংবাদ শুনে নাজিম সৌকত আলী খাঁ ফৌজদারী সেপাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হুগলী—অপরদিকে পুরোহিত গঙ্গাকিশোর

ভট্টাচার্যও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। রাঘবকে নাজিম-সকাশে পাঠিয়ে নিজে বেরিয়ে পড়েছিলেন সূর্যকান্তর খোঁজে। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল সামান্য। সূর্যকান্ত তার আগের দিন বেরিয়ে পড়েছে হুগলী থেকে—চলে গেছে বহুদূর।

সাক্ষাৎ না পেয়ে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও ফৌজদারী সেপাই একই সঙ্গে ফিরে এল সপ্তগ্রামে। সৌকত আলী খাঁ উদ্বিগ্ন ছিলেন সংবাদের জন্যে। গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন তখন তিনি আলোচনা করছিলেন শাহনওয়াজ খাঁ ও আবুতোয়াব খাঁর সঙ্গে। ব্রাহ্মণকে দেখে তিনি উন্মুখ হলেন। চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা ঘনিয়ে উঠল! ব্রাহ্মণ অভিবাদন করে জানালেন যে সংবাদ পেতে একটু বিলম্ব হয়েছে, তবে সূর্যকান্ত জীবিত আছেন। গদাধর গোস্বামীর কন্যা ও তিনি মনোরমা বৈষ্ণবীর কুটীরে আশ্রয় পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পূর্বদিন রাত্রে মনোরমা তাদের নিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানতে পারেনি—তারা হুগলীতে নেই—'

'হুঁ।' সংবাদ শুনে বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করতে লাগলেন সৌকত আলী খাঁ।

বহুক্ষণ নীরব চিন্তার পর তিনি বললেন, 'নবাব, একটা কথা বলব?'

'বলুন—'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'আপনি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আমি বলি, আপনি বাদশাহের দরবারে ফিরে যান—'

'একা যাব?'

'তা কেন? আপনার পুত্র ইমতিয়াজ খাঁও যাবে—'

'আপনি?'

'যাবার ইচ্ছা প্রবল। কিন্তু', সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'নাজিমের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েছে। কত গুরুতর দায়িত্ব তা তো বোঝেন। শাহানশাহ বাদশাহের আদেশ, অপর কেউ যতক্ষণ বাঙলার নাজিম নিযুক্ত না হয় ততক্ষণ আমি জহাঙ্গীরনগরে থাকতে বাধ্য। কথা দিচ্ছি, নতুন সুবাদার এলে আমিও আকবরাবাদ যাব—তবে দেরি হবে হয়ত—'

'বেশ। আপনার আদেশ শিরোধার্য।' শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'সপ্তগ্রাম আমার এতটুকু ভাল লাগছে না। আগামী কালই আমি ও ইমতিয়াজ খাঁ সপ্তগ্রাম ত্যাগ করব।'

'আর একটা কথা—'

'আদেশ করুন।

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'চন্দ্রকান্তর যে কজন পুরাতন ভৃত্য সূর্যকান্তর সন্ধানে এখানে এসেছে, আপনি তাদের সঙ্গে নিয়ে যান, পথে মুখ্‌সুদাবাদে ছেড়ে দেবেন, তারা বাড়ি চলে যাবে। আপনার অসুবিধা হবে কী?

'কিছুমাত্র না—'

সৌকত আলী খাঁ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে বললেন, তাই করো। মিছিমিছি এখানে থেকে কী লাভ? তেমরা নবাব-সায়েবের সঙ্গে ফিরে যাও। যদি কখনও চন্দ্রকান্তর পুত্র ফিরে আসে তাহলে রণ-সাগরে খবর পাঠাব। কী বলো?

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'আপনার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে।'

'বলো—'

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বললেন, 'অন্যান্য ভৃত্যেরা ফিরুক আমার আপত্তি নেই, কিন্তু হজুর, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ জাতি হিন্দুদের মধ্যে দেওয়ানা ফকির বিশেষ। সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই। যেদিন রণসাগর পরিত্যাগ করি সেদিন রণসাগরের মাটি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যদি কখনও প্রভুপুত্রের সঙ্গে ফিরতে পারি তাহলে রণসাগরে ফিরব, নতুবা তীর্থবাসী হব। নবাবসায়েব আগ্রায় ফিরবেন, আমাদের দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে বড়ই বাধিত হই—'

'কে কে যাবে?'

'হজুর, আমি আর রাঘব—'

'তুমি আগ্রায় গিয়ে কী কবেবে?'

'কিছু না পারি, বাদশাহের দরবারে ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা নিবেদন করব—'

'নবাব সায়েব, ওরা যাবে নাকি সঙ্গে?'

'চলুক।' শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'আমিও ফিরিঙ্গি হার্মাদের অত্যাচারের সাক্ষী বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করতে চাই। এই কাফের মোল্লা আমার সঙ্গে গেলে আমার বক্তব্য আরও জোরদার হবে—'

'তা ঠিক।'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'আর-একজনকে আমার সঙ্গে দিন—'

'কার কথা বলছেন?'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'পাদ্রী যে কাফের ফকিরের ওপর পীড়ন করেছিল তাকে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়—প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি—'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'বেশ। সেও আপনার সঙ্গে যাবে। আমি বন্দোবস্ত করছি।'

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে শাহনওয়াজ খাঁ হাঁকলেন, 'গুলরুখ, মা-জননী—'

গুলরুখ সপ্তগ্রামে ফিরে, খোঁজ নিয়ে, ইমতিয়াজ খাঁর বাড়িতেই বাস করছিল। ভরসা—বৃদ্ধ নবাব শাহনওয়াজ খাঁ। বজরা নেই, যাবে কোথা? একটা

আশ্রয় চাই তো! সাকিলা বা আজমল খাঁ আপত্তি করেনি—তারা সঙ্গে আছে। হিসাবে ভুল হয়নি, নবাবের সংসারে সে কন্যা সমাদর পেয়েছে।

ডাক শুনে গুলরুখ বেরিয়ে এল।

নবাব বললেন, 'বসো মা। কথা আছে—'

গুলরুখের বুক দূর দূর করে উঠল। চারিদিকে যা দুর্যোগ—আবার কী শুনতে হয় কে জানে। সে একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'মা, আমরা আগামীকাল আগ্রা যাত্রা করব। পথে ভাবতে ভাবতে আসছিলুম তোমাকে রেখে যাব কোথায়? পরিচিত কেউ আছে কী?'

গুলরুখ বললে, 'কেউ নেই—'

'তোমার স্বামীর সন্ধান পাওনি?

'পেয়েছিলুম।' গুলরুখ মনে মনে লজ্জিত ছলনা করতে হচ্ছে বলে ঃ 'তিনি হুগলীতে এক কাফের রমণীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরে সেখান থেকে পলায়ন করে কোথায় গেছেন জানি না—'

'তোমার স্বামী কাফের ছিলেন?

'হ্যাঁ।' গুলরুখ ঢোক গিলল ঃ তিনি আমাকে বিবাহ করবার জন্যে মুসলমান হয়েছিলেন।'

'তাঁর পূর্ব পরিচয় জানো কিছু?'

গুলরুখ বলল 'না—'

'আমার মনেহয়', শাহনওয়াজ সংশয় প্রকাশ করলেন, 'তিনি সূর্যকান্ত। রাঢ় দেশের এক জমিদারের পুত্র।'

গুলরুখ কোনোমতে বললে, 'হতে পারে।'

'স্বামীর সন্ধান পাওনি, পরিচিত কেউ নেই, এ অবস্থায়—' মাথা দোলাতে লাগলেন শাহনওয়াজ খাঁ।

'আমি আপনাদের সঙ্গে আগ্রায় যাব—' গুলরুখ বলে উঠল।

'কিন্তু—'

গুলরুখ বললে, 'হ্যাঁ আগ্রায় যাব। হার্মাদের অত্যাচারে বাঙলা মুলক যে নিরাপদ নয় তা তো নিজের চোখেই দেখলেন। তাছাড়া আমি আশ্রয়হীনা অনাথিনী—একাকী বাঙলা মুলুকে অবস্থান করব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে?'

'তবে চলো। কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব—'

পরদিন সকালে রওনা হলেন শাহনওয়াজ খাঁ। সঙ্গী ইমতিয়াজ খাঁ ও তার পত্নী, গুলরুখ ও তার দাসদাসী, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, রাঘব ও নবীনদাস বৈরাগী। কখনও জলপথে কখনও হেঁটে কখনও বা উটের পিঠে। পথ তো কম না!

তাঁদের পৌঁছতে সময় নিল অনেক। দিল্লীর সিংহাসনে তখন নতুন সম্রাট। শাহজহান উপবিষ্ট হয়েছেন সগৌরবে।

॥ পনেরো ॥

যমুনাতীরে আগ্রা দুর্গের সুমুখে একজন গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ একখানি নৌকোর অগ্রভাগে বসে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। বেশ কিছুক্ষণ সে বসে আছে—মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তার চাঞ্চল্য বোঝা যাচ্ছিল যমুনার জলে পা ডোবানো আর পা তোলা থেকে। স্বচ্ছ, নীল যমুনার জলে দুখানি পা ডুবিয়ে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল আর দূরে কাউকে আসতে দেখলেই পা তুলে নিচ্ছিল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল সে কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। মাঝিরা নৌকোর অপরভাগে বিশ্রামরত।

যমুনা তখনও সরে যায়নি কেল্লার সংস্পর্শ হতে—খুব কাছেই কেল্লা। সেজন্য পথ অতি পরিষ্কার—এককণা দুলাবালি যেমন নেই তেমনি নেই একটি বৃক্ষও। ঝকঝকে পথ—রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত। রৌদ্র অতি প্রখর, অগ্নিতেজের মতো অকৃপণ ধারায় পথঘাট যেন দগ্ধ করে দিচ্ছে। যথেষ্ট বেলা হয়েছে, দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। দিল্লীর দাবদাহ সহ্য করতে না পেরে বাদশাহ তখন আগ্রায়—ফলে দুর্গের সামনে ছত্র ব্যবহার করাবর উপায় নেই। সেটা নাকি অসম্মান। যুবক মধ্যে মধ্যে রুমাল দিয়ে রৌদ্র হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল, পরক্ষণে দুর্গের পানে চেয়ে হাত নামিয়ে নিচ্ছিল। এ প্রখর রৌদ্রে অপেক্ষা করার ক্লেশ ফুটে উঠেছিল তার সুন্দর মুখে, ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল কপাল বেয়ে, বিব্রত হয়ে উঠেছিল খুব। জলে রুমাল ভিজিয়ে সে থাবড়াতে লাগল মুখে ঘাড়ে। নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'এত দেরি হচ্ছে কেন? সেই কখন্ তো গেছে! মাথার চাঁদি ফুটি-ফাটা হয়ে গেল যে—'

তবু কারো আভাসমাত্র পাওয়া গেল না। রৌদ্র তেমনি প্রখর— পথ তেমনি নির্জন। যুবক ঈষৎ বিচলিত হলো। দুর্গ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু দুর্গের ভেতরের রহস্য কেমন কে জানে। সেখানে আটকে যাওয়া বিচিত্র নয় ঃ তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ফেরার কথা ভুলে যেতে হবে। বাদশাহী সেনার মর্জি কে বলতে পারে? কিন্তু—। মন বললে, তা হতে পারে না বেগমের সাক্ষাৎ পাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই হয়ত দেরি হচ্ছে। সাধারণ লোকের সঙ্গে তো সাক্ষাৎ নয়! দেরি হওয়া স্বাভাবিক।

মন আশ্বস্ত করে সে তাকাল দূরে। দেখা গেল না কিছুই। দুর্গমধ্যে শুভ্র মর্মরনির্মিত অসংখ্য প্রাসাদশ্রেণীর অগণিত বাতায়নপথ সুবর্ণখচিত বহুবর্ণের যবনিকার দ্বারা আবৃত। সেখানে অসংখ্য মানুষ —অসংখ্য রহস্য। বাইরে থেকে

দেখে তার কণামাত্র আস্বাদ গ্রহণ করা যাবে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্গে প্রবেশই সম্ভব নয়—রহস্যের সন্ধান নেওয়া তো পরের কথা। তদুপরি বাদশাহ স্বয়ং দুর্গমধ্যে, তাঁর অবস্থিতির প্রতীকস্বরূপ হলুদ-রঙের পতাকা উড়ছে দুর্গশীর্ষে। দেখা যাচ্ছে দুর্গের চারিপার্শ্বে এক একজন সেনাপতি সহস্র হস্ত ব্যবধানে সেনানিবাস স্থাপন করেছেন, সুসজ্জিত সৈন্যগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে—একটা মশা মাছি অনুপ্রবেশেরও সুযোগ নেই! দুর্গের ভেতরে যমুনাতীরেই প্রাসাদের অন্তঃপুর— সেখানে নিশ্চয় তাতারী ও তুর্কী প্রতিহারীরা এই ভীষণ রৌদ্রে শূন্যমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে অল্প ব্যবধানে দুরূহব্যূহের মতো।... ভেতরে বাইরে এত প্রহরা ভেদ করে কে প্রবেশ করবে দুর্গে? একমাত্র সম্ভব যদি কেউ শাহীপঞ্জার অধিকারী হয়। মনোরমা-মাসিমার কাছে শাহীপঞ্জা আছে, তিনি ইতিপূর্বে বহুবার প্রাসাদ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কোনোবার তো এত দেরি হয় না! কি করছেন মাসিমা?

খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। বাসা-বাড়িতে ফিরে যেতে পারলে ভাল হত—কিন্তু মাসিমাকে একা রেখে চলে যাওয়া নিতান্ত অভদ্রতা। অথচ বাসা-বাড়িতে ইন্দিরা আছে একা এত বেলা অবধি না খেয়ে —এখানে আসার পর ইন্দিরা কোনোদিনই তার আগে আহার গ্রহণ করেনি। বলে, বুঝিয়ে, রাজী করানো যায়নি। যেন এটাই তার সর্ব-প্রধান কর্তব্য। বিয়ে হয়নি এখনও তবু বাড়াবাড়ি। সূর্যকান্ত বিরক্ত হয়েছে তার জেদে। কিন্তু ইন্দিরার সেই হাসিমুখ ঃ 'তোমাকে বকবক করতে হবে না, উপোস আমার সহ্য হয়।' তারপর বলেছে, 'তাড়াতাড়ি ফিরলেই পারো, হাঁড়ি আগলে বসে থাকি না। তোমার খাওয়া হয় আমারও খাওয়া হয়ে যায়—'

জেদ। ভীষণ জেদী মেয়ে ইন্দিরা। বোঝালেও বোঝে না। এখানে কী বেড়াতে এসেছে তারা? কাজ আছে কত। কাজ মিটিয়ে বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যাবে বইকি, সব দিন কী তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব? সব লোক কী তার প্রয়োজন-মতো হাতের কাজ যুগিয়ে রেখেছে? তদবির-তদারক নেই? মেজাজ-মর্জি বলেও একটা কথা আছে, পদস্থ কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এত সহজ কিনা! বুঝবে না, অবুঝের মতো ভাতের হাঁড়ি আগলে বসে থাকবে যতক্ষণ-না তারা ফিরছে। সেই ছবিটাই যেন দেখতে পাচ্ছে সে। ছোট বাসাবাড়ি। খড়ের চালা আর মাটির মেঝে। দরজায় খিল এঁটে মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে হয়ত ইন্দিরা, গরমে আইঢাই করছে। আর দরজায় কড়া নাড়ার অধীর প্রতীক্ষা করছে। একা আছে ঘরে। তাঁর নিঃসঙ্গতা দূরীকরণে যেন ছটফট করে উঠল মন। বাস্তবিক বড় পীড়ন হচ্ছে মেয়েটার ওপর। সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে চলে এসেছে তার সঙ্গে, রাঙা মাটিতে ফিরে গেলে কী হত বলা যায় না, আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন ছিন্ন করে

নির্ভাবনায় চলে এসেছে এতদূর। পরম নির্ভরতা তার ওপর। প্রেম ও প্রীতিতে ভরিয়ে রেখেছে সারা মন। উপযুক্ত প্রতিদান কী সে দিতে পারছে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সূর্যকান্ত। মানুষের সাধ অসীম কিন্তু শক্তি কত সীমাবদ্ধ!

যে কারণে আগ্রায় আসা তা পূর্ণ হল না আজও।— সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, আলাপ গড়ে ওঠেনি পদস্থ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে। যেন তারা অবাঞ্ছিত আগন্তুক। কারো কোনো কৌতূহল নেই তাদের প্রতি। আগ্রা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক!

সে নিজে আলাপ করতে পারেনি কারো সঙ্গে—আগ্রার পথে পথে ঘুরেছে শুধু। কেউ আমল দেয়নি। চরম নিস্পৃহতায় মুখ ঘুরিয়ে থেকেছে প্রায় প্রতিটি লোক। দু-একজনের সাথে যদি-বা কথা বলেছে, তারা গুরুত্ব দেয়নি আদৌ, আমিরী-চালে হেলেদুলে চলে গেছে নিজের কাজে। আসলে ঘুষ আর উপঢৌকন। তার পাল্লা ভারী করতে পারলে সবাই চোখ তুলে তাকাত তার দিকে, সময় করে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলত, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, অর্থের সংগতি তেমন না থাকায় প্রতিটি প্রচেষ্টাই অর্থহীন হয়ে উঠেছে, কিছুই করতে পারেনি সূর্যকান্ত। তখন এগিয়ে এসেছে মনোরমা-মাসিমা। সূচের কাজে তার হাত বরাবরই বেশ ভাল, তদপুরি সহযোগিতা করেছে ইন্দিরা, সেগুলোই রয়েছে সহায়। প্রাসাদ-অন্তপুরে প্রবেশের পথ খুলে গেছে। মনোরমা-মাসিমা সূচের কাজ নিয়ে প্রায়ই আসে বিক্রির জন্যে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজ-মহিষীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে, আলাপ জমায় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিয়ে ফিরে আসে। সূর্যকান্ত সঙ্গে আসে প্রতিবারই। কিন্তু এত দেরি হয় না কোনোদিন। মনোরমা-মাসিমা বাড়ি ফেরার কথা ভুলে গেল নাকি?

বিরক্তি জাগছিল গরমের জন্যেই—হঠাৎ মনে হল যমুনার জল নীল হয়ে উঠেছে আরও— কেউ যেন এক প্রকাণ্ড ছত্র মেলে ধরেছে যমুনার বুকে। কেমন স্নিগ্ধ আর ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। সূর্যকান্ত তাকিয়ে দেখল, আকাশে প্রকাণ্ড কালো মেঘ। শ্রাবণ মাস, সূর্যতাপ দমিত করে ঈশান কোণে বেরিয়ে পড়েছে শ্যামল-সুন্দর মেঘের রাশি। গড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। ছায়া পড়েছে দুর্গের শিরেও। সশস্ত্র প্রহরীদের কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে মুছে নিচ্ছে কপালের ঘাম— যেন সেলাম জানাচ্ছে আল্লার দয়ার উদ্দেশ্যে। বাস্তবিক অপূর্ব স্নিগ্ধ লাগছে দীর্ঘক্ষণ রৌদ্রভোগের পর। মনে হচ্ছে ক্ষুধা তৃষ্ণা অপেক্ষা এ স্নিগ্ধতাই একান্ত কাম্য— এই ছত্র ছায়ায় অনায়াসে চোখ বুজে পড়ে থাকা যায় কিছুক্ষণ। শরীর যেন এলিয়ে পড়ছে, সূর্যকান্ত পা তুলে পাটাতনে শুয়ে পড়ল আরামের নিশ্বাস ফেলে। চোখ বুজে বললে, 'আঃ—' শিথিল হয়ে এল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নিদ্রাকর্ষণে ঝিমুতে লাগল সে।

এই সময়ে দুর্গমধ্যে জহাঙ্গীরি-মহলে সেতার বেজে উঠল। অস্পষ্ট সুর ভেসে আসতে লাগল তার কানে। মাথার ওপরে ছত্রধারী মেঘ নিচে নীল যমুনা, তন্দ্রার মধ্যে যেন স্বপ্ন নেমে এল। তার মনে হল বহুদূর গঙ্গা-যমুনা-স্বরস্বতীর সঙ্গমে সে শুয়ে আছে একখানি বজরার ভেতরে হাতির দাঁতের পালংকে, আর তার পাশে বসে সেতারে রাগসঙ্গীত বাজাচ্ছে এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী—মনপ্রাণ তৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে।....কিন্তু সে একটা স্বপ্নই। সেটা সপ্তগ্রাম আর এটা আগ্রা—সেখানকার সুখস্বপ্ন এখানকার বাস্তব আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ। তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়াও উচিত নয়। মাসিমা এসে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

সূর্যকান্ত ঝটকা মেরে উঠে বসল। মেঘ সরে যাচ্ছে—আবার দেখা দিয়েছে রোদ। চিনচিন করে উঠল মাথার ভেতরটা, রক্তে জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তবু ভেসে আসতে লাগল সেতারে আলাপ। বড় মিঠে আলাপ। ক-মুহূর্ত কান পেতে সুর অনুধাবন করল সূর্যকান্ত—বৃন্দাবনী সারঙ্। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার আরোহণ, অবরোহণ, আলাপের মাধুর্যে দগ্ধ দ্বিপ্রহর যেন রমণীয় হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহ দক্ষসেতারী।

সেতারের সুরে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সূর্যকান্ত। রাগসঙ্গীতের প্রতি তার আবাল্যের অনুরাগ। তৃষ্ণার্ত শ্রবণ সেতারে মগ্ন হয়েছিল। দৃষ্টি জহাঙ্গীরি-মহলে নিবদ্ধ। সেইমাত্র সেতার থেমেছে, দেখতে পেল জহাঙ্গীরি-মহলের একটি গবাক্ষের যবনিকা অকস্মাৎ সরে গেল, সেখানে পর পর ভেসে উঠল দুটি মুখ। হয়ত কৌতুহলবশতই গবাক্ষের যবনিকা সরে গিয়েছিল, মুহূর্তকালের জন্যে সূর্যকান্ত দেখল একজন তাতারী প্রতিহারি এবং অপরজন সুন্দরী যুবতী। সূর্যকান্তর মনে হল দ্বিতীয়ার মুখটি বড় সুন্দর, কবে কোথায় যেন দেখেছে, খুব অপরিচিত নয়। কিন্তু স্মরণে আনতে পারল না কিছুতেই। বড় আশ্চর্য মনে হল তার—বিস্ময়ে হাবুডুবু খেতে লাগল বন্ধ গবাক্ষের পানে চেয়ে। ইচ্ছা ছিল আর-একবার দেখবে কিন্তু যবনিকা উন্মোচিত হল না আর।

গালে হাত দিয়ে ভাবছিল সূর্যকান্ত। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো!'

মনোরমা ফিরে এসেছে, তার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

'নাও চলো। বড্ড দেরি হয়ে গেল—'

মনোরমা নৌকোয় উঠে বসল। সূর্যকান্ত মাঝিদের নৌকো ছেড়ে দিতে বললে।

'কী খবর মাসিমা?

নৌকো কেল্লা থেকে দূরে সরে যাবার পর জিজ্ঞেস করল সূর্যকান্ত।

'আজকের সংবাদ শুভ সূর্যকান্ত। বেগমকে রাজী করিয়েছি।' অবগুণ্ঠন

সরিয়ে হাসিমুখে তাকাল মনোরমাঃ 'দেরি হল সেজন্যে! রোদে বসে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তো?'

লজ্জিতস্বরে সূর্যকান্ত বললে, 'না না। কষ্ট আর-কি।'

'একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম বাবা, বাদশাহ-মহিষী আলিয়া বেগমের মনটা বড় নরম। ভারি ভালমানুষ—'

'কী বললেন তিনি?'

'ওঁর পিতা নবাব আসফ খাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তিনি তোমাকে দেওয়ান-ই খাসে নিয়ে যাবেন—'

'তাঁর অশেষ অনুগ্রহ।'

'এ সুযোগ অবহেলা কোরো না বাবা—'

'আমি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'তোমার একটা সুরাহা হলে ইন্দিরার দুঃখও ঘোচে—'

'তার কী খুব দুঃখ মাসিমা?'

'দুঃখ নয়? সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে যোগিনীর মতো কতদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে? একা একা দিন কাটানো মেয়েমানুষের পক্ষে যে কত কষ্ট—'

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে চলে যায় দেখে সূর্যকান্ত বললে, 'আচ্ছা মাসিমা, সৌকত আলী খাঁর কোনো সংবাদ পেলে?'

মনোরমা বললে, 'না তবে শুনলাম যে ওখানকার খাজনা নিয়ে দেওয়ান রামতারণ মজুমদার শিগগির আগ্রায় আসছেন—'

' সৌকত আলী খাঁ না এলে বাদসাহের দরবারে সুবিধা হবে কী?'

'আগে থেকে হতাশ হচ্ছ কেন? একটা পথ তো পাওয়া গেছে—'

'হ্যাঁ সে চেষ্টাই করব।'

'দেখ বাবা, একটা কথা বলি। রাগ করো না। এবার তুমি ইন্দিরাকে বিয়ে করে ফেল—'

'আমার সুরাহা হলেই বিয়ে করব মাসিমা।' সূর্যকান্ত বললে, 'তাছাড়া আর এক সমস্যা। বিয়ে করব বললেই তো বিয়ে করা যাবে না। এখানে বাঙালী পুরোহিত কোথায়?'

'বেগমের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছে।' মনোরমা বললে, 'তিনি বৃন্দাবন থেকে একজন বাঙালী গোস্বামী আনিয়ে দেবেন—'

'এত কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?'

মনোরমা বললে, 'ভারি ভালমানুষ। সব কথা শুনে তিনি তো ইন্দিরাকে দেখতে চাইলেন। আমি বলেছি বিয়ের পর নিয়ে আসব। ঠিক করিনি?'

সূর্যকান্ত দেখল পরিত্রাণের উপায় নেই। হেসে বললে, 'বেশ করেছো—'

নৌকো শহরের দিকে এগিয়ে চলল।

জহাঙ্গীরি-মহলের গবাক্ষে চকিতে-দেখা দিয়েই যে দুটি মুখ অন্তরালে চলে গেল তাদের মধ্যে দ্বিতীয়াজন আমাদের বিশেষ পরিচিত। সে গুলরুখ। আগ্রায় ফিরে এসে সে তার হৃত আসনটি পুনরুদ্ধার করেছে সম্মানের সঙ্গে নৃত্যগীতে বাদসাহের মনোহরণ করেছে এবং তাঁর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে অচিরে।

গরমের জন্যেই গবাক্ষের যবনিকা সরিয়েছিল গুলরুখ। কিন্তু যমুনাতীরে নৌকোর ওপর নজর পড়তেই সে চমকে উঠল। সপ্তগ্রামের ঘাটের দৃশ্য মনে পড়ল। হুবহু সেই যুবক। বিস্ময়ের সঙ্গে চমক। যুবক এখানে এল কী করে? ভুল দেখিনি তো! — গুলরুখ মহল-সম্মানের জন্য পরপুরুষের দৃষ্টিপথে যবনিকা টেনে দিল বটে কিন্তু মনের সংশয় কাটাতে না পেরে পাশে সরে গিয়ে যবনিকার অল্প ফাঁকে ফের দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ দেখল চেয়ে চেয়ে। কোনো ভুল নেই। সেই যুবকই বটে!—চাঞ্চল্য বোধ করল মনের মধ্যে। বক্ষ ওঠানামা করতে লাগল উত্তেজনায়। বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে সে যাবে নাকি দেখা করতে? কিংবা, গোপনে ডেকে আনবে এখানে?

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ। পরক্ষণে ভাবল, দেখা করতে গেলে বিপদ আছে। তেমনি বিপদ ওকে এখানে ডেকে আনা। চারিদিকে সহস্র চক্ষু— কখন কে দেখে ফেলবে এবং বাদশাহের কানে উঠলে দুজনের কেউই রক্ষা পাবে না। গোপন প্রেমের বহু প্রায়শ্চিত্ত মহলের পাথরে পাথরে ডুকরে কেঁদে মরছে। বাদশাহের কাছে অবৈধ প্রেমের ক্ষমা নেই। তবে কোন্ পথ?

কোন্ পথ?—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে ধিক্কার দিল গুলরুখ। ভেবে আশ্চর্য হল যে কত পুরুষ তার সঙ্গটুকু পাবার জন্যে কতভাবে লালায়িত আর সে কিনা একটা অনিচ্ছুক পুরুষের প্রণয়-প্রত্যাশায় এমন উদ্বেলিত! ধিক্ তার নারীধর্মে! ধিক্ তার রূপ-যৌবনে! ... আত্মধিক্কারের গাথে সাথে প্রাণের কী-একটি তন্ত্রী মোচড় খেয়ে উঠল। স্পষ্টতঃ তার প্রণয় প্রত্যাখান করেছে ওই উদ্ধত যুবক। দেহজ রূপ-যৌবন এতটুকু স্বীকৃতি পায়নি তার কাছে—ভুল করেও আদর-সোহাগ কিংবা ভালবাসার কথা জানায়নি। কণামাত্র প্রসাদ পেলেও বর্তে যেত গুলরুখ। পায়নি, এবং পাবে না, এটাই বুঝি তার ভাগ্য। কিন্তু ভাগ্যের হাত থেকে কী করে সুখ ছিনিয়ে নিতে হয় গুলরুখ তা জানে। জানে, প্রণয়ের দেবতা কোন্ পথে তুষ্ট হন। চিরকাল ভোগ্যবস্তু পেয়ে এসেছে গুলরুখ, যখন যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে, এটাই-বা পাবে না কেন? প্রণয়ের বাঁকাচোরা পথ তার জানা আছে।

ঠোঁট কামড়াল গুলরুখ। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল দূরবর্তী যুবকের পানে। প্রখর রোদে বসে আছে যেন অবসন্ন কামদেব। কোনো পুরুষ দেখে তার চিত্ত এত

বিচলিত হয়নি কখনও। যতবার দেখছে ততবারই এ চিত্তচাঞ্চল্য। সপ্তগ্রামে যা পাওয়া যায়নি এখানে তা পেতে হবে। এখানে তার অনেক শক্তি, অনেক প্রভাব। এখানকার নর্তকী সে। এটা আগ্রা। এখানেই সবাই তার ইচ্ছার দাস।

'কী দেখছো বিবিসায়েব?' তাতারী বাঁদীর সকৌতুক জিজ্ঞাসা।

'এদিকে আয়—'

তাতারী বাঁদী কাছে এল।

গুলরুখ বললে, 'দেখতে পাচ্ছিস?'

'একজন মেয়েলোক নাও-এ উঠছে—'

গুলরুখ বললে, 'চিনিস ওকে?'

'চেনা-চেনা লাগছে—'

গুলরুখ বললে, 'কে ও?'

'বাঙালি মেয়েলোক।' তাতারী তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ বললে, 'চিনতে পেরেছি। মেয়েলোকটি সূঁচের কাজ জানে ভাল, দুদিন অন্তর হজরত বাদশাহ বেগমের কাছে আসে—'

'নাম কী?'

'ঠিক উচ্চারণ হবে না, তবে মন্‌রোমা কি মোন্‌রামা—'

'মনোরমা নয় তো?'

উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাতারী বাঁদী, 'ওই নামই বটে। তোমার উচ্চারণ ঠিক কাফেরের মতো—'

'হবে না?' গুরুখ হেসে বললে, 'আমি যে অনেকদিন বাঙলা মুলুকে ছিলুম!'

'তুমি ওকে চেনো নাকি?'

'না। তবে চুপিচুপি একটা কথা বলি, নাও-এ যে লোকটি বসেছিল সে আমার খসম। দেখেছিস তাকে?'

'দেখলুম তো। খুবসুরত মর্দানা—'

'তোকে একটা কাজ দেব। তুই ওর সন্ধান করতে পারিস?'

'খুব পারি। এমন কী শক্ত কাজ?' তাতারী আড়চোখে চেয়ে দেখল সংবাদ-সংগ্রহের জন্যে বিবিসায়েবা রীতি মত উৎসুক, টোপ ফেলল, 'তবে ছুটি চাই আর কিছু বর্কশিস—'

'টাকার কথা ভাবিসনে, যা লাগে আমি দেব।' গুলরুখ বললে, 'ছুটির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। কিন্তু তুই কী শহরের পথঘাট চিনিস?'

'আমি চিনি না বটে তবে শহরে আমার এক দোস্ত আছে', ভুরু বাঁকিয়ে

অর্থপূর্ণ-হাসি হাসল তাতারী, ' সে আগ্রা শহরের প্রত্যেকটি লোককে চেনে। বেশ চালাক-চতুর।'

'তবে ভালই হল—'

'কিন্তু বিবিসায়েবা তার একটু ঘন ঘন তেষ্টা পায়।'

'বটে।' গুলরুখ হেসে বললে, 'ওর তেষ্টা মিটিয়ে দেব। শোন্ আমি খান্‌সামানের ওপরে হুকুম দিচ্ছি, তুই তাকে ডুবিয়ে রাখিস ইরানী আর ফিরিঙ্গি আরকে— '

তাতারী তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ সেলাম ঠুকল। বললে, 'তাহলে এক হপ্তামধ্যে বিবিসায়েবা খসমের সন্ধান পেয়ে যাবে। যাদি বলো তো ধরে আনতে পারি। আরকের অসাধ কাজ কিছু নেই।'

'পারবি?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল গুরুখের মুখ। 'আলবত।' তাতারী জোর দিল গলায়।

'তোকে খুশি করে দেব—'

'কিন্তু আনব কোথায়?'

'কেন, মহল-সরার মধ্যে।'

'এখানে?' চোখ ছানাবড়া করল তাতারী, 'তাহলে কারো মাথা আস্ত থাকবে না—'

'কেন?'

'শুনেছি নূরজহাঁ-বেগমের আমলে দু-একজন মরদ মহল-সরার ভেতরে আসত আওরাত সেজে, কেউ ধরা পড়েছে কেউ-বা পড়েনি। কিন্তু হজরত-আরজ্‌মন্দবানু বেগম-সায়েবার আমলে চারিদিকে কড়ানজর, ওভাবে কেউ এলে তার গর্দান যাবে নির্ঘাত—'

'যদি তাঁর হুকুম নিয়ে রাখি?'

'দোহাই বিবিসায়েবা, ও-কাজটি কোরো না। হিতে বিপরীত হবে। বেগম-সায়েবা তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, যাদি শোনেন তোমার খসম পালিয়েছে তাহলে তাকে বেঁধে আনবার হুকুম দেবেন, শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যাবে কথাটা। কোতোয়ালের ফৌজ সাজতে সাজতেই তোমার খসম সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যাবে। তখন তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে। হবে কিনা বলো?'

গুলরুখ স্বীকার করল সে সম্ভাবনা আছে। 'আমি বলি কি, আগের ব্যবস্থাটাই ভাল। গোপনে আমরা সন্ধান নিয়ে আসি—'

গুলরুখ বললে, 'তাই কর। বেশি দেরি করিসনে। কালই বেরিয়ে পড়বি।'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কাজ ঠিক উদ্ধার করে দেব। কিন্তু বিবিসায়েবা শরবতের কিছু খরচা আর বখশিসের কিছু আগাম না পেলে আমার দোস্ত হয়ত—'

'কত?'

'যা দেবে। দশ কি পনেরো আশরফি—'

পোড়ামুখি, অতগুলো টাকা নিয়ে কী করবি?'

'কী করব?' হেসে উঠল তাতারী : 'বেগম-সায়েবের দোয়া করব, দুই দোস্তে শরাব খাব, আর তোমার গরহাজির খসমকে সোয়াবগাহে হাজির করে দেব।'

শরাবের নেশায় জুল জুল করে উঠেছে তাতারীর রস-মদির চোখ।

গুলরুখ বললে, 'পনেরো আশরফির শরাব খাবি?'

'বিবিসায়েবা, এ তোমার কর্ম নয়, এটা আগ্রা শহর। কথায় বলে দার্-উর-মুল্ক আগ্রা।' তাতারী ঠক্কর দিতে কসুর করল না : 'বাদশাহী কেল্লায় বসে কৃপণ হলে চলবে কেন বিবিসায়েবা? যদি খসম পেতে চাও মুঠো মুঠো আশরফি ছাড়ো—'

'তা না হয় ছাড়ব', গুলরুখও বাজিয়ে দেখতে চাইল : 'কিন্তু তুই পনেরো আশরফি কী করবি তাই বল্?'

'শুনবে? তবে শোন।' আঙুলের ডগা মুড়ে মুড়ে তাতারী হিসাব দিল, 'দুটো আশরফি দোস্তকে বায়না দেব, একটা আশরফি এক বেটা ফিরিঙ্গি গোলন্দাজকে ঘুষ দিয়ে দশ কার্ফা আরক চোলাই করে নেব—তাতে আন্দাজ খরচ হবে দশ আশরফি। শহরের খরচের জন্যে রইল বাকি দুটো আশরফি—'

'মরবি, তুই মরবি—' গুলরুখ হাসতে হাসতে বললে, 'যা কাগজ নিয়ে আয়—'

তাতারী কাগজ নিয়ে এল। গুলরুখ লিখে দিল খত। বললে, 'জুম্মা মসজিদের পাশে আমার আমীল আজমল খাঁ আছে তাকে এই রোকা দিলে তুই পনেরো আশরফি পেয়ে যাবি—যা—'

'কিন্তু ছুটি?'

'কদিনের ছুটি চাস?'

'ধরো এক হপ্তা—'

'এক হপ্তা তো তুই মদই খাবি, আমার খসম খুঁজবি কখন?'

তাতারী বললে, 'বিবিসায়েবা, কাল্‌মক্ তাতারের পেটে ফিরিঙ্গির আরক যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ সে অসাধ্য সাধন করবে। কিন্তু নেশা ছুটলেই সর্বনাশ, আর নড়তে চাইবে না। আরক বেশি পায় না বলেই যত তাতার, তাতারী বাজে নেশা ধরেছে—আফিঙ ওদের শেষ করবে—'

'হাঁরে তুই কাল্‌মক্ নাকি?

তাতারী হেসে বললে, 'আমি য়াকুৎ, আমার দোস্ত কাল্‌মক—'

'বুঝেছি। এখন যা, আমি হজরত বাদশাহ বেগমকে বলে তোর ছুটি মঞ্জুর করে রাখব।'

'বহুত খুব—'

তাতারী বাঁদী সেলাম করে চলে গেল। গবাক্ষের যবনিকা সরিয়ে দিল গুলরুখ। শূন্য নদীতীর। যমুনার নীল জল কালো হয়ে উঠেছে। মেঘ করেছে। চঞ্চল মেঘের আনাগোনা আকাশে। কোথাও থমকে দাঁড়ালেই ঝড়বৃষ্টি। এ মেঘ চেনে গুলরুখ। বড় বিশ্বাসঘাতক!

॥ ষোল ॥

সূর্যকান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকেনি। যোগাযোগ স্থাপন করেছে নবাব আসফ খাঁর সঙ্গে। তিনি আশ্বাস দিয়িছেন তাকে শিগগির দরবারে নিয়ে যাবেন।

ইতিমধ্যে আসফ খাঁর পরিচয় জেনে ফেলেছিল। নানা সম্বন্ধের সূত্রে তিনি বাদশাহ শাহজহানের সাথে আবদ্ধ। প্রথমতঃ নূরজহাঁ বেগমের ভ্রাতা দ্বিতীয়তঃ বাদশাহের প্রিয়তমা পত্নী আরজ্‌মন্দ্‌বানু বেগমের পিতা অর্থাৎ শাহজাহানের শ্বশুর এবং তৃতীয়তঃ মোগল দরবারে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি। অশেষ ক্ষমতা ও প্রভাব। সূর্যকান্ত লেগে রইল তাঁর পেছনে। তিনি বললেন, 'ব্যস্ত হয়ো না সময় হলেই নিয়ে যাব তোমাকে—'

আলাপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরিচয়ে মুগ্ধ। ক্রমে তার অতীত ও বর্তমানের সব কথাই জেনে নিয়েছিলেন আসফ খাঁ।

দিন দুই। তৃতীয় দিন নবাবোচিত সাজপোশাকে ও সমারোহে তিনি চললেন দরবারে, সঙ্গে সূর্যকান্ত। বেলা প্রথম প্রহরের শেষ। সুসজ্জিত হয়ে যেন যুদ্ধে চলেছেন তিনি সামনে ও পেছনে তাঁর নিজস্ব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী, হাওদায় বসে আছেন পদোচিত মর্যাদায়। হাতির পেছনে সূর্যকান্ত—সিন্ধুদেশের সাদা রঙের একটি ঘোড়া তার বাহন। সাজেও যথোপযুক্ত ঘনঘটা, নবাবের মতো আড়ম্বরযুক্ত না হলেও তা পরিশীলিত। ধীরে ধীরে চলেছে অশ্বগতি সংহত করে। তাকিয়ে দেখছে চারিদিক।

জুম্মা মসজিদের সামনে এসে দাঁড়াল হাতি—নবাব নামলেন। মসজিদের সামনে আগ্রা দুর্গের প্রধান তোরণ, তোরণের সামনে একজন পাঁচহাজারি মন্‌সবদারের শিবির। এই শিবিরের সামনে বাদশাহ আর তাঁর পুত্রগণ ব্যতীত অন্য সকলকেই যান পরিত্যাগ করতে হয়। সূর্যকান্ত তা জানত তাই সে-ও নেমে পড়েছে নবাবের দেখাদেখি। এবার হাঁটাপথ। আসফ খাঁর সঙ্গে সে চলল এগিয়ে।

সূর্যকান্তর গতি ঈষৎ শ্লথ হয়ে গিয়েছিল কানে সুরসুধা বর্ষণ করছিল নহবত—পরিচ্ছন্ন সকালের মতো পরিচ্ছন্ন সুরে নহবত বাজছে ফটকের ওপরে

নহবতখানায়। আসফ খাঁ বললেন, 'আরে নহবত শুনে, তুমি যে নড়তে চাইছো না। পা চালিয়ে এসো। বাদশাহ যতক্ষণ দরবারে থাকেন ততক্ষণ এ নহবত বাজে দুর্গের দিল্লি ও অমর সিংহ ফটকে। এখন বাদশাহ্ দরবারে। এসো—'

চলতে লাগল সূর্যকান্ত।

দিল্লি ফটক দিয়ে ঢুকছে তারা —চলতে লাগল প্রথম চকের বাজারের ভেতর দিয়ে। রীতিমতো ভিড়। অভিজাত ঘরের খরিদ্দার। দোকানগুলোও তেমনি। চমৎকারভাবে সাজানো। বহুমূল্য মণিমুক্ত ও দূর-দুরন্ত হতে আনা মহার্ঘ জিনিসপত্রে প্রতি দোকান জমকালো। যেন এক স্বপ্নপুরী। এর বাইরে অন্য আর-এক শ্রেণীর মানুষ যে আছে, যারা উদায়াস্ত পরিশ্রম করে এবং কষ্টেক্লিষ্টে বাঁচে, তা মনেই আসে না। কারণ দু শ্রেণীর লোকের বাস আগ্রায়। একদল ধনী অন্যদল দরিদ্র—এতদিন আগ্রায় বাস করে সে তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ দেখতে পায়নি।

প্রথম চক পার হয়ে দ্বিতীয় চকে ঢুকল তারা। লাল-রঙের পাথরে তৈরি পথ। তার উভয় পার্শ্বে মোগল, আফগান, ইরানী, তাতার, রাজপুত আর ফিরিঙ্গি সেনা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন একটা বিরাট বাহিনী। সূর্যকান্ত তাকিয়ে দেখল, বাহিনীই বটে। মুক্ত তরবারি হস্তে মনসবদারগণ পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে। আসফ খাঁকে দেখে মনসবদারগণ দু'পা পিছু হটে অভিবাদন করল ; যারা আরও উচ্চপদস্থ তারা অভিবাদনের পর কাছে এসে বাদশাহের শ্বশুরের সাথে দু-একটা কথা বললে সৌজন্য-রক্ষার খাতিরে। সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে তিনি তৃতীয় চকে প্রবেশ করলেন।

এ চকের সম্মুখেও সৈন্যদের ভিড়। অম্বর ও যোধপুরের রাজপুত সেনাগণ অপেক্ষা করছে—দ্বিতীয় প্রহরে নহবত বেজে উঠলে তারা দেওয়ান-ই-আম ও মহল-সরার রক্ষা ভার নেবে। তৈরি হয়ে আছে এখন থেকেই। দুর্গের অনেকখানি ভেতরে চলে এসেছেন আসফ খাঁ। পেছন ফিরে বললেন, 'এসো—'

সূর্যকান্ত একটু পিছিয়ে পড়েছিল। সামান্য আড়ষ্ট। এ চকে প্রবেশ করে সূর্যকান্ত দেখল, দক্ষিণ দিকে শ্বেত মর্মরনির্মিত বিশাল মতি মসজিদ রৌদ্রালোকে ঝক ঝক করছে স্ফটিকের মতো। বামদিকে রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্মিত আগ্রার টাকশাল আর তার সামনেই শুভ্র ও রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্মিত গগনস্পর্শী নাকারাখানা — সেখানে বাদশাহী নাকারা বাজছে স্বর্গীয় বাদ্যের মতো। জমজমাট ব্যবস্থা। মাছির মতো ঘনবদ্ধ। এত হাতি কেন? এভাবে এক জায়গায় ঘনবদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন? আসফ খাঁ বললেন, 'আজ দরবারে বাদশাহের সামনে হাজার হাতির সেলামী হবে—'

সূর্যকান্তর তা আগেই জানা ছিল। সে অধিক কৌতুহল প্রকাশ না করে এগিয়ে চলল সাবধানে পা ফেলে—নাকারাখানার গৃহতল ও দেওয়ান-ই-আম এর

সমস্ত পথ দুধের মতো সাদা মর্মরে আচ্ছাদিত। মনে হচ্ছিল পা বুঝি পিছলে যাবে। বিব্রত হচ্ছিল বেশ। দেখতে পেল নাকারাখানার সামনে তাদের অগ্রবর্তী দরবারিগণ জুতো খুলে রাখছে এবং তা রক্ষা করার জন্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরিচারকেরা। সকলেই জুতো খুলছে। দশহাজারী মনসবদার নবাব আমিনউদ্দৌলা আসফ খাঁকে সামান্য আমীরের মতো নাকারাখানায় পাদুকা পরিত্যাগ করতে দেখে সূর্যকান্ত বিস্মিত হল। সেও জুতো খুলল। আসফ খাঁ বললেন, 'জুতো পরে এ পর্যন্ত আসা যায়। এখানে এসে সবাইকে জুতো খুলতে হয়। এই নিয়ম—'

'কেউ জুতো পরে ভেতরে যেতে পারে না?'

আসফ খাঁ বললেন, 'একমাত্র বাদশাহ আর তার পুত্রগণ ছাড়া—'ও।'

আসফ খাঁর পুত্র শায়েস্তা খাঁ দাঁড়িয়েছিলেন নাকারাখানার কাছে। তিনি খাস-চৌকির মনসবদার। পুত্র অভিবাদন করলেন—পিতা প্রত্যাভিবাদন করে অগ্রসর হলেন। সূর্যকান্ত এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। স্তম্ভিত হয়ে গেল দৃশ্যটি দেখে। সেই মুহূর্তে হাজার হাতি শুঁড় তুলেছে — একসঙ্গে সেলাম জানাচ্ছে মহামান্য বাদশাহকে মাহুতের নির্দেশে শুঁড় তুলে নতজানু হল একসঙ্গে—দূর থেকে মনে হল যেন একখানি নয়নমনোহর ছবি।

আসফ খাঁ বললেন, 'এসো। এখনি দরবার বসবে—'

নাকারাখানার সোজাসুজি লাল-রঙের পাথরে তৈরি প্রকাণ্ড চক, চকের চারিদিকে ক্ষুদ্র বারান্দা, প্রতিদিকের বারান্দায় হাজার হাত দূরে দূরে এক-একটি বারদুয়ারী— দেখাচ্ছিল অনেকটা কাছারীর মতো। এ রকম কতকগুলো বারদুয়ারী পার হতে হতে আসফ খাঁ নিজে থেকেই বললেন, 'এগুলো মনসবদারদের কাছারী। বাদশাহের কাছে যে সমস্ত মনসবদার উপস্থিত হয় তাঁদের সেনা-বাহিনী থাকে দুর্গের বাইরে—মনসবদারদের প্রায় সারাটা দিন অপেক্ষা করতে হয় দেওয়ান-ই-আমে। চকের বারান্দায় ওই খিলানগুলো এক-একজন মনসবদার পাহারার জন্যে পান এবং সারাদিন অনুচরবর্গের সঙ্গে এখানেই থাকেন। এরা প্রত্যেকেই ছয় সাত বা দশ হাজারী মনসবদার। এর চেয়ে নিচু পদের মনসবদারেরা দুর্গ-পাহারার অধিকার পান না—'

'এরা দুর্গ পাহারা দেন?

আসফ খাঁ হেসে বললেন, 'সেটা মস্ত সম্মান! যে-কেউ এ সম্মান পায় না। আমাকেও দুর্গ পাহারা দিতে হয়—'

হাজার হাতি অভিবাদন শেষ করে অমরসিংহ-ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল—পরক্ষণে নাকারাখানার তোরণ দিয়ে ঢুকতে লাগল হাজার উট। আসফ খাঁ

বললেন, 'এভাবে জীবজন্তুর শোভাযাত্রা দেখা বাদশাহের একটা শখ। তিনি দেখতে চান তাঁর প্রিয় জন্তুগুলি কী রকম যত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু উটের সারি ঢোকার আগে যেটুকু ফাঁক পাওয়া গেছে, চলো আমরা এগিয়ে যাই—'

সূর্যকান্ত নীরবে অনুসরণ করে এগোতে লাগল। চকের মাঝখানে দীর্ঘ তামার রেলিঙ—তার একদিকে লাল-পাথরে তৈরি দেওয়ান-ই-আম, অপরদিকে নাগরিকদের স্থান। দেওয়ান-ই-আম মানে সর্বসাধারণের দর্শণ-ক্ষেত্র। সূর্যকান্ত দেখল তামার রেলিঙের সামনে হাত-পঞ্চাশ প্রশস্ত যে জায়গা তার একদিকে অশ্বারোহী ও অপরদিকে পদাতিক-সেনা দাঁড়িয়ে। সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। ওরা এভাবে দাঁড়িয়ে কেন? শান্তি রক্ষা করছে নাকি? আসফ খাঁ তাই জানালেন। বললেন, 'এ কাজ খাস-চৌকির মনসবদারের। তিনি প্রতিদিন দিবসের প্রথম দুই প্রহর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচহাজার পদাতিক সৈন্য মোতায়েন করে দিল্লীশ্বরের প্রকাশ্য দরবারের শান্তি রক্ষা করেন।'

সূর্যকান্ত বলতে গেল, 'কিন্তু বাইরে—'

আসফ খাঁ বললেন, 'সেটা আরও বড় আয়োজন। দুর্গের বাইরে প্রতিদিন তৈরি থাকে হাজার অশ্বারোহী ও লক্ষ পদাতিক—'

সূর্যকান্ত বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছে। কী এলাহী কাণ্ড! আসফ খাঁ বললেন, 'এসো—'

সূর্যকান্ত দেখতে পাচ্ছিল তামার রেলিঙের অপর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় সহস্রাধিক আহদী সেনা। সকলেই সজ্জিত।

আসফ খাঁ বললেন, 'ওরা বাদশাহের দেহরক্ষী—'

সূর্যকান্ত আর বিস্ময় প্রকাশ করল না। মনে মনে বললে, যিনি অতুল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার অধিকারী তাঁর পক্ষে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। সম্রাট শাহজহান সমগ্র হিন্দুস্তানের অধীশ্বর, দু-একজন দেহরক্ষী কী শোভা পায়?

দেওয়ান-ই-আমের সিংহাসনের সামনাসামনি পথটি বেশ প্রশস্ত —তার উভয়পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন নিম্নশ্রেণীর আমীর ও মনসবদারগণ। আসফ খাঁ তাদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে শরীররক্ষী-বাহিনীর হাতায় গিয়ে পড়লেন। আহদী সেনার নায়ক অভিবাদন করে অপরিচিত সূর্যকান্তর পরিচয় জিজ্ঞসা করলেন। দু-এক কথায় পরিচয় দিলেন আসফ খাঁ—আহদী সেনানায়ক পুনরায় অভিবাদন জানালেন। এগিয়ে চললেন আসফ খাঁ।

সামনেই পড়ল দেওয়ান-ই-আম। প্রবেশ করতে হলে তিনটি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সূর্যকান্ত দেখলে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে তিনবার ভূমি স্পর্শ করে সম্মান জানালেন আসফ খাঁ। সিঁড়ির ওপরে ছাদবিহীন চত্বর, সেখানে অপেক্ষা করছেন

ভিন্ন ভিন্ন সুবাদার জমিদার ও ছোট রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ। সেখানেও হাজার আহদী পাহারা দিচ্ছে বেষ্টন করে—তাদের নায়কের কাছে পরিচয় দিয়ে আসফ খাঁ প্রবেশ করলেন দেওয়ান-ই-আমে।

তার কাছে থেকেই সূর্যকান্ত জানতে পারল, দেওয়ান-ই-আমে আছে তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে দশহাজারী মনসবদার ও সুবাদারদের স্থান—এর সীমানা রজতনির্মিত রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। দ্বিতিয় স্তরটি নির্দিষ্ট প্রধান প্রধান হিন্দুরাজা, উজির, আমীর, সিপাহশালার খানসামান, সদর-উস্-সদুর, কাজী উল্-কুদ্দৎ ও প্রধান সুবাদারদের জন্যে — এটি সুবর্ণনির্মিত রেলিঙ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৃতীয় স্তরটি আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্যে— সেখানে বাদশাহের পুত্র, জামাতা ও আত্মীয়দের স্থান, এর চতুর্দিকে আশা, সোটা, দুর্বাস, মহীমরাতবগণ দাঁড়িয়ে। প্রতি স্তর ভর্তি। দেওয়ান-ই-আম পরিপুর্ণ। সূর্যকান্ত চোখ তুলে দেখল কেবল মাথা আর মাথা। সকলেই নতমস্তক। এদের মধ্যে পরিচিত কেউই আছেন কিনা তা বোঝবার কোনো উপায় নেই—যতক্ষণ-না সে ভিড় থেকে বেরিয়ে বাদশাহের সুমুখে একক দাঁড়ায়। অথচ মন বলছিল কেউ-না-কেউ পরিচিত আছেই। কিন্তু কোথায়? কী করে তার দর্শন পাওয়া যাবে?

'তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি আসছি—'

আসফ খাঁ দেওয়ান-ই-আমের বাইরে দাঁড়াতে বলে, নিজে প্রবেশ করলেন দরবার-গৃহে। নকীবের হাঁক শোনা গেল—আরজবেগী, তাঁর নাম উচ্চারণ করল। আসফ খাঁ সুবর্ণ-নির্মিত রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার অভিবাদন করলেন, বাদশাহ প্রত্যাভিবাদন জানালেন সিংহাসনে বসে। আসফ খাঁ সিংহাসনের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তখনই বাদশাহের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেন না তিনি। কারণ, জন্তুদের সেলামীর পর সৈন্যদের অভিবাদন শুরু হয়েছিল। খাস-চৌকির মনসবদারের সেনা বাদশাহের সামনে এসে অভিবাদন জানিয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাচ্ছিল। তারপর এল সারিবদ্ধ অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা দুর্গের বাইরে থেকে—একে একে অভিবাদন করে ফিরে যেতে লাগল নাকারাখানার পথে। এরফাঁকে বাদশাহ একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না—আর্জি শুনে যাচ্ছিলেন সুযোগ-সুবিধা মতো। নানান লোকের নানান আর্জি। যেগুলো সম্ভব তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করছিলেন—বাকিগুলো রেখে দিচ্ছিলেন পরদিনের জন্যে। আসফ খাঁ তখনও কিছু নিবেদন করেননি। অপেক্ষা করছিলেন ভীড় আরও হালকা হোক।

নাকারা থাকল। সমস্ত সৈন্য চলে গেল অভিবাদন শেষে। আর্জির সংখ্যা কমে এল। বাদশাহ চোখ তুলে তাকালেন। আসফ খাঁ সেই সুযোগে এগিয়ে অস্ফুটস্বরে কী নিবেদন করলেন। বাদশাহ বললেন, 'তাই নাকি? কোথায় সে?'

'বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'এখানে আসতে বলো—'

আসফ খাঁর নির্দেশে একজন চোপদার বাইরে গিয়ে সূর্যকান্তকে ডেকে নিয়ে এল। সূর্যকান্ত ঢুকল ঈষৎ বিচলিত পদক্ষেপে। অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করেছে বাইরে, অত দেরি হচ্ছিল তার মানসিক কথা শুনবেন কিনা কে জানে। তদুপরি যে বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখা যাচ্ছিল তাতে আশা-ভরসা ক্ষীণ হয়ে আসছিল ক্রমশ।

তিন শ্রেণীর রেলিঙ পার হয়ে সে আসফ খাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং নত হয়ে বাদশাহকে অভিবাদন জানাল রীতি-মাফিক।

বাদশাহ তার সুদর্শন রূপ ও স্বাস্থ্যের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সায়েব, কে এই যুবা?'

'এর নাম সূর্যকান্ত।' আসফ খাঁ জানালেন যথাযথ বিনম্র ভঙ্গিতে ঃ 'এর পিতা চন্দ্রকান্ত রায় সুবা বাঙলার একজন গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। তিনি জিন্নৎমকানি নূরউদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহের সময় তখ্‌তের বহুত খিদ্‌মত করেছিলেন—'

'স্মরণ আছে।' বাদশাহ হেসে বললেন, 'আমি যখন বিদ্রোহী হয়েছিলাম তখন উড়িষ্যা ও আকবরাবাদে চন্দ্রকান্ত রায় আমার সঙ্গে লড়াই করেছিল। তার সাহস ও বিক্রম দেখেছি।'

আসফ খাঁ দ্রুতকণ্ঠে বললেন, 'সে অনেকদিন আগের ঘটনা। শাহানশাহ বাদশাহের হুকুম অমান্য করার শক্তি তখন কারও ছিল না—এখনও নেই। তাঁরই হুকুমে শাহজাদা খুরমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন চন্দ্রকান্ত রায়, ভরসা বদর শাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান বাদশাহ লাজী সাহিবি কিরবানি সে অপরাধ গ্রহণ করবেন না—'

বাদশাহ মৃদু হেসে অভয় দিলেন।

সূর্যকান্তর বুক দুর দুর করছিল। সব বুঝি ভেস্তে যায়? বাদশাহের অভয়-হাসি আশ্বস্ত করল।

বাদশাহের হাসিটি অতি সুন্দর!

কিন্তু বাধা পড়ল।

আসফ খাঁ মুখ খোলার আগেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর থেকে দুই ব্যক্তি অভিবাদন জানালেন। সূর্যকান্ত দেখল দুজনেই তার পরিচিত। দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিটি বৃদ্ধ নবাব শাহনওয়াজ খাঁ এবং তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিটি স্বয়ং আমীর-উল্‌-মুল্‌ক সৌকত আলী খাঁ। এঁরা কবে এসেছেন আর কোথায় উঠেছেন তা সে

জানত না, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেওয়ান-ই-আমের রীতি অনুসারে নকীব হাঁকল, 'রৌশন-উল্ মুলক্ মণিরুদ্দৌলা শাহনওয়াজ খাঁ হয়বত্ জঙ্গ হজরত জলালি—'

বাদশাহ্ শাহনওয়াজ খাঁর পানে তাকালেন।

বৃদ্ধ নবাব পুনরায় অভিবাদন করে নিবেদন করলেন, 'শাহানশাহ্, পরদেশী ফিরিঙ্গি যখন বাদশাহী বন্দর সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম—ওই কাফের যুবা না থাকলে সপ্তগ্রাম রক্ষা পেত না—ওর সাহস বল ও বিক্রম আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছে--'

হুঁ।'

বাদশাহ্ তাকালেন সৌকত আলী খাঁর পানে।

নকীব হাঁকল, 'ইফ্‌তিকার-উল্-মুলক্ সৈফ্উদ্দৌলা আমীর উল্-বহর-সৌকত আলী খাঁর শামসের জহাঙ্গীরি—' সৌকত আলী খা অভিবাদন করে বললেন, 'জঁহাপনা সুবাদার মোকরম খাঁর অধীনে সপ্তগ্রামে ফিরিঙ্গির সঙ্গে যে লড়াই হয়েছিল বন্দা সে সংবাদ সবই দরবারে নিবেদন করছে। ফিরিঙ্গির গোলার ভয়ে ফৌজদার কলিমুল্লা খাঁ পলায়ন করলে, ওই যুবা সপ্তগ্রামের এক বণিকের সেনা নিয়ে বাদশাহী বন্দর রক্ষা করেছে—আমি সঙ্গে ছিলাম—'

'বার বার পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের নামে অভিযোগ।' বাদশাহ গম্ভীর হয়ে উঠলেন, 'এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়। উজীর-সায়েব, সুরাটের ইংরেজদের দূত কী এসেছে?'

উজীর বললেন, 'জনাব আলী, ইংরেজ ফিরিঙ্গির দূত নাকারাখানায় উপস্থিত আছে, হুকুম হলে দরবারে উপস্থিত করা যাবে। সংবাদ পাঠাব?'

'থাক।' 'বাদশাহ্ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'এখানে নয়। খাস দরবারে দেখা করতে বলবেন। সহাব শাহনওয়াজ খাঁ ও সৌকত আলী খাঁ-ও থাকবেন—'

পরক্ষণে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবাব সায়েবের সঙ্গে যে কাফের ফকির এসেছিল সে কী ফিরে গেছে?' কাফের মথুরায় আছে—'

বাদশাহ্ বললেন, 'তাকে তলব করো।'

তখ্ত ত্যাগ করে ওঠবার সময় আসফ খাঁর দিকে নজর পড়ল।

বললেন, 'ব্যবস্থা হবে। কী যেন নাম ওর?'

'সূর্যকান্ত—'

'ও-ও যেন খাস দরবারে উপস্থিত থাকে।'

আসফ খাঁ খুশি হলেন। তাঁর সম্মান রেখেছেন জামাতা-বাদশাহ্। নাকারা বাজছিল—বাদশাহ্ সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন। সেদিনের মতো দরবার শেষ।

॥ সতেরো ॥

সূর্যকান্ত বাসা-বাড়িতে ফিরল ভাবতে ভাবতে। যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে। দুপুর পার হয়ে অপরাহ্ন। ক্ষিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। হাঁটছে হনহনিয়ে। দুর্গ পেরিয়ে বেশ কিছুদূর গেলে সিকন্দরপুর মহল্লা— সেখানে একটি খড়ের চালা বাড়িতে তাদের আস্তানা। মনোরমা-মাসিমার সঙ্গে ইন্দিরা রয়েছে এত বেলা অবধি না খেয়ে। ফিরতে দেরি হবে জানলে সে বলেই আসত ঃ 'তোমরা খেয়ে নিও, আমি বাজার থেকে যা-হোক খেয়ে নেব।' বিশেষ ফল হত না হয়ত। মাসিমার আহারের ইচ্ছা থাকেলও ইন্দিরা আগ্রহ দেখাত না কিছুতেই, যেন এখন থেকেই সে পতিব্রতা স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে বসে আছে! সূর্যকান্ত আহার গ্রহণ না করলে সে খাবে না। এ বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি। কিন্তু অভিযোগ বা অনুরোধ করেও যখন আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি তখন হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। অনর্থক মনোবিবাদ সৃষ্টি করে লাভ নেই। বরং ভাবতে ভাল লাগে যে তার জন্যে একজন না খেয়ে অপেক্ষা করে আছে— সেই প্রতীক্ষিত মনটির গোপন অনুরাগ হৃদয় ভরিয়ে তোলে। রোমাঞ্চ জাগে মনে, শিহরণ খেলে যায় দেহে। কুমারী-কন্যার অনুরাগ-ভরা মধুর ভ্রূভঙ্গি যে কী অপুরূপ তা কী সে টের পেত ইন্দিরা এখানে না এলে? তার চলন তার দেহভঙ্গিমা সবই যেন মাধুর্যে ভরা। অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সূর্যকান্ত। প্রায় সারাটা দিন কেটেছে আমদরবারে প্রার্থীরূপে সেই সকাল থেকে, দরবারের জাঁকজমকে কচি মুখখানি কখন্ সরে গিয়েছিল নিজের অজান্তে—এখন যেন পূর্ণ অবয়বে উপস্থিত মনের সীমান্তে। যত মনে পড়ছিল ইন্দিরার কথা তত জোরে হাঁটছিল সূর্যকান্ত।

তাকে যে কেউ অনুসরণ করছে তা সে খেয়ালই করতে পারেনি!

সূর্যকান্তর ভাবনা ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছিল। ভাবতে ভাল লাগছিল ইন্দিরার কথাই। বিয়ের কথা উঠেছে—হয়ত শিগগির বিয়ে করতে হবে। এটা আদৌ গুরুতর কাজ নয়, সবাই বিয়ে করে, কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে শুধু একটি নয় বহু বিবাহ প্রচলিত, কেবল মাত্র বিবাহ-কর্ম দ্বারাই কোনো কুলীন সারা জীবন কাটিয়ে দেন, হয়ত হিসাব থাকে না মোট কতগুলি বিবাহ করেছেন—তারা ধর্মের নামে বিবাহ-ব্যবসায়ী। সূর্যকান্তর তেমন ইচ্ছা নেই— সে একটি বিবাহের ব্যাপারেই বিব্রত। পুরোহিত সমস্যা হয়ত মিটবে কিন্তু আর্থিক সংগতি কই? কাজ পাওয়া যায়নি আজও, প্রতিষ্ঠা মেলেনি। বিবাহের পর তার দিন চলবে কী করে?—এখনই তো অবস্থা শোচনীয়!

অবশ্য আসফ খাঁ তার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আরও ভাল হয়েছে নবাব শাহনওয়াজ খাঁ ও সৌকত আলী খাঁর অকুণ্ঠ সমর্থনে।

ওঁরা যে আম-দরবারে উপস্থি আছেন তা সে জানত না। এ তার সৌভাগ্যই বলতে হবে। পরিচয়টি জোরদার হয়েছে সব দিক দিয়ে। বাদশাহের মনে ছাপ

পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁর মনোভাব বোঝা গেল না মোটেই। পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি অত্যাচারের কথা তিনি বেশি করে চিন্তা করছেন বলে মনে হল, অবশ্য এটা স্বাভাবিক। বলদর্পী ফিরিঙ্গিরা একদা নাকি শাহজাদা খুর্‌রম ও তাঁর পরিজনকে বিব্রত করতে কসুর করেনি— বলেছিলেন আসফ খাঁ এখন হয়ত তাতে ঘৃতাহুতি পড়েছে। সেই অপমানের শোধ নেবার কথাই হয়ত ভাবছেন তিনি।

সূর্যকান্ত ভেবে দেখল এটা তার ব্যক্তিগত সমস্যা হলেও বড় কাজ — বাদশাহ যদি ফিরিঙ্গি অত্যাচার বন্ধ করার প্রয়াসী হন তাহলে সে আরও কিছুদিন কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছে। সেই প্রয়াসের সঙ্গে সে হাত মেলাবে, যদি বাদশাহ তার ওপরে কোনো ভার অর্পণ করেন। কিন্তু কী যে হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আজ সন্ধ্যাবেলায় খাস-দরবারে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন তিনি— ঘরোয়া বৈঠকের মতো গোপন আলোচনার স্থান সেটা। নবাব শাহনওয়াজ খাঁ, সৌকত আলী খাঁ, সে এবং ইংরেজ-দূত সবাই উপস্থিত থাকবে সেখানে। কী বিষয়ে আলোচনা হবে আগে থেকে কেউ তা বলতে পারে না—এমনও হতে পারে যে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের কথা আদৌ উঠল না, আলোচনা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে। সম্রাট শাহজহানের খেয়ালের তো অন্ত নেই! কিন্তু বিশেষভাবে তাদের ডাকা এবং সুরাটের ইংরেজ-দূতকে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়ার অর্থ কী? ইংরেজ দূত কী করবে? এদেশে সদ্য আগত ওরা—ফিরিঙ্গিদের মতো ওরাও গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে নাকি?

কে জানে কী ব্যাপার—সূর্যকান্ত চিন্তার থই পাচ্ছিল না। মহল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে—গৃহদ্বারে করাঘাত করল। প্রথমবার সাড়া মিলল না, দ্বিতীয়বারে ভেতর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে?'

সূর্যকান্ত ক্লান্ত ছিল, অবসন্নকণ্ঠে বললে, 'আমি — দরজা খোল —'

'তুমি কে?' আবার প্রশ্ন শোনা গেল।

'আমি সূর্যকান্ত— ভয় নেই — দরজা খোল—'

এবার দরজা খুলল, সূর্যকান্ত ঢুকল ভেতরে। মনোরমা দাঁড়িয়েছিল দ্বারের পাশে, সে বললে, 'অচেনা অজানা জায়গা, এক-ডাকে দরজা খুলতে সাহস হয় না হুট করে কেউ যদি ঢুকে পড়ে —'

সূর্যকান্ত বললে, 'তা বটে।'

'এত দেরি হল যে?'

সূর্যকান্ত হেসে বললে, 'আম-দরবারে গিয়ে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা যায় না মাসিমা—'

'দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ—'

'বাদশাহ কী বললেন?'

'দেওয়ান-ই-খাসে দেখা করতে হুকুম দিয়েছেন — আজ সন্ধ্যায় যাব —'

'সে কী! বিশ্রাম করবে না একটু?'

'দেওয়ান-ই-খাস থেকে ফিরে আসার পর! অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন মনে হচ্ছে—'

'কী রকম?'

'সৌকত আলী খাঁ সম্বন্ধে কতই-না চিন্তা করেছিলাম—আজ দেখি তিনি স্বয়ং আম-দরবারে উপস্থিত—'

'এদিকেও একটা সুসংবাদ আছে। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, খেতে বস। ইন্দিরা এত বেলা অবধি না খেয়ে রয়েছে। কথায় কথায় বেলা বেড়ে যাচ্ছে —'

'হ্যাঁ ওটা সেরে ফেলা দরকার। আমারও খিদে পেয়েছে খুব। ইন্দিরা ভাত বাড়ো—'

মুখহাত ধুয়ে খেতে বসল সূর্যকান্ত। পরিবেশন করতে লাগল ইন্দিরা। খেতে খেতে মুখ তুলল সূর্যকান্ত। বললে, 'সুসংবাদ কী বলছিলে মাসিমা?'

পাখা নিয়ে পাশেই বসেছিল মনোরমা। বললে, 'আজ সকালে তুমি বেরিয়ে যাবার পর বাদশাহ-বেগমের বাঁদী এসেছিল, বলে গেছে, সন্ধ্যাবেলা বৃন্দাবন থেকে বাঙালি পুরোহিত আসবে। শুনে আমার কী-যে আনন্দ হচ্ছে—'

'কিন্তু মাসিমা, আমি তো সন্ধ্যাবেলা থাকতে পারব না।'

'তাতে কি।' মনোরমার স্বরে তেমনি আবেগ ও উচ্ছ্বাস আমি কথা বলব। দেরি করার পক্ষপাতী আমি নই। কী স্থির করেছি জানো?

সূর্যকান্ত চোখ তুলে তাকাল।

মনোরমা বললে, 'পরশু একটা শুভদিন আছে। পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে ওই দিনেই শুভ কাজ সারব। এখন ভগবান যদি—'

'বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মাসিমা?'

'কিছুমাত্র না।' মনোরমা জোর করে বললে, 'কতদিন ঝুলিয়ে রাখবে মেয়েটাকে? সুযোগ যখন এসেছে তখন হেলায় হারানো উচিত নয়। আমি বলি, 'কাল অধিবাস আর পরশু বিয়ে হোক—'

সূর্যকান্ত শুকনো ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মনোরমা বললে, 'অ ইন্দিরা কোথায় গেলে? ডাল দিয়ে যাও—'

বিয়ের কথা বার্তা শুনেই ইন্দিরা লজ্জায় লুকিয়েছিল রান্নাঘরে। ডালের বাটি নিয়ে এগিয়ে এল আড়ষ্টভাবে।

সূর্যকান্ত বললে, 'মাসিমা, খেতে বসে ডাকাডাকি করতে হচ্ছে। লক্ষণ ভাল নয়। একজনের সম্মতি তো পেলে আর-একজনে কী বলে?'

ইন্দিরা সমস্ত ডাল ঢেলে দিলে পাতে।

'দেখলে—দেখলে তো মাসিমা—' হাসতে লাগল সূর্যকান্ত। মনোরমা হেসে উঠল। ইন্দিরা একদৌড়ে রান্নাঘরে।

ততক্ষণে য়াকুৎ বাঁদী জোবেদা এসে গেছে অনুসরণ করে— সঙ্গে তার প্রেমিক কালমক আখতাব খাঁ। তারা সূর্যকান্তকে দ্বারে করাঘাত করে ভেতর ঢুকতে দেখল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার। ছোট বাড়ি। ভেতর থেকে অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। আখতাব খাঁ বললে 'এবার?'

জোবেদা বললে, 'বাড়িটা চিনলুম বটে কিন্তু খবর তো কিছু নিয়ে যেতে হবে। দাঁড়া, কথা শোনা যায় কিনা দেখি—'

সে কান পাতল দরজায়। শুনতে লাগল ভেতরের কথোপকথন। আখতাব বললে, 'শুনতে পাচ্ছিস কিছু?' 'হু'—'

'কী বুঝছিস?'

'বাঙলা মলুকের বুলি, শুনতে পাচ্ছি বটে কিন্তু বুঝতে পাচ্ছিনে, বড্ড খটমটে—'

'মরদটার নাম?'

'আ মর্, সেজন্যেই তো কান পেতে আছি। শরাবের শিশিটা দে—'

'ফের খাবি?' আখতাব যেন আঁতকে উঠল, 'বেশি শরাব খেলে টলে পড়ে যাবি। তখন ফ্যাসাদে পড়ব। সেটা ভাল হবে?'

'কিছু হবে না। দে তুই —'

'রাস্তায় মাতলামি করলে কোতোয়ালে ধরে নিয়ে যাবে। আমার বাবার সাধ্যি থাকবে না তোকে ছাড়িয়ে আনি। নেশা মাটি হয়ে যাবে গুঁতোর চোটে।'

'বেশি বকিসনে। তোর মতলব বুঝতে বাকি নেই। নিজেই সেঁটে দিতে চাস বাকিটা। তা হবে না। দে বলছি—'

আখতাব বোতল বার করে এগিয়ে দিল অগত্যা। মায়া হচ্ছিল। অনুনয়ের স্বরে বললে, 'সবটা খাসনে। আমার জন্যে একটু রাখিস। বড্ড খাসা চীজ।'

জোবেদা ঢকঢক করে ঢেলে দিল গলায়—শুন্য বোতলটা ফেলে দিল রাস্তার ধারে। বললে, 'দুঃখ করিসনে। তোকে সেরা শরাব খাওয়াব।' হেঁচকি উঠল, সামলে নিয়ে বললে, 'জ্যান্ত শরাব আমি তো আছিই। চেটেপুটে খেয়ে নিস, কিছু বলবনা। ওঁক—'

'ওটা তোর চেয়েও ভাল শরাব' আখতাব খুঁতখুঁত করছিল।

'আমার চেয়েও ভাল?' মুখপোড়া, তুই মেয়েমানুষের স্বাদ কী বুঝিস? 'ছোটলোক, ইতর—' তার মাথার চুল খামচে ধরল জোবেদা।

'ওরে ছাড়—ছাড়—ঘাট হয়েছে—আর ওকথা বলব না। ভিড় জমে যাচ্ছে, কী ভাববে লোকে—'

বাস্তবিক ভিড় জমে যাচ্ছিল। জনাকীর্ণ রাজধানীর মহল্লা। লোক-চলাচল

ছিল যথেষ্ট, ওদের আচরণে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল কিছু লোক। মজা দেখছিল। শীর্ণা এক রমণীর হাতে দশাসই একটা লোক নির্যাতিত হচ্ছে দেখে কাছে দাঁড়িয়ে তারা হাসছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আখতাব বললে, 'তখনই বললাম সবটা খাসনে, শুনলিনে, লোক হাসিয়ে ছাড়লি—'

'এই—এই—হাসছো কেন তোমরা?' তাড়া করল জোবেদা, বেসামাল, 'আমরা স্বামী-স্ত্রী যা-খুশি তাই করব, তোমাদের তাতে কি। যাও ভাগো—'

লোকগুলো সরে পড়ল একে একে।

আখতাব সক্ষোভে বললে,'কিন্তু যেজন্যে এসেছিলুম—'

'দাঁড়া দেখছি।' ফের কান পাতল জোবেদা।

শুনতে পেল মনোরমার জিজ্ঞাসা ঃ 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা দুজনমাত্র মেয়েমানুষ। তুমি কী এখনই দেওয়ান-ই-খাসে যাবে সূর্যকান্ত?'

সূর্যকান্ত বললে, 'হ্যাঁ মাসিমা, আপনি আছেন বলেই নির্ভাবনায় যেতে পারছি। দেরি করা উচিত হবে না।'

শুনে জোবেদা লাফিয়ে উঠল।

'ওরে মুখপোড়া, শিগগিরি শিশিটা দে—'

আখতাব বললে, 'শিশি আর পাব কোথায়?'

'নেই?'

আখতাব বললে, 'না। কিন্তু কেন?'

'শুনবি?' জোবেদা আক্ষেপ করে বললে, ' মোগল হারেমে চাকরি, বাঙলা মুলুকের জবান আর মরুভূমিতে বাস এই তিনই সমান—'

'হল কী!'

'নামটা শুনেছি।'

'বটে। কী নাম?'

'সুরজকান্ত্।'

'ঠিক শুনেছিস তো?'

'বিলকুল ঠিক।'

'তব্ মার দিয়া—'

'শোন্। বোধহয় বেরুবে এবার এখুনি। দেখে ফেলতে পারে। চল্ ওই দোকান থেকে কিছু শরাব কিনে আনি—'

'চল।'

উৎসাহে দুজনে চলল দোকানে। সেখান থেকে লক্ষ্য রাখল বাড়িটার দিকে। খানিক পরেই বেরুল সূর্যকান্ত। শেষ বিকেলের আলোয় যতক্ষণ দেখা যায়—তার গমন পথের পানে চেয়ে রইল দুজনে। যখন বোঝা গেল সে অনেক দূরে চলে

গেছে তখন আখতাব বললে, 'তুই ওই ফাঁকা জায়গাটায় চুপ করে দাঁড়া। আমি আরও খবর নিয়ে আসছি—'

'সাবধানে যাস কিন্তু।' 'কিচ্ছু ভাবিসনে। আমি কাল্‌মক— দেখ-না আমার বুদ্ধির দৌড়—'

সে গিয়ে দ্বারে করাঘাত করল, ঠক ঠক ঠক।

ভেতর থেকে মনোরমার সচকিত প্রশ্ন ঃ 'কে গা?'

আখতাব যথাসম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দিল, 'হামি—'

কণ্ঠস্বরে স্থূলত্ব ধরা পড়ল মনোরমার কানে। সন্দেহ হল। সে ভেবেছিল মথুরার পুরোহিত এসেছে বুঝি, কিন্তু বাঙালি পুরোহিতের গলা তো এমন নয়! উঠে এসেছিল দ্বারের কাছে, সেখান থেকে আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

আখতাবের আরও মোটা গলায় জবাব ঃ 'হামি।'

সন্দেহ নেই উটকো লোক।

মনোরমা বললে, 'তুই কে রে মিন্‌সে?'

আখতাব সাহসে ভর করে বললে, 'আমি সূরজকান্ত্‌—'

সূর্যকান্ত! উচ্চরণের ছিরি দেখলে হয়ে আসে! অমন সুন্দর একটা নামের কী বিকৃত উচ্চারণ! — নিশ্চয় কোন কুমতলব আছে। নামটা কোথা তেকে শুনে বাড়ি চড়াও হয়েছে। দাঁড়াও তোমার সূর্যকান্ত সাজার সাধ মেটাচ্ছি। চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। মনোরমা বললে, 'ওইখানে দাঁড়া মিন্‌সে, আমার হাত জোড়া, একটু পরে দরজা খুলছি—'

ইন্দিরা এঁটো বাসন জড়ো করছিল কুয়োতলায়। ডাকল তাকে, 'শোন্‌ ইন্দিরা—'

সে কাছে আসতে ফিসফিস করে বললে, 'একটা উটকো মিন্‌সে সূর্যকান্ত সেজে এসেছে। দরজা খুলতে বলছে। কুমতলব আছে নিশ্চয়। ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। তুই এক কাজ কর্‌—ওই পচা গোবরের হাঁড়িটা নিয়ে ছাদে চলে যা আমি দরজা খুললেই মিন্‌সের মাথায় ঢেলে দিবি—পারবি না?'

'যদি কিছু হয়?'

'কিছু হবে না—যা তুই—'

ইন্দিরা গোবরের হাঁড়ি নিয়ে ছাদে চলে গেল। মনোরমা এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। পাশেই ছিল মুড়ো খ্যাংরা, সেটা তুলে নিয়ে শব্দ করে খুলে দিল দরজা। আখতাব হাত কচলে হেসে কথা বলতে যাচ্ছিল—ছড়ছড়িয়ে কৃমিভরা দুর্গন্ধ গোবরের রাশি বর্ষিত হল তার মস্তকে। আত্মরক্ষার পথ পেলা না, চোখ মুখ নাক বন্ধ হয়ে গেল বর্ষণে। ভূতের মতো কিম্ভূতকিমাকার দেখাতে লাগল তাকে। সেই ফাঁকে হাত চালাল মনোরমা। কে বলে নারী অবলা? ভীষণ

বেগে সম্মার্জনী পড়তে লাগল কাল্‌মকের পিঠে। ব্যতিব্যস্ত কাল্‌মক ভঙ্গদিল রণে—উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়—

জোবেদা আগে থেকে অপেক্ষা করছিল নির্দিষ্ট স্থানে, হাঁপাতে হাঁপাতে আখতাব সেখানে হাজির। তার অবস্থা দেখে জোবেদা অবাক— কাছে আসতেই নিজের নাকে কাপড় চেপে ধরল। উল্‌টি আসার উপক্রম। ক'বার ওয়াক করল জোবেদা, বললে, 'ওরে মুখপোড়া, কোত্থেকে উঠে আসছিস? গোরস্থানে গিয়েছিলি নাকি? কী ঘেন্না —কী ঘেন্না—'

আখতাব নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'গোরস্থানে যাব কেন? বাঙ্গালি বিবির সঙ্গে আশিক করতে গিয়েছিলুম—'

'তা গায়ে এত দুর্গন্ধ কেন?'

আখতাব সক্ষোভে বললে, 'দুর্গন্ধ বলিসনে রে ছুঁড়ি। এ হল বাঙ্গালা মুলুকের আহ্‌ল কসমের ইত্তর—আশিকে মাতোয়ারা হয়ে ঢেলে দিয়েছে বাঙ্গালি বিবি—'

কিন্তু এ 'আতর' সহ্য করা কঠিন হচ্ছিল জোবেদার পক্ষে।

রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। শক্ত গলায় সে বললে, 'ওই আতর মেখে তুই বাঙ্গালি-বিবির ঘরে ফিরে যা, আমার কাছে এলে জুতো খাবি। তফাত যা বলছি—'

'শোন্ তবে ব্যপারটা।' আখতাব ঘটনাটা খুলে বলে রুমাল দিয়ে গোবর মুছতে মুছতে আক্ষেপ করে উঠল, 'ভেবেছিলুম এক হল আর এক। এমন মওকা মাটি হয়ে গেল। আগে জানলে—'

'কী ভেবে গিয়েছিলি তুই?'

আখতাব বললে, 'ভেবেছিলুম অনেক কথা। দরজা খুললেই আউরত দুটোকে বেঁধে ফেলব। আর, রাত্রে যখন মরদটা ফিরবে তখন তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাব যেখানে ইচ্ছা। কিন্তু তা হল না। বাঙ্গালি বিবিরা যে—'

'মরদটা কোথা গেছে জানিস?'

'না।'

জোবেদা রেগে বললে, 'কোনো কর্মের নয়। কিচ্ছু হবে না তোর দ্বারা—'

'রাগ করিসনে। ঠিক কাজ উদ্ধার করব। এখন কী করি বল্?'

জোবেদা তেমনি রেগে বললে, 'তাও বলে দিতে হবে? ওই তো যমুনা, একটা ডুব দিয়ে আসতে পারছিসনে? কাল্‌মক ভূত কোথাকার—'

'তুই কোথাও যাসনে। আমি যাব আর আসব। এসে, যদি কাজ উদ্ধার করতে না পারি তা হলে আমার মুখ দেখিসনে।'

জোবেদা বুঝল এতক্ষণে কাল্‌মকের রক্ত গরম হয়েছে। অপমানের শোধ সে তুলবে। কাজ উদ্ধার করবে আজই।

খুশি হল সে। বললে, 'তাড়াতাড়ি যা। আমি এখানে আছি—'

রাত হয়েছে বেশ। মহল্লা স্তিমিতপ্রায়। অধিকাংশ লোক শুয়েছে ঘরের বাইরে দাওয়ায়— কেউ গান গাইছে কোথাও-বা গল্প হচ্ছে শুয়ে শুয়ে। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ, কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে না একটাও মেঘ করেছে। এমন মেঘ নয় যে বৃষ্টি হবে, চাপা গুমোট। গরমে জ্বালা করে গা হাত— ঘরে থাকা যায় না। একটু বেশি রাতে আর্দ্রতা নামে বাতাসে, মানুষ স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে, ঘুম নেমে আসে চোখে। তার আগে পর্যন্ত রক্তের জ্বালা যেন কাটতে চায় না।

শুয়ে পড়েছিল দুজনেই— মনোরমা আর ইন্দিরা। মনোরমা বলছিল, 'কী বিশ্রী গরম। বাদশাহ্ কী সুখে যে দিল্লি ছেড়ে এখানে আছেন বোঝা মুশকিল, আমি তো বাপু চোখের পাতা এক করতে পারিনে—'

ইন্দিরা বললে, 'তাঁর থাকা আর আমাদের থাকা অনেক তফাত দিদি। তিনি বাদশাহ্ আর আমরা গরীব প্রজা। তবে শুনেছি আগ্রার চেয়ে দিল্লিতে আরও গরম। এখানে যমুনার কূলে তিনি হয়ত বেশি আরাম পান।'

'আরাম যে কত! হাওয়া ঢোকে না ঘরে। দম আটকে আসে—'

'ফের আমাদের সঙ্গে তুলনা করছো? রাজা-বাদশাহের ব্যাপারই আলাদা।'

'তা বটে—'

হাই তুলল মনোরমা।

'অ দিদি, ঘুমলে নাকি?'

মনোরমা বললে, 'ঘুম আর আসছে কই পোড়া চোখে—'

'কিন্তু কার যেন আসার কথা ছিল আজ সন্ধ্যাবেলা?'

'কে বল তো?'

'আ-হা আমি কী জানি। তুমিই তো বলছিলে—'

'কই মনে তো পড়ছে না!'

'যে বাদশাহ-বেগমের বাঁদী বলে গেছে—'

'কী?'

'আ-হা কিছু মনে থাকে না তোমার! মথুরা থেকে পুরোহিত আসার কথা ছিল না?'

'তাই তো!' মনোরমা ওর চিবুক নেড়ে দিল, 'আমার মনে না থাকলে কী হবে তোর ঠিক মনে আছে দেখছি! ওরে, এমনি করে আমিও বিয়ের দিন গুনতুম। কিন্তু পোড়া কপাল, সব খেয়ে বসে আছি অনেক আগেই। হয়ত কোনো কাজে আটকে গেছে। আসবে, সময় হলেই আসবে। তোর ছটফটানি কী আমি বুঝিনে মনে করিস?'

'আ হা আমি বুঝি তাই বললুম।'

'কিন্তু সূর্যকান্ত এখনও ফিরছে না কেন বল তো?'

'বলেছিলেন তো ফিরতে দেরি হবে।'

'তা বলে এত দেরি? ছেলেটার যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে—'

'তুমি ঘুমোও দিদি, আমি জেগে আছি।'

মনোরমার ঘুম পাচ্ছিল, সে কোনো কথা না বলে পাশ ফিরল।

খানিক পরে ইন্দিরা ডাকল, দিদি—অ দিদি—'

গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিতে লাগল!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মনোরমা, 'কী হয়েছে?'

ইন্দিরা ফ্যাকাসে গলায় বললে, 'ওই শোনো।'

দরজায় সেই শব্দ—ঠক ঠক ঠক—

ক্রমাগত শব্দ। সূর্যকান্ত এভাবে করাঘাত করে না। সে-শব্দ দুজনের পরিচিত।

'সেই মুখপোড়া বোধহয়। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।' মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়া ডিঙিয়ে সদর দরজার কাছে এল ঃ 'ফের এসেছিস? কী চাস?'

'মাইজি আমি হজরত বাদশাহ বেগমের নির্দেশে এসেছি।' ওদিক থেকে এক আহদী সেনার হিন্দী কথা শোনা গেল ঃ 'মথুরা থেকে যে পুরোহিত আসার কথা ছিল তাঁকে সঙ্গে এনেছি— মেহেরবানী করে দরজা খুলুন—'

আগের লোকটার মতো কর্কশ গলা নয়। বেশ স্পষ্ট ও নম্র। কিন্তু বিশ্বাস কি। হরবোলা লোকের তো অভাব নেই আগ্রায়! কে কোন্ ফিকিরে ঘুরছে কেউ কী তা বলতে পারে? কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। মনোরমা বললে, 'তুমি যে-ই হও, এখন দাঁড়াও, আমার বেটা বাইরে গেছে সে না এলে দরজা খুলব না।'

বাস্তবিক আহদী সেনার সঙ্গে পুরোহিত মশায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে।

মনোরমার আশংকা দেখে তিনি বললেন, 'মা, তোমার ভয় নেই, আমি বাঙালি ব্রাহ্মণ। মথুরা থেকে আসছি। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না, দরজা খুলে দাও—'

'কী নাম আপনার?

'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—'

'বাঙলা দেশে কোথায় আপনার বাড়ি?'

'তুমি চিনবে কী মা? রণ-সাগর বলে একটা জায়গা—'

'রণ-সাগর! আপনি সূর্যকান্ত রায়কে চেনেন?'

'চিনি বইকি। আমাদের মহারাজ—'

'আসুন জিজ্ঞসাবাদ করলাম বলে কিছু মনে করবেন না।'

বলে দরজা খুলে দিল মনোরমা। ভেতরে ঢুকলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। আহদী-সেনা বিদায় নিল সেখান থেকে। গঙ্গাকিশোর বললেন, 'তুমি সূর্যকান্ত রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিলে। তাঁকে চেনো নাকি?'

'সে-ই তো আমার ছেলে।'

'এখানে থাকে?'

'হ্যাঁ—'

'কোথায় গেছেন বললে?'

'দেওয়ান-ই-খাসে। আসুন—'

দাওয়ায় আসন পেতে দিয়েছিল ইন্দিরা। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ঝুপ করে বসে পড়লেন।

'আশ্চর্য! এমন করে দেখা হবে একেবারে ভাবিনি—'

দ্বারের পাশে অন্ধকারে লুকিয়েছিল আখতাব। সরে এল সেখান থেকে—যা শোনার শুনে নিয়েছে। উত্তেজনায় তার রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। দূরে গাছের তলায় অপেক্ষা করছিল জোবেদা, দ্রুত পায়ে তার কাছে এসে উল্লাসে ফেটে পড়ল, 'কেল্লা ফতে, মার দিয়া—'

জোবেদা বললে, 'কী হয়েছে রে মুখপোড়া? চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'শিগগির বার কর শরাব। ক' শিশি আছে?'

'দু শিশি—'

'একটা আমাকে দে। তাগদ তৈরি করি।'

'কেন রে মুখপোড়া?'

'মরদ-কা বাত হাতি-কা দাঁত। কাজ হাসিল করেছি—'

'কী কাজ তাই বল না?'

'পাত্তা পেয়েছি—'

'কোথায় আছে সুরজকান্ত্?'

'সে খাস-দরবারে গেছে—'

'তবে আর দেরি করিসনে তাড়াতাড়ি চল্।'

'সেজন্যেই তো একটা শিশি চাইছি। দেরি করে দিচ্ছিস তুই। তাগদ তৈরি না করলে তাকে পাকড়াব কী করে?'

'আচ্ছা নে। কিন্তু বেশি খাসনে। আমার জন্যে একটু রাখিস—'

'তুই রেখেছিলি?' আখতাব পুরো বোতলটাই গলায় ঢেলে দিল। বললে, 'তোর মতো আমি টলি না। দু'দশ শিশিতে আমার কিচ্ছু নেশা হয় না। বরং তাগদ বেড়ে যায়। এখন চল্। অমরসিং ফটকে লুকিয়ে থাকতে হবে, বেটা বেরুলেই পাকড়াও করব। মতলবটা বুঝতে পেরেছিস?'

জোবেদা হেসে বললে, 'খুব। সেজন্যেই তোকে এনেছি। চল্—'

ওরা অমরসিংহ ফটকের দিকে ছুটতে লাগল।

॥ আঠারো ॥

রাত্রে চলাফেরা করা সূর্যকান্তর অভ্যাস ছিল। অনেকদিন আগ্রায়— কাজের ধান্দায় রাত হয়ে যেত বাড়ি ফিরতে। রাত্রির আগ্রা সে বহুবার দেখেছে। বাদশাহ একটানা আগ্রায় থাকতেন না বটে কিন্তু যখন তিনি থাকেন, আগ্রার রূপ যায় বদলে। আলোর সমারোহে ভরে ওঠে চারদিক। আগ্রার দুর্গ ও প্রাসাদের সারি সজ্জিত হয় বহু বর্ণের বিচিত্র আলোকমালায় — যেন একটা আলোর উৎসব। লক্ষ লক্ষ গন্ধ তেলের দীপ রক্ষা করা হয় বিভিন্ন রঙে কাচের আবরণে, তা থেকে আলোর ফোয়ারা ওঠে। ঝলমল করে ওঠে দুর্গ ও প্রাসাদ। জলাশয়ইবা কত। শ্বেতমর্মরের জলাশয়ে শত শত ফোয়ারা আলোকমালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুগন্ধিজলধারা ছড়িয়ে দেয় সুছন্দে—বুঝিবা খণ্ডকাব্যের খণ্ড খণ্ড রূপ হয়ে ওঠে তারা! ফোয়ারার চারপাশে ও মর্মর নির্মিত হ্রদের চতুর্দিকে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপাধার, তাতে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলোকে সেই জলরাশি উদ্ভাসিত করে। দেখে বিভ্রম জাগে। বিলাসী বাদশাহের উপযুক্ত সমারোহ বটে!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সূর্যকান্ত যখন আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করল তখন এই মনোরম দৃশ্যে সে একটু ধাঁধিয়ে গেল। এই সময়ে আগে তো কখনও আসেনি— দূর থেকেই দেখেছে। কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে পারছিল না, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে দেখে এগিয়ে এল এক সেনা। সে দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করছিল। আসফ খাঁর অনুচর।

'চলুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি—'

প্রহরীরা পথ ছেড়ে দিল আসফ খাঁর মোহরাঙ্কিত পত্র দেখে। আজই দিনের বেলা দুর্গে প্রবেশ করেছিল সে—মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দেখেছিল দুর্গের বিরাট অভ্যন্তর কী জমজমাট, নানা শ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ। হাতি ঘোড়া-উট-হরিণ-মহিষ-বাজপাখির মিছিল। একটি মাত্র মানুষ, বাদশাহকে ঘিরে, কী বিপুল অভিবাদন আর উপঢৌকন ঃ তখন কল্পনা করা যায়নি এই অল্প সময়ের মধ্যে সব শূন্য হয়ে যাবে। সূর্যকান্ত এগিয়ে যাচ্ছিল আর দেখতে পাচ্ছিল শ্রেণীভেদের চক তিনটি শূন্যতায় হাহা করছে। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক জনশূন্য তো বটেই— মতি মসজিদ, টাঁকশাল ও নাকারাখানায়ও তাই কেউ নেই কোথাও। দেওয়ান-ই আমের প্রকাণ্ড চত্বর নির্জনতায় থমথম করছে। যেন একটা পরিত্যক্ত রহস্যভূমি। সঙ্গীর সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে সূর্যকান্তর গা ছমছম করছিল।

চত্বরের চারিদিকে, দূরে দূরে, মনসবদারদের কাছারিতে আলো জ্বলছিল অনেকগুলো প্রাণের অস্তিত্ব জানিয়ে —কিছু মনসবদার প্রতীক্ষা করছে বখ্‌শীর আদেশের অপেক্ষায়। সেদিকে তাকিয়ে শীতের রাতে জলমগ্ন ব্যক্তির তীরবর্তী আলোর দিকে চেয়ে থাকার মতো, সূর্যকান্ত চত্বর পার হয়ে যাচ্ছিল। ভেবেছিল এ-সব কক্ষের কোনো একটাতে নিয়ে যাবে বুঝি তার সঙ্গী। কিন্তু সেদিকেই গেল

না তার সঙ্গী— নাকারাখানার পশ্চিম-দিক ঘুরে চলে এল দেওয়ান-ই আমের বাম প্রান্তে। সেখানে পাওয়া গেল ছোট একটি প্রবেশদ্বার। ঢুকতে গিয়ে ভয় লাগল। দ্বারের পাশে পাহারা দিচ্ছে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে একজন হাবসী খোজা, বাধা দিলে সে। আসফ খাঁর অনুচর উজীরের মোহরাঙ্কিত পত্র দেখাল— খোজা পথ ছেড়ে দিল। আবার এগোতে লাগল দুজনে।

দ্বারের পেছনে সোপানশ্রেণী -- বোঝা গেল ওপরে উঠতে হবে। সূর্যকান্ত ক্লান্তি বোধ করছিল—তবু উঠে এল ওপরে। দেখতে পেল ওপর-তলে প্রাণের সাড়া রয়েছে। সামনের কক্ষটি দ্বিতল, রক্ত বর্ণ নির্মিত, সেখানে অসংখ্য চোপদার, হরকরা, খোজা ও পরিচারক—ওটাই দেওয়ান-ই-খাসের চত্বর। মহল পার হয়ে সূর্যকান্ত ও তার সঙ্গী দেওয়ান-ই-খাসের চত্বরে উপস্থিত হল। চারিদিক তাকালে দেওয়ান ই-খাসের রূপৈশ্বর্যে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। সূর্যকান্ত হাঁ করে দেওয়ান-ই-খাসের বাইরের রূপৈশ্বর্য দেখছিল।

'এই পর্যন্ত পৌছে দেবার ভার আমার ওপর। বাকিটা উনি করবেন—'

খাস চৌকির দারোগা অপেক্ষা করছিলেন প্রবেশ দ্বারের পাশে, তাঁর কাছে পৌছে দিয়ে সঙ্গী চলে গেল। সূর্যকান্ত চিনতে পারল, সায়েস্তা খাঁ, আসফ খাঁর পুত্র। খাস চৌকির রক্ষার ভার তাঁর ওপরে। আজই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল— সূর্যকান্ত বিনীতভাবে অভিবাদন করল।

সায়েস্তা খাঁ আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলেন, যেন বিচার করতে চাইলেন একজন বাঙালী যুবকের প্রতি পিতার অহেতুক স্নেহের পক্ষপাত কেন? কী দেখেছেন এর মধ্যে? সুদর্শন চেহারা ব্যতীত অন্য কিছু মনে পড়ল না তাঁর, তবে নম্র ও ভদ্র এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আলাপ করার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আলাপ করা যুক্তিসংগত নয়, কখন কোথা দিয়ে বাদশাহ এসে পড়েন ঠিক কি। তাঁর আসার সময় হয়েছে। নির্দেশ মতো যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। তিনি একজন খোজাকে ইঙ্গিত করলেন। খোজা তাকে নিয়ে চলল দেওয়ান-ই-খাসে।

আগ্রা দুর্গের পানিফটকের পেছনে শ্বেতমর্মরনির্মিত প্রশস্ত ছাদ —তার দুদিকে দুটি সুখাসন শাদা আর কালো মর্মরে তৈরি। যেন আলো আর ছায়া। ছাদের উত্তর দিকে দেওয়ান-ই-খাস— শ্বেত মর্মর নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। বাদশাহের নিভৃত আলোচনার কক্ষ। আম-দরবার সর্বসাধারণের জন্যে, খাস-দরবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্যে। সতর্ক পাহারা—অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যাতে প্রবেশ করতে না পারে। আম দরবারের মতো প্রকাণ্ড না হলেও খাস-দরবারের জেল্লা অত্যধিক, যেমন সুগঠিত তেমনি সুসজ্জিত। সীমাহীন অর্থব্যায়ে গৃহটি নির্মিত বাছাই করা মণিমুক্তা ও প্রস্তরে। বর্ণাঢ্য চিত্রাংকন। এমনটি আর কোনোখানে দেখেনি সূর্যকান্ত। এই ক্ষুদ্র

গৃহের প্রাচীরের চিত্রাংকন সুশোভিত করার জন্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বহুমূল্য প্রস্তর ও মণিমুক্তা। ছবি একটি দুটি নয়, অসংখ্য। মণিমুক্তা ও দুর্মূল্য প্রস্তরের সংখ্যা সেই অনুপাতে বিপুল। সূর্যকান্তর মনে হল শুধু এই একটি গৃহ নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা দিয়ে দ্বিতীয় একটি আগ্রা শহর সৃষ্টি করা যেত অনায়াসেই! খোদ বিশ্বকর্মার নির্দেশে যেন কুবেরপুরী সাজানো।

উজীর আসফ খাঁ বাক্যালাপ করছিলেন মীরবখ্শী নুরউল্লা খাঁর সাথে। সূর্যকান্ত অভিবাদন করে দাঁড়াল।

'আসতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'আজ্ঞে না—'

'সৌকত আলি খাঁ তোমার সন্ধান করছিলেন।'

'আমিও সাক্ষাতে উৎসুক—'

'এখানেই দেখা হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা—'

সে সরে গিয়ে ছবি দেখায় মনোনিবেশ করল। দুজনে বাক্যালাপ করুক— অবাঞ্ছিতের মতো তৃতীয় ব্যক্তিরূপে উপস্থিত থাকা উচিত নয়। একখানা ছবিতে তার দৃষ্টি আটকে গেল। অপূর্ব কারুকাজ। এ কক্ষের সেরা ছবি নিঃসন্দেহে। একটি পান্নার ময়ূর। প্রসারিত পুচ্ছে চুনি আর পোখরাজের কাজ। চঞ্চু দিয়ে আঘাত করছে মুক্তার আঙুরগুচ্ছে। চোখ সরানো যায় না এমন জিবন্ত।

'কখন্ এলে?'

চিত্রটি মনোযোগসহকারে দেখছিল সূর্যকান্ত, প্রশ্ন শুনে পেছন ফিরে তাকাল। সৌকত আলী খাঁ।

'এইমাত্র—'

অভিবাদন করল সূর্যকান্ত।

প্রত্যুত্তরে সৌকত আলী খাঁ আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'বড় খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে। তুমি চন্দ্রকান্তর পুত্র, তুমি আমার জীবনদাতা, তোমার কথা কোনো সময়েই বিস্মৃত হইনি। সপ্তগ্রাম থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম, কত অনুসন্ধান করেছি, কোনো খোঁজ পাইনি। আমাদের উপকারের কথা ভেবে অপরাধী মনে হয়েছে নিজেকে। ছিলে কোথায়?'

সূর্যকান্ত লজ্জিতভাবে খুলে বললে ঘটনাটা।

'ইস এত কাছে ছিলে আর আমি কত জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছি। একটা খবর দিতে হয়—'

'এতদিন কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে সপ্তগ্রাম ত্যাগের পর আগ্রায় চলে আসি। সেই থেকে এখানেই আছি—'

'এখানে থেকেও তো একটা খবর পাঠাতে পারতে!'

'আজ্ঞে নানান ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয় বলে—'

লজ্জায় চুপ করে গেল সূর্যকান্ত। বৃদ্ধের অকৃত্রিম সহানুভূতিতে অপরাধী মনে হচ্ছিল।

সৌকত আলী খাঁ তা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'মনে হয় অনেকদিন তুমি এসেছো, তাই না?'

সূর্যকান্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা বছরতিনেক হবে—'

'এতদিন কী করছিলে?'

বিব্রত বোধ করল সূর্যকান্ত। বললে, 'জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু বাদশাহের দরবারে পরিচিত ব্যক্তি ছিল না বলে তেমন সুবিধা করতে পারিনি—'

'এখন সুবিধা হবে মনে হয়?'

'আশা রাখি—'

'দরবারে এলে কী উপায়ে?'

'সপ্তগ্রামে আহত অবস্থায় যাঁর আশ্রমে ছিলাম সেই বৈষ্ণবীকে মাসিমা বলি। তাঁর সঙ্গেই আগ্রায় আসি। তিনি অতি উত্তম সূচের কাজ জানেন। হজরত বাদশাহ-বেগম তাঁর কাছে সূচের কাজ শেখেন এবং অত্যধিক স্নেহ করেন। তাঁর অনুরোধে হজরত বাদশাহ-বেগম নবাব আসফ খাঁকে পত্র দিয়েছিলেন, সেজন্যে নবাব স্বয়ং সঙ্গে করে আম-দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন—'

'দেখলাম বটে।' সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'এখন কী করবে?'

সূর্যকান্ত বললে, 'অনেকদিন বেকার বসে আছি। বাদশাহের অধীনে চাকরি পেলে তাই করব। এবার আমার একটি প্রশ্ন—'

'বলো।'

'সপ্তগ্রামের অবস্থা কেমন? ফিরিঙ্গিরা কী আগের মতোই অত্যাচার করছে?'

'বরং বেড়েছে।' সৌকত আলী খাঁ গম্ভীর হয়ে যান ঃ 'আমার যতদূর সাধ্য করেছি। প্রতিদিন ঠোকাঠুকি লেগেও আছে। দলে ভারী হয়েছে আরও। একা আমার দ্বারা বেশি কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে বাদশাহের দরবারে এসেছি তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে। বাদশাহের সহযোগিতা না পেলে—'

'কী মনে করেন?'

'পাব আশা করি। অধিকন্তু খোদা সহায়। ফিরিঙ্গি হার্মাদদের বিনাশ ঘনিয়ে এসেছে। তুমি নতুন ফিরিঙ্গিদের মনোভাব লক্ষ্য করেছো?'

'আপনি কাদের কথা বলছেন?'— সে বিস্মিত।

'কেন ইংরাজ।'

শেঠ সর্বেশ্বর সেনও যেন একবার এই ধরণের কী একটা কথা বলেছিলেন,—নতুন শক্তি ইংরাজ-ফিরিঙ্গি আসছে বাণিজ্যের বিনীত আর্জি নিয়ে। তারা যেমন ভদ্র তেমনি শক্তিমান। তাদের সঙ্গে নাকি এদের বিরোধ। ইংরাজ ফিরিঙ্গিদের ব্যবহার কি রকম জানে না সূর্যকান্ত, তাদের কারো সাথে আলাপ নেই, মনোভাব বোঝা তো দূরের কথা। তবে আম-দরবারে বাদশাহ একবার খোঁজ নিয়েছিলেন সুরাটের ইংরাজ ফিরিঙ্গির বাদশাহ হয়ত তাদের মনোভাব অবগত আছেন—পদস্থ ব্যক্তিদের কারো কারো পক্ষে জানাও অসম্ভব নয়। হয়ত আসফ খাঁ জানেন— সৌকত আলী খাঁ যে জানেন সে তো দেখাই যাচ্ছে। আরও অনেকেই জানাতে পারেন,—এই নবাগত নতুন শক্তিটিকে প্রসন্নমনে গ্রহণ কবার উদারতা সকলেরই রয়েছে। স্বয়ং বাদশাহ, সৌকত আলী খাঁ, সর্বেশ্বর সেন। এঁরা তার চেয়ে বিজ্ঞ, বহুদর্শী ব্যক্তি, হয়ত ইংরাজ ফিরিঙ্গ দ্বারা যথার্থ উপকার পাওয়া যাবে। তবু সূর্যকান্ত ভাবল এক-ফিরিঙ্গি বিনাশের জন্যে আর এক-ফিরিঙ্গি ডেকে আনা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না! মানুষ চেনা বড় কঠিন। বিশেষ করে সে যদি বাইরের কেউ হয়!

একথা সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। বেজে উঠল নাকারা। সৌকত আলী খাঁ ঘুরে দাঁড়ালেন।

সূর্যকান্ত দেখল, দেওয়ান-ই-খাসের পেছনে একটি সুবর্ণ-নির্মিত কপাট খুলে গেছে এবং বাদশাহ প্রবেশ করছেন হাতির দাঁতে তৈরি অপরূপ কারুকাজ করা ছোট ও সুন্দর তঞ্জামে চড়ে। তঞ্জাম এগিয়ে এল ধীরে।

আগমন নয়, যেন আবির্ভাব। বিস্ময়ের ঘোর বুঝি কাটে না মোহিত হয়ে যেতে হয়।

বিমুগ্ধ ভাব কাটল অল্পক্ষণ পরে। সৌকত আলী খাঁ খোঁচা দিলেন। অর্থাৎ অভিবাদন করো। সমবেত সভাসদগণ তিনবার ভূমি স্পর্শ করে অভিবাদন করছিল, দেখাদেখি সূর্যকান্ত তাই করল। বাদশাহ তঞ্জাম হতে নেমে অভিবাদন কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে গেলেন মধ্যস্থলে রক্ষিত সিংহাসনটির দিকে। দেওয়ান-ই-আমের চেয়ে ছোট সিংহাসন, কিন্তু রীতিমত কারুমণ্ডিত। উপবেশন করলেন স্বকীয় ভঙ্গিমায়।

সিংহাসন বেষ্টন করে দাঁড়ালেন উজীর আসফ খাঁ, বখ্‌শী নূরউল্লা খাঁ, সৌকত আলী খাঁ, শাহনওয়াজ খাঁ প্রভৃতি সভাসদগণ। প্রত্যেকেই বিনীত ও বিনম্র। বুঝিবা ঈষৎ চিন্তান্বিত। গুরুতর বিষয় ব্যতীত বাদশাহ খাস-দরবারে কাউকে আহ্বান করেন না। বাঙলা মুলুকে ফিরিঙ্গি হার্মাদরা কী এতই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে?

আসফ খাঁ লক্ষ্য করছিলেন সূর্যকান্ত অবাক-বিস্ময়ে বাদশাহের রাজকীয় আভিজাত্যের পানে তাকিয়ে আছে। যেন এজন্যেই সে এখানে এসেছে। তার

কথা আগে না তুললে বাদশাহ্ অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে পারেন তিনি ইংগিতে ওকে বাদশাহের সামনে যেতে বললেন। সূর্যকান্ত ক-পা এগিয়ে গেল।

বাদশাহ তা দেখলেন। হেসে বললেন, 'বাহাদুর বাঙালি, তোমার কথা বিস্মৃত হইনি, কিন্তু তার আগে ইংরাজ ফিরিঙ্গি।'

স্বরে প্রসন্নতা ছিল। সাহস করে আসফ খাঁ বললেন, 'জনাব, এই যুবা আগ্রা শহরে তিন বছর বেকার বসে আছে, এর পিতা জিন্নৎমকানী বাদশাহ জহাঙ্গীরের জমানায় সরকারের বহুত খিদমত করেছেন—'

'জানি।' বাদশাহ্ অটল মহিমায় বললেন, 'ফিরিঙ্গি দূত কোথায়?'

তটস্থ হলেন আসফ খাঁ: 'উপস্থিত আছে জনাব—'

'আসতে বলো।'

খাস-চৌকির দারোগা সায়েস্তা খাঁর উদ্দেশ্যে ইশারা জানালেন আসফ খাঁ। সায়েস্তা খাঁ বেরিয়ে গিয়ে অল্পক্ষণ পরে জনৈক বয়স্ক ফিরিঙ্গিকে নিয়ে ফিরে এলেন আবার। ফিরিঙ্গি ভূমি চুম্বন করে অভিবাদন করল।

'তোমার নাম?' আসফ খাঁর জিজ্ঞসাবাদ শুরু।

'টমাস হার্ডি। আমি সুরাট বন্দরে ইংরাজ-কোম্পানির প্রধান—'

'পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা কী তোমাদের দুশমন?'

'হ্যাঁ—'

'তোমরা কী ঈসাই?'

'হ্যাঁ, তবে পর্তুগীজদের মতো নয়—'

'যদি শাহানশাহ বাদশাহের হুকুম তামিল করতে পার,' আসফ খাঁ বললেন, 'তাহলে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।'

'আমরা সর্বদা প্রস্তুত—'

কথাগুলো-শুনছিলেন বাদশাহ্। তিনি বাধা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'সৌকত আলী খাঁ, তোমার সঙ্গে সপ্তগ্রামে ফিরিঙ্গিদের বিবাদ হয়েছিল কেন?'

'জহাঁপনা ব্যাপার অতি সামান্য।' সৌকত আলী খাঁ উত্তর দিলেন, 'কিন্তু গুরুতর আকার ধারণ করার কারণ এক ফিরিঙ্গি পাদ্রী—আলমিডা তার নাম—'

'খুলে বলো।'

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'জহাঁপনা, হুগলীর পাদ্রী আলমিডার কাছ থেকে পালিয়ে এক কাফের বাদশাহী বন্দর সপ্তগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল—কিন্তু আলমিডা নাছোড়বান্দা পাদ্রী। তিনি পেছনে সিপাহী নিয়ে তাড়া করেন। সিপাহীরা যখন তাকে ধরে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করছিল—ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হই এবং এ অন্যায় আচরণে বাধা দিই বলে তারা আমাকেও অপমান ও আক্রমণ করে। সেদিন চন্দ্রকান্তর ওই পুত্র আমার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছিল—'

ফের বললেন, 'কাফেরকে ধরে নিয়ে যেতে পারেনি বলে রাত্রি বেলা

ফিরিঙ্গি ফৌজ বন্দর আক্রমণ করে এবং শহরবাসীদের বেঁধে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে। সেই অরাজক অবস্থায় এ যুবাই সপ্তগ্রাম রক্ষা করেছিল প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে—'

'আর আপনি?

সৌকত আলী খাঁ বললেন, 'যুদ্ধ পরিচালনা করেছি—' নবাব শাহনওয়াজ খাঁ তখন এগিয়ে এসেছেন।

'আমি ও আমার পুত্রবধূ সে-রাত্রে ফিরিঙ্গিদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম জহাঁপনা—'

'তারপর?'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'সেদিন রক্ষা পেলেও পরদিন আমার পালিতা কন্যার সঙ্গে যখন বজরায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম—ফিরিঙ্গিদের আক্রমণে বজরা মারা পড়ে এবং আমরা সকলে বন্দী অবস্থায় হুগলীর দুর্গে আটক থাকি। ফিরিঙ্গি আমীর-উল-বহর ডি-ক্রুজের আদেশে পরে ছাড়া পাই—'

'তিনি ছাড়লেন কেন?'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'সম্ভবতঃ ভয়ে।'

'আপনাদের কোনো ক্ষতি করেনি?

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, পাদ্রী আলমিডার হয়ত অন্য ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার আগেই আমরা ছাড়া পেয়ে যাই—'

'আপনার কী মনে হয় ওদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে?'

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন শাহনওয়াজ খাঁ। দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আলবত। এবং সে কথা বলবার জন্যেই আমি দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তাদের হাতে সকলের জানপ্রাণ বিপন্ন, জোরের সঙ্গেই একথা বলতে চাই—'

ইংরাজ দূতের পানে ফিরে তাকালেন আসফ খাঁ।

'সায়েব শুনলেন?'

ইংরাজ-প্রতিনিধি বললেন, 'শুনলাম—'

'পারবেন ওদের শায়েস্তা করতে?'

ইংরাজ-দূত বললেন. 'যদি বাদশাহ হুকুম দেন—'

'কিন্তু আমার কিছু বক্তব্য আছে।' ওদের কথার মাঝে সৌকত আলী খাঁ বলে উঠলেন, 'শাহানশাহ বাদশাহের অনুমতি হলে বান্দা কিঞ্চিত নিবেদন রাখে—'

বাদশাহ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

সৌকত আলী খাঁ ফিরে আসফ খাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'জনাব ইংরাজ-বণিকের দূত সমস্ত কথা শোনেননি, আরও কিছু বলা দরকার। পরিষ্কার চিত্রটি এই। নবাব শাহনওয়াজ খাঁ হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আর আমি স্বয়ং

বাদশাহের অনুচর—আমরা উভয়েই মর্যাদা ও শক্তির অধিকারী, তবু সামান্য ফিরিঙ্গি-বণিক আমাদের ওপর অত্যাচার করতে ভয় পায় না। এ থেকে অনুমান করে নিন সুবা বাঙলার শত শত নিরীহ দরিদ্র প্রজা কী রকম ব্যবহার পায়? যদি বলেন তার নমুনা দেখাতে পারি। আমার দুজন সাক্ষী আছে—'

ইংরাজ দূত বললে, 'আমি বুঝতে পারছি।'

'তবু চাক্ষুস প্রমাণের জন্যে—'

'সৌকত আলী খাঁ, দরকার নেই।'

সচকিত হল সবাই। বাদশাহ্ শাহজহানের কণ্ঠস্বর! এরকম কণ্ঠস্বর বড় একটা শোনা যায় না। যেমন গম্ভীর তেমনি কর্কশ।

বাদশাহ শাহজহান এতক্ষণ নীরব ছিলেন, সহসা আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মস্তক হতে খসে পড়ল মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য উষ্ণীষ, ক্রোধে কাঁপছেন তিনি। উত্তেজনায় মুখমণ্ডল রক্তিম। বললেন, 'সৌকত আলী খাঁ, সাক্ষীর দরকার নেই। ওদের আমি চিনি। কিছু ভুলিনি। আমি যখন শাহজাদা ছিলাম তখন অসহায় দেখে এই ফিরিঙ্গিরাই আমার সমস্ত দাসদাসী বন্দী করে। অপমানিত হয়েছিলাম আমি ও আমার বেগম। এখন বাদশাহ্ হয়েও তাদের সবাইকে উদ্ধার করতে পারিনি। কতদূর স্পর্ধা বুঝে দেখ—'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন সকলে।

বাদশাহ বলতে লাগলেন, 'অধিকন্তু মিথ্যা বলতেও ওদের মুখে আটকায় না। মনে পড়ছে, ফিরিঙ্গি পর্তুগীজরা পিতাকে বলেছিল যে শাহজাদা খুর্‌রম বাদশাহের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন—তারা সাহায্য না করায় আমি নাকি মিথ্যা দোষারোপ করেছি! চিন্তা করলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সিংহাসনে বসার পর বড় বড় ঝামেলায় ওদের কথা তেমন ভাবতে পারিনি, চাপা পড়েছিল মনের গভীরে। সৌকত আলী খাঁ, তুমি আবার সেটা জাগিয়ে তুললে—' সৌকত আলী খাঁ খুশি হয়ে উঠলেন।

'আমি দুঃখিত জহাঁপনা—'

বাদশাহ্ বললেন, 'আমার বেগমের দুটি দাসী এখনও সপ্তগ্রামে বন্দী আছে। বলেছিলাম ফেরত পাঠাতে—তাও শোনেনি। পর্তুগীজ বণিকের অনেক ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি, আর নয়। শীঘ্রই ওদের দর্প চুর্ণ করব। ইংরাজ দূত, তুমি সাহায্য করতে পার?'

'আদেশ করুন—'

বাদশাহ্ বললেন, 'কাজটা মোটেই কঠিন নয়। চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারবে। এও বলছি তোমরা যা আবেদন করবে তা মঞ্জুর হবে। বুঝতে পারলে?'

'বলুন—'

বাদশাহ্ বললেন, 'শোন, পর্তুগীজের জাহাজ দেখলেই মারবে, পর্তুগীজের

পণ্য দেখলেই লুটবে। সর্বপ্রকারে তাদের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করবে। তাহলেই তোমরা সারা বাঙলা ও উড়িষ্যায় কুঠি খোলার অনুমতি পাবে—'

তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ অভিবাদনে নত সুরাট বন্দরের ইংরাজ কোম্পানির প্রধান। বললে, 'বাদশাহের ফর্মান পেলেই পারি—'

বাদশাহ বললেন, 'কাল প্রভাতে ফর্মান পাবে।'

'আপনার অশেষ অনুগ্রহ—'

ইংরাজ কোম্পানির প্রধানের কপিশ চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে বাণিজ্যক্ষেত্রে—ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে পর্তুগীজ বণিকের সরাসরি শত্রুতা। ছোটখাটো যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেছে ক-জায়গায়। আরব সমুদ্রে, পারস্য উপসাগরে ও সুরাট বন্দরে তার জের চলছে এখনও। এই পরম শত্রুকে বহিষ্কার করতে পারলে তাদের বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়। ইংরাজ বণিক-প্রধানের খুশির কারণ তাই। সে আনন্দে তিনবার ভূমি চুম্বন করে অভিবাদন জানাল।

বাদশাহ উজীর-শ্বশুরের পানে তাকালেন: 'সায়েব, ফিরিঙ্গি দমনে কাকে পাঠাবেন স্থির করেছেন?'

আসফ খাঁ বললেন, 'সেনাপতি ফিদাই খাঁ—'

'না। এ তার কর্ম নয়। আপনি আগামীকাল সেনাপতি কাশেম খাঁকে তলব করবেন। বাঙলা মুলুকে ফিরিঙ্গি নিশ্চিহ্ন করতে পারে সে-ই—'

আসফ খাঁ বললেন, 'যো হুকুম জনাব।'

'আর চন্দ্রকান্তের পুত্র কাল থেকে একহাজারী মনসবদার—'

আসফ খাঁ বললেন, 'আপনার মেহেরবানী।'

সকলে অভিবাদন করলেন। আবার তঞ্জাম এল. বাদশাহ রঙমহলের দিকে চলে গেলেন।

মন ভরে গেছে খুশিতে। উজীর আসফ খাঁ যথেষ্ট করেছেন। কন্যা বাদশাহ বেগমের অনুরোধ রক্ষা ছাড়াও স্বেচ্ছায় উজীরোচিত সহযোগিতা ও সাহায্য—যা তার মতো সাধারণ যুবার পক্ষে আশাতীত। আম-দরবারে পরিচিতি জবর হয়েছিল, উজীর আসফ খাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন সৌকত আলী খাঁ ও শাহনওয়াজ খাঁ। শেষোক্ত দুজনের আগমন ও সাক্ষাৎ অপ্রত্যাশিত। তাঁদের বক্তব্য আরও জোরদার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সৌকত আলী খাঁ-ই তাকে মোটামুটি চেনেন—অতীতের পরিচয় জানেন। উজীর আসফ খাঁ-র আবেদনের সঙ্গে তাঁর ও নবাব শাহনওয়াজ খাঁর বক্তব্য মিশে আম-দরবারেই আবহাওয়া অনুকূল হয়ে উঠেছিল—খাস দরবারে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেল। বাদশাহ বিস্মৃত হননি পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার, তেমনি মনে রেখেছেন তার কথাও। ফিরিঙ্গিদের কথাই বেশি করে ভেবেছেন বাদশাহ, একদা অপমানিত হয়েছেন তিনি, রাজকার্যে নানা

ব্যাপারে বিজড়িত থাকায় এদিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারেননি। অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছে সেই পুরনো অপমানের আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছেন তিনি। ফিরিঙ্গি-বিনাশের যে আয়োজন তিনি করেছেন, একদিকে ইংরাজদের প্রতি জাহাজ ও পণ্য বিনষ্টির আদেশ এবং অন্যদিকে সেনাপতি কাশেম খাঁর তলব অর্থাৎ বাঙলা মুলুকে জলদস্যু দমনে যাবে শক্তিশালী বাদশাহী সেনা, এতদিন সৌকত আলী খাঁ যা পারেননি এবার তা সম্পূর্ণ হবে—পর্তুগীজ-ফিরিঙ্গি নিশ্চিহ্ন হবে বাঙলা-মুলুকে। সকলেই তা চেয়েছে—অন্তত যাঁরা এসেছেন দরবারে নালিশ জানাতে। নবাব শাহনওয়াজ খাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, সৌকত আলী খাঁ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। মনোরমা-মাসিমাদের ইহকাল রক্ষা পাবে, ইন্দিরাদের আর পাগল হতে হবে না। শান্তি নেমে আসবে গঙ্গার কুলে কুলে—নিশ্চিন্তে ঘুমবে বাঙলার গ্রামবাসীরা। বাদশাশাজহানের মঙ্গল হোক।

বেশ রাত হয়ে গেছে। যমুনার বুক নিথর। বাতাস বইছে অতি মৃদু। গুমোট গরম। একা হেঁটে আসছিল সূর্যকান্ত। বৃষ্টি আসতে পারে। এরকম থম-ধরা মেঘ আর গুমোট আবহাওয়ায় আচমকা ধুলি-ঝড় উঠে ঝমঝমিয়ে নামতে পারে বৃষ্টি। পথে আটকা পড়া বিচিত্র নয়। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সূর্যকান্ত। ঘেমে উঠেছে শরীর, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে কপালে। জনবিরল পথ। ক্কচিৎ দু-একজন পথচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'কে? কে তুমি?'

সামনে নয়, পেছনে। লাফিয়ে এগিয়ে এসেছে দৈত্যাকৃতি একটা লোক। কটি মুহূর্ত মাত্র। উত্তর দিল না লোকটি, প্রতিরোধের অবকাশ পেল না সূর্যকান্ত, অন্ধকারে লোকটির হাত উর্ধ্বে উঠল এবং আঘাত পড়ল মাথায়। অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে এল। সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

'তাড়াতাড়ি নিয়ে চল্। কেউ এসে পড়বে—'

জোবেদা তাড়া দিল।

'নৌকো ঠিক আছে তো?'

আখতাব হালকা বোঝার মতো অনায়াসে কাঁধে তুলল।

'আছে। চল্—'

আগে আগে জোবেদা— পেছনে আখতাব।

ছোট একটা নৌকো আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। অচেতন সূর্যকান্তকে তাতে তুলল আখতাব। মাঝি নির্দেশ পেল পানিকটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে। জোবেদা বসল শিয়রে। কিছুলোক দূর থেকে এটা দেখল। একজন আসফ খাঁর অনুচর বঘ্‌রা খাঁ অন্যজন সূর্যকান্তের সহচর রাঘব। বঘ্‌রা খাঁ দাঁড়িয়ে রইল রাঘবের ওপর চোখ রেখে। রাঘব সামান্য দূরে, বিচলিত খুব, সে এসেছিল ঘুরতে ঘুরতে— মহারাজের সন্ধানেই। যমুনা-সংলগ্ন তীরে শোভিত আলোকমালায়

দূর থেকে প্রথমে বুঝতে পারেনি, আগ্রার পথেঘাটে এমন ঘটনা ঘটে : কাঁধে-ফেলা মানুষটাকে যখন নৌকোয় শুইয়ে রাখা হল তখন কেমন সন্দেহ জাগল—চেনা চেনা ঠেকছে যেন। তীর ধরে হাঁটা শুরু করল সে। মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ উঁকি দিয়েছে, অমলিন জ্যোৎস্নায় যমুনাতট প্লাবিত। গ্রীষ্মকালের আকাশ—কখনও কালো কখনও আলো। পানি ফটকে নৌকো প্রবেশের সময়ে সে মুখখানি দেখতে পেল চাঁদের আলোয়— আপাদমস্তক শিউরে উঠল। এ যে মহারাজ! কী করবে সহসা স্থির করতে পারল না। শুধু বুঝতে পারল মহারাজ বিপদে পড়েছেন, তাঁকে গুপ্তপথে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছেন মহারাজ?—রাঘব নিঃশব্দে অনুসরণ করল।

বখ্‌বা খাঁ ফিরে চলল আসফ খাঁর সন্নিধানে।

।। উনিশ ।।

যখন চেতনা ফিরে এল সে দেখল একটি কক্ষ, কিন্তু বুঝতে পারল না কক্ষটি কার এবং শয্যা এত আরামদায়ক কেন? তবু স্বস্তি, মাথার যন্ত্রণা কম মনে হচ্ছিল। কী হয়েছিল তার? ধীরে ধীরে মনে এল পূর্ব ঘটনা—মাথায় আঘাত করে তাকে ধরে আনা হয়েছে এখানে। কিন্তু কেন? সে কার কী ক্ষতি করেছে?'

সূর্যকান্ত চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাল। একেবারে অপরিচিত কক্ষ—কখনও আসেনি এখানে। অদ্ভুত গঠন। দুহাতের বেশি প্রশস্ত হবে না কক্ষটি কিন্তু দৈর্ঘ্যে অনেকখানি টানা বারান্দার মতো। অথচ বারান্দা নয়, কক্ষসুলভ উপকরণ চারিদিকে সাজানো। সুসজ্জিত তো বটেই উপকরণগুলো রীতিমতো দামী ও রুচি সম্মত! সাধারণ ধনীগৃহেও এরকম উপকরণ দেখা যায় না, নবাব বাদশাহের নিভৃত কক্ষগুলি এভাবে সাজানো হয়, বিলাস-সামগ্রীর অভাব যাদের নেই। তবে কী সে বাদশাহেরই কোনো নিভৃত কক্ষে আটকা পড়ে গেছে, কে আনল এখানে? এবং কেন?—আঘাতকারী লোকটাকে চেনা যায়নি, তার সঙ্গে একজন রমণীও ছিল। তাদের দুজনই অপরিচিত, আগে কখনও দেখেনি, তাদের কী স্বার্থ?

বিস্মিত হচ্ছিল সূর্যকান্ত—কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। কারা এরা? কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছিল সূর্যকান্ত। শিয়রে দাঁড়িয়েছিল জোবেদা সে দেখতে পায়নি। জোবেদা এসে বসল তার শয্যার পাশে। রীতিমতো বেসামাল জোবেদা—প্রচুর মদ খেয়েছে। নেশায় ছোট চোখ আরও ছোট হয়ে এসেছে, রঙ হয়েছে লাল। চেপটা নাক, রুক্ষ চুল। চোয়ালের নরম মাংস ঝুলে গেছে—হাত পা শিথিল। শক্ত হয়ে আছে শুধু কটিদেশে আবদ্ধ কৃপাণটি। সূর্যকান্ত জানত, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তাতার-রমণী ব্যতীত অন্য কোনো জাতের স্ত্রীলোক মোগল-

বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতিহারীর পদ পায় না। বুঝতে পারল তার পার্শ্বে উপবিষ্ট রমণী তাতারী এবং এটি মোগল-বাদশাহের অন্তঃপুর।

কিন্তু তাতারী তার পাশে বসল কেন? কী চায়? সূর্যকান্ত জানত তাতারীর অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ওরা বেপরোয়া তার ওপর যদি নেশা করে থাকে—'

জোবেদা বললে, 'বাঃ এই তো জেগেছিস দেখি। বড় চোট লেগেছে। না? ব্যথা আছে?'

সূর্যকান্ত ভয়ে ভয়ে বললে, 'না —'

'টিপে দেব?'

সূর্যকান্ত আবার বললে, 'না—'

'তুই বড় বেরসিক। আচ্ছা একটু শরাব খা।'

সূর্যকান্ত ঢোক গিলল, 'আমি শরাব খাইনে—'

'খা। শরাব খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবি। তাগদ পাবি।'

কাপড়ের মধ্যে লুকানো ছিল চর্মনির্মিত আধার, জোবেদা সেটা বার করল। মুখ ঘুরিয়ে নিল সূর্যকান্ত। জোবেদা হেসে উঠল। বললে, 'খাসা চীজ। খেলে দিল্ তর্ হয়ে যাবে—'

বলে হাতে ঢেলে, জলের ঝাপটা দেবার মতো ছিটিয়ে দিলে অনিচ্ছুক সূর্যকান্তর মুখে। বিশ্রী লাগল। প্রতিবাদস্বরূপ সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার জন্যে ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। জোবেদা জড়িয়ে ধরল।

সূর্যকান্ত বললে, 'ছাড়ো—'

জোবেদা আলিঙ্গন দৃঢ়তর করে বললে, 'তোমার মতো মরদ পেলে কী ছাড়া যায়? শরাবের চেয়েও জবর নেশা তোমার শরীরে—'

'ছাড়ো বলছি—' ঝটকা মেরে ছাড়াতে চাইল।

কিন্তু জোবেদার তাতারীর বাহু দৃঢ় হয়ে উঠল আরও। পিষে ধরল আলিঙ্গনে। দম আটকে এল সূর্যকান্তর।

'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি—'

'আখতাব যখন নৌকোয় তুলল তখন থেকে দেখে আসছি। আমার শরীরে মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিস। এ আগুন না নেবালে তোকে ছাড়ছিনে—'

তীব্র আসঙ্গ-লিপ্সায় আসুরিক ক্ষমতা। হিংস্রতায় টলমল করছে শরীর। যেন এক বাঘিনী পেয়েছে রক্তের স্বাদ। বাহুর বাঁধনে চেপে সে অবশ করে আনছিল দুর্বল সূর্যকান্তকে। ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল পালংক অবধি। নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠেছে। শিথিল অঙ্গে বজ্রের শক্তি। মুক্তি বুঝি নেই!

পালংকে চেপে ধরেছে বুক দিয়ে। পেশল আলিঙ্গন। সুরার দুর্গন্ধ মুখে, পুরু ঠোঁট। চোখের তারায় আদিম হিংস্রতা, কপালে ঘাম। বলিষ্ঠ কালো চেহারা বীভৎস হয়ে উঠেছে। যেন রক্তপান করতে চায় কোনো দানবী। হাতের পাক

জড়ানো গলায়, মুহূর্তে মুখ নেমে এল ঠোঁটের উদ্দেশ্যে, সূর্যকান্ত ঠেলে দিল জোরে, ছিটকে পড়ল জোবেদা। দেওয়ালের গায়ে ঠেকে নাগিনীর মতো ফুঁসতে লাগল সে। ভস্ম করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'ঠেলে ফেলে দিলি? বড় দেমাক। মেয়েমানুষে অরুচি। কিন্তু তোকে আমার চাই—চাই—চাই—'

দম নিয়ে বললে, 'সেরে ওঠ্। সুস্থ হ'। তখন আমার কদর বুঝবি। আমি বুঝিয়ে দেব। 'পুরুষমানুষ কি করে ঘাটাতে হয় আমি জানি—'

কথা নয় যেন হিসহিসানি। সাপিনী। প্রত্যাখ্যানের আঘাতে বিপর্যস্ত জোবেদা।

সূর্যকান্ত শুয়ে রইল চুপচাপ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। কারা যেন আসছে। আসুক — যে কেউ এসে উদ্ধার করুক। এমন বিপদে সে আর কখনও পড়েনি— কামাতুরা নারী!

নরম পায়ের শব্দ। ঢুকল দুজন স্ত্রীলোক। একজন কিশোরী অপরজন যুবতী। দুজনেই অপূর্ব সুন্দরী। কিশোরী দেখতে অনেকটা বিদেশিনীর মতো— গোলাপের মতো রক্তাভ গায়ের রঙ, অভিজাত সাজসজ্জা, বেশ পিঙ্গল ও চোখের মণি পীতবর্ণ, ঋজু সুঠাম শরীর। চলনে আভিজাত্যের গরিমা। কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল যেন জ্যোতিস্বরূপা। কিশোরী তার রূপ ও আভিজাত্য সম্বন্ধে সচেতন। মনে হয় বাদশাহের কোনো নিকট আত্মীয়া।

দ্বিতীয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি—সুন্দরী সে-ও। পদ্মরাগ মণির মতো উজ্জ্বল দেহবর্ণ, তন্বী, বিম্বাধরোষ্ঠী। সুপ্রচুর কুঞ্চিত ও আদ্র কেশরাশি পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে কোমর অবধি, গুরু নিতম্ব, ক্ষীণ কটি, পীনোন্নত বুক। সুযৌবনা। বক্ষের গঠনে ও নিতম্বের ভাঁজে নৃত্যের কৌশল লুকানো বুঝি —স্পষ্ট পরিষ্কার ঢেউ। যুবতী কী নৃত্য-পটীয়সী।

বিস্মৃতির মধ্যে ঈষৎ দোলা। এরকম নৃত্য-শরীর কবে কোথায় যেন সে দেখেছিল। সে কী বাস্তবে? সে কী স্বপ্নে?

কিন্তু কিছুই যে স্মরণে নেই!

দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে উঠেছিল—সূর্যকান্ত দাঁড়িয়েছিল নতমস্তকে। বুঝতে পারছে না এরা কারা এবং কি জন্যে এসেছে?

সংকুচিত হয়ে পড়েছিল সে।

যুবতী তার আড়ষ্ট ভাব দেখল। ক' মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল সূর্যকান্ত তাকে চিনতে পারেনি, অধর দংশন করল।

বললে, 'চিনতে পারছো না? ভাল করে চেয়ে দেখ। আমি গুলরুখ—'

সূর্যকান্ত চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। চেনা-চেনা লাগছে বটে কিন্তু বড় ঝাপসা। পরিচয় ছিল নাকি এই সুন্দরীর সঙ্গে? কোথায়?

গুলরুখ বললে, 'মনে পড়ে না?'

সূর্যকান্ত চুপ।

গুলরুখ বললে, 'কিছু মনে নেই?'

নীরবতা।

গুলরুখ ফিরে তাকাল কিশোরীর পানে ঃ 'শাহজাদী, আমার কী হবে? উনি যে চিনতে পারছেন না—'বলে চোখে রেশমি রুমাল চাপা দিল। ফুঁপিয়ে উঠল।'

কিশোরী বললে, 'কাদিসনে গুলরুখ।' আমি দেখছি। সে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'দৌলত খাঁ, তুমি কী তোমার বিবাহিতা পত্নীকে চিনতে পারছো না?'

বিবাহিতা পত্নী! দৌলত খাঁ!

একসঙ্গে পর পর দুটো চমক সামলে ওঠা শক্ত। সুন্দরী কিশোরী বলে কী! সূর্যকান্ত দেওয়াল ধরে টাল সামলে নিল।

এ আবার কী ফাসাদ! কিশোরী বললে, 'কথা বলছো না কেন? আমার কথার জবাব দাও—' কণ্ঠে আদেশের সুর।

সূর্যকান্ত বিড়বিড় করল, 'কী উত্তর দেব বুঝতে পারছিনে—'

'বটে।' কিশোরী যেন ক্রোধদীপ্তা ঃ 'তুমি জানো আমি কে? সূর্যকান্ত সভয়ে বললে, 'আজ্ঞে না।'

'আমি শাহজাদী জহানারা বেগম—'

সূর্যকান্ত তটস্থ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন করে সম্মান প্রদর্শন করল।

কিন্তু বিশেষ খুশি মনে হল না জহানারাকে। সে উপর্যুপরি প্রশ্নবানে বিব্রত করে তুলল। স্বরে কিশোরী-সুলভ চপলতা ও দম্ভ। চপলতা বয়সের জন্য, দম্ভের কারণ সে বাদশাহজাদী। বোঝা যায় সে অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী। এবং এও অস্পষ্ট নয় যে, গুলরুখ তার প্রিয় পাত্রী।

'তুমি কোথায় এসেছো তা কী অনুমান করতে পারো?'

সূর্যকান্ত বললে, 'সম্ভবতঃ আগ্রা দুর্গের অন্তঃপুর—' 'কতকটা তাই। অন্তঃপুর নয়, অন্তঃপুরে প্রবেশের আগে গুপ্তপথ এটা। কিন্তু কেন এখানে আনা হয়েছে তা কী অনুমান করতে পারো?'

সূর্যকান্ত মাথা নাড়ল ঃ 'ভাবছি সে কথাই—'

'বুঝতে পারোনি! আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি।' সে গুলরুখকে দেখিয়ে বললে, 'চেনো একে?'

সূর্যকান্ত চুপ করে রইল।

'কথার উত্তর দাও।'

'সূর্যকান্ত বললে, 'চিনতে পারছিনে—'

'আগে কখনও দেখনি?'

'স্মরণ হয় না—'

'তবু স্বীকার করবে না। মিথ্যা বলার শাস্তি কি জানো?'

'আমি মিথ্যা বলিনি—'

'শুধু সাফাই গাইছো? খোজা—'

চেঁচিয়ে উঠল জহানারা। তার রক্তিম মুখে আরও রক্ত জমেছে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

দুজন কাফ্রী ও দুজন তাতারী প্রতিহারী নিঃশব্দে এগিয়ে এল এবং সূর্যকান্তর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল আদেশের অপেক্ষায়। সূর্যকান্ত অভ্যাসবশতঃ কটিদেশে হাত রাখল, দেখল তরবারি নেই। খুলে রেখে দিয়েছে কেউ তার অজ্ঞান অবস্থায়। সে প্রতিহারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

জহানারা বললে, 'এখনও বলছি একে চেনো কিনা বলো?'

'বলেছি তো চিনিনে।'

'এ তোমার জেদ দৌলত খাঁ—'

'কী বললেন? দয়া করে জেনে রাখুন আমার নাম সূর্যকান্ত।'

'কক্ষনো না। তোমার নাম দৌলত খাঁ—

সূর্যকান্ত বিব্রত বিস্ময়ে বললে, 'শাহজাদী, আপনি বার বার যে নাম উচ্চারণ করছেন তা আমি কখনও শুনিনি। আমি হিন্দু, আমার নিবাস বাঙলা মুলুকে। আমার নাম সূর্যকান্ত, আমার পিতার নাম চন্দ্রকান্ত রায়। বিশ্বাস না হয় সৌকত আলী খাঁ, শাহনওয়াজ খাঁ প্রভৃতি আমীরদের জিজ্ঞেস করতে পারেন—আমার পরিচয় একটাই—'

জহানারা থমকে গেল। সে তাকাল গুলরুখের পানে। গুলরুখ দেখল সব বুঝি ফেঁসে যায়। আর, এ ফাঁসা মানে তারই মিথ্যাবাদিনী সাব্যস্ত হওয়া। সে তাড়াতাড়ি শাহজাদীর কানে নিচুস্বরে বললে, 'বেগম সায়েব, কী আর বলব দুঃখের কথা। উনি পাগল হওয়া অবধি ও-রকমই বলেন। বাঙলা মুলুকে সরকার সাতগাঁয়ে 'তিনা'কে প্রথমে ওই পরিচয়ই দিয়েছিলেন—অনেকে বিশ্বাস করে ওর কথাগুলো সত্যি মনে করেন। সবই অদৃষ্টের দোষ, আমি এখন কী করব বাদশাশাহজাদী!'

যথারীতি ফোঁপাতে লাগল গুলরুখ।

জহানারা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কাঁদিসনে গুলরুখ, চুপ কর। তোকে কাঁদতে দেখলে আমার বুকের মধ্যে হু হু করে। আমি দুদিনে খাঁ-সায়েবের পাগলামি দূর করে দেব। পাগলামি সারাবার দাওয়াই আমি জানি। তুই চুপ কর।'

ফোঁপানি কমে এল গুলরুখের। শাহজাদীর কাছে কবুল করেছে স্বামী বলে, ফিরে আসার পথ তো খোলা নেই। হাতের তীর আর মুখের কথা ফিরে আসে না। এগিয়ে যেতেই হবে। জীবন বাজি ধরেছে। মিথ্যা প্রমাণিত হলে তারই যে গর্দান যাবে। কলুষ প্রণয়ের কোনো ক্ষমা নেই এ রাজত্বে। এখন পিছিয়ে আসা মানে সেই মৃত্যু আহ্বান করা। তা পারে না গুলরুখ।

আর, কেনই-বা ঝুঁকি নেবে? পুরুষের ঠুনকো আদর্শবাদ ঢের সে দেখেছে।

কত আমীর উজীর তলিয়ে গেল তার চোখের কটাক্ষে আর এ তো এক সামান্য বাঙালি যুবক—আপাততঃ যার না-আছে চাল না-আছে চুলো। প্রত্যাখ্যান এল কিনা তারই কাছ থেকে!—এ যে নারীত্বের অপমান! ওকে বশীভূত করে ফিরে পেতে হবে সেই মর্যাদা—যা নিতান্ত অবহেলায় পায়ে দলে চলে যেতে চায় ওই উদ্ধত যুবক। এমন সুন্দর যার রূপ ও কণ্ঠস্বর সে এত নির্দয় কেন? নারী কী তার অবহেলার বস্তু? প্রণয়ের বাহুপাশে একটি বার কী তাকে বাঁধতে পারে না? অপবিত্র হয়ে যাবে ওর আদর্শ?—এত দেমাক!

নিজের পক্ষে কঠিন হবে মনে করে শাহজাদীকে বলা—তার সাহায্য নেওয়া। শাহজাদীর প্রিয়পাত্রী সে—যথার্থ ভালবাসেন। সাহায্যের জন্যে সত্যি এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু পারবেন কী? ওর কঠিন ভঙ্গি আর সত্যবাদিতা দেখে ভয় করে। এখনি তো ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল সব—অনেক কষ্টে সামলেছে। এখন দেখা যাক শাহজাদীর দাওয়াই কী বলে? বেশি কচলাতে গেলে লেবু নাকি তেতো হয়ে যায়। শাহজাদীর যা মেজাজ, হিতে বিপরীত না হয়!

গুলরুখ কান্না থামাল বটে কিন্তু আশঙ্কা দূর করতে পারল না মন থেকে।

জহানারা পদোচিত গাম্ভীর্যে বলে উঠল, 'শোন যুবক, তুমি যতই অস্বীকার করো আমি জানি, তুমি হিন্দু নও, মুসলমান, তোমার নাম দৌলত খাঁ আর তুমি এই বিবির খসম—'

সূর্যকান্ত বিনীত স্বরে বললে, 'আমার গোস্তাফি মাফ হোক। আপনি এ তথ্য জানলেন কীভাবে?'

'কেন, গুলরুখ বলেছে।'

'তিনি সত্য বলেননি—'

'মানে?' কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল জহানারা।

সূর্যকান্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমি আগে যা বলেছি সেটাই সত্য। আপনি যা শুনেছেন তা মিথ্যে—'

'বটে। গুলরুখ মিথ্যে বলেছে?' ক্রোধে জ্বলে উঠল জহানারা।

এইখানে ভয়। শাহজাদী রেগে উঠলেই সর্বনাশ। গুলরুখ ফের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল, দ্রুতকণ্ঠে বললে, 'শাহজাদী ও বদ্ধ পাগল, ওর সঙ্গে তর্ক করে কী হবে? এক কথা বার বার বলাই ওর পাগলামি—'

'তাই দেখছি। বড্ড বাড়াবাড়ি। ওর জেদ এবার ভাঙছি।' জহানারা বললে, 'তুমি তাহলে হিন্দু?'

সূর্যকান্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বেশ। আজকাল অনেক হিন্দু মুসলমান হচ্ছে। তোমাকে যদি মুসলমান হতে বলি, আপত্তি আছে?'

সূর্যকান্ত বললে, 'আছে। কিন্তু আপনি এ অন্যায় জুলুম করবেন কেন?'

'অন্যায় জুলুম নয়। বরং সর্বতোভাবে তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি। তুমি শাদি করবে এই বিবিকে, আমার হুকুম।'

সূর্যকান্ত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বললে, শাহজাদী, আপনি দীন ও দুনিয়ার মালিক, অসীম ক্ষমতা—আপনার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি ততোধিক ক্ষুদ্র আমার ক্ষমতা। আপনার আদেশ অত্যন্ত লোভনীয়, এই সুন্দরী যুবতী যে কোনো পুরুষের একান্ত কাম্য। ওঁর প্রতি কণামাত্র অসম্মান প্রকাশ না করেই বলছি আমি হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম বিসর্জন দেব না কোনো লোভেই। আপনি মাফ করুন—'

জহানারা দাঁত বসাল ওষ্ঠেঃ 'তুমি বিবেচনা করে দেখ।'

'আপনার মেহেরবানীর মর্যাদা রাখতে পারলুম না, আমি দুঃখিত। শাহজাদী, আমার অন্য জবাব নেই—'

জহানারা বললে, 'খাঁ সায়েব, শাহজহান বাদশাহের মুলুকে মুসলমান যদি কাফের বলে পরিচয় দেয় তাহলে তার শাস্তি কী হয় জানো?'

'জানি। কিন্তু শাহজাদী আমি তো মুসলমান নই, সুতরাং কোরানের দণ্ড আমার প্রাপ্য নয়—'

'বার বার সেই এক কথা।'

'আমি নিরুপায়—'

'তুমি ইচ্ছে করে শূলে যেতে চাইছো।'

'আপনার অভিপ্রায় —'

'তবে তাই যাও।'

জহানারা ইংগিত করল খোজাদের। খোজারা তার চোখ বাঁধল, কাঁধে তুলল। মুহূর্তে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে গুলরুখ কোনো বাধা দিতে পারল না।

যেখানে সূর্যকান্ত শয্যাশায়ী ছিল সেটা কক্ষ নয়—আগ্রা দুর্গের অন্তঃপুরে বিশালাকার প্রাচীর মধ্যে একটি গুপ্তপথ মাত্র। খোজাদের পেছন পেছন জহানারা চলে যায় দেখে বিষণ্ণ হল গুলরুখ, দেখতে পেল শাহজাদী অনেকখানি দূরে। এখন ডাকা যায় না, বলা যায় না কোনো কথা। সে যা ভাবেনি অবশেষে তাই ঘটতে চলেছে। ঘটনা চলে যাচ্ছে তার আয়ত্তের বাইরে। শাহজাদীর আদেশ বড় নিষ্ঠুরের মতো বুকে বেজেছে। প্রাণই যদি নেবে তবে কাকে ভালবাসবে গুলরুখ? অমন সুন্দর রূপবান পুরুষ চলে গেলে কী লাভ তার নিজের বেঁচে থেকে? এ হত্যাকাণ্ডের জন্যে মূলতঃ সে-ই কী দায়ী নয়? একজন নিরীহ ভদ্র যুবকের প্রাণ নিলে কী ভালবাসার ক্ষুধা মেটে? কেউ পেরেছে মেটাতে?

হলেই-বা এক তরফা ভালবাসা?—যুবক নাই-বা ভালবাসল, তার ভালবাসা

তো মিথ্যা নয়! প্রতিদান পায়নি, বরং প্রত্যাক্ষান বারে বারে। প্রতিশোধের বাসনাই জেগেছিল—নারীদের অপমানে নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠেছিল হৃদয়। কিন্তু এখন চোখে জল ভরে আসে কেন? বুকের ভেতর কী যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

সময় কী পার হয়ে গেছে? দেরি হল কী?

গুলরুখ যাবার জন্যে পা বাড়াল—টান পড়ল পেছনে। হাত টেনে ধরেছে জোবেদা।

'কী রে?' গুলরুখ বিস্মিত।

'বিবিসায়েব, একটা কথা রাখবে?'

'এখন থাক পরে বলিস।'

'না। এখনই শুনতে হবে—'

'খুব জরুরী?'

'হ্যা—'

'বল্। দেরি করিসনে।'

'কিন্তু রাখতে হবে—'

'শুনি আগে।'

'বিবিসায়েব, তোমার খসমটা তালাক দাও—'

'তালাক দেব? কেন?'

'অমন কড়া খসম তুমি পোষ মানাতে পারবে না—'

বিরক্ত হল গুলরুখ: সে প্রাণে বাঁচে কি না সন্দেহ আর তুই পোষ মানার কথা ভাবছিস! সরে যা। আমি মরছি আমার জ্বালায়—'

'তুমি তালাক দাও।' জোবেদা নির্বিকার: 'আমি ওকে পোষ মানাব।'

'তুই পোষ মানাবি? নোলা সকসক করে উঠেছে তাই না?' তীব্র রোষের দৃষ্টিতে তাকাল গুলরুখ: 'শখ তো কম নয়। হারামজাদী মরবি যে।'

'খবরদার গালি দিও না। মুখ সামাল।' জোবেদা রুখে উঠল, 'বিবিসায়েব, ও খসম তুমি ভোগ করতে পারবে না। অন্ততঃ আমি জীবিত থাকতে—'

'তোকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

'তা খাইও। তার আগে তুমি এখান থেকে ফিরতে পারলে তো—'

'কেন? কী করবি?'

'এই দ্যাখ—'

জোবেদা কটিদেশ থেকে সুদীর্ঘ কৃপাণ বার করল এবং তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল গুলরুখের ওপর। ক্ষুধিত বাঘিনী যেন। সরে না গেলে আঘাত লাগত গুলরুখের। জোবেদাকে ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছিল। গুলরুখ সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠল, 'কে কোথা আছ বাঁচাও। মেরে ফেলল! প্রতিহারী, খোজা—'

'তবে রে—'জোবেদা লাফিয়ে চলে এল গুলরুখের কাছে। চেপে ধরল

দেওয়ালে। বজ্রমুঠিতে মাথার চুল ধরে কৃপাণ তুলল শূন্যে। গুলরুখ যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করল কিন্তু চুল ছাড়াতে না পেরে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—'

অন্তঃপুরের এ প্রাচীর এমন কৌশলে তৈরি যে এ পথে বন্দুকের আওয়াজ হলেও কেউ শুনতে পাবে না, যদি হঠাৎ কেউ এসে না পড়ে। জোবেদা নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু তার হাতের কৃপাণ নামল না। পেছন থেকে কে যেন কৃপাণ ছিনিয়ে নিল এবং ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল দূরে। গুলরুখ ঘাড় সোজা করতে করতে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে অপরিচিত এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। বাঙালির মতো পোশাক—দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। সে সভয়ে বললে, 'তুমি কে? এখানে এলে কী করে?'

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর দিল, 'আমার পরিচয় পরে শুনো। এসেছি পানিফটক সাঁতরিয়ে। বল, মহারাজ কোথায়?'

'মহারাজ?'

'যাকে তোমরা ধরে এনেছো?'

'বধ্যমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় পৌঁছে গেছেন—'

' কোনদিকে ?'

'চলো, আমিও যাচ্ছি—'

'কিন্তু ওর ব্যবস্থা?' বলে জোবেদাকে দেখাল।

'যথা সময়ে হবে। ভালকুত্তা ওর উপযুক্ত সাজা। শাহজাদীকে বলে সে ব্যবস্থাই আমি করব। এসো—'

গুলরুখের সঙ্গে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল রাঘব।

॥ কুড়ি ॥

সূর্যকান্তের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বসেছিলেন—গল্প করছিলেন মনোরমার সঙ্গে। পাশে কখন্ এসে বসেছে ইন্দিরা। সেও গল্প শুনছিল। মথুরা সম্বন্ধে গল্প করতে করতে তিনি চলে এসেছিলেন সূর্যকান্তের বিষয়ে। স্বস্তির সাথে বললেন, 'দীর্ঘকাল পরে সন্ধান পেয়েছি এবার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরব। আমি স্থির করেই বেরিয়েছিলুম, একা ফিরব না। আমার একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বটে কিন্তু আর একটা বাসনা অপূর্ণ থেকে যায় মা—'

'কোন্ বাসনা ঠাকুরমশায়?' মনোরমা হাঁটুতে থুথনি রেখে জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'সে-বাসনা মিটবে কিনা ভগবান জানেন। মনের মধ্যে চাপা আছে দীর্ঘকাল ধরে, তুষের আগুনের মতো ধিকি-ধিকি জ্বলছে, যদি সুযোগ পাই তখন দেখবে। আজ আনন্দের দিনে প্রতিশোধের কথা তুলব না। পর্তুগীজ হার্মাদেরা আমারও কম সর্বনাশ করেনি, মা। সবাই জানে আমার মেয়ে গঙ্গার

ডুবে আত্মহত্যা করেছে—আমি নিজে প্রচার করেছি একথা, না করে উপায় ছিল না, কেউ অবিশ্বাস করেনি, কিন্তু আত্মহত্যা করেনি আমার কিশোরী কন্যা, তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হার্মাদেরা। পরে শুনেছি হার্মাদেরাই মেরে ফেলেছে। .... সে আমার একমাত্র মেয়ে, তিরিশ বছর ধরে আমার বুক খালি হয়ে রয়েছে মা, ভীষণ একটা আক্রোশে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যায়। এই বর্বর হার্মাদদের যদি আমি নিজের হাতে নির্মুল করতে পারতুম—'

'থাক্ ঠাকুরমশায়।' মনোরমা ব্যথিত স্বরে বললে, 'এ দুঃখ একা আপনার নয় আরও অনেক বাপ মায়ের। আপনার কন্যার মতো আমিও হতভাগিনী। কিন্তু মৃত্যু আসেনি—আত্মহত্যা করতে পারিনি। দিনরাত চোখের জল ফেলি আর ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ জানাই। আমার ঠাঁই বোধহয় নরকেও হবে না।'

'ছি ছি। নিজের দুঃখ জানাতে গিয়ে তোমার মনে ব্যথা দিলুম।' গঙ্গাকিশোর লজ্জিত স্বরে বললেন, 'তবে একথা বলে রাখছি মা, সুযোগ যদি পাই এর শোধ আমি তুলবই। সংসারে আমার কেউ নেই, আমি একা সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও চলে যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু স্বয়ং মহারাজার অনুরোধে থেকে যেতে হল রাজ-পুরোহিত হয়ে। বেঁধে ফেললেন রাজ-পরিবারে মঙ্গলার্থে। তিনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, অনেক করেছেন আমার জন্যে। প্রতিদানের কথা কখনও ভাবিনি, তাঁর পুত্র সুর্যকান্তকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি, তাঁকেও আমরা মহারাজ বলে ডাকি। হঠাৎ শুনলাম মহারাজ নিরুদ্দেশ। অবশ্য তার কারণ ছিল। নাবালক দেখে অন্যায়ভাবে রাজত্ব দখল করেছিলেন তাঁর কাকা। কিছুই জানতাম না কোথায় তিনি গেছেন, কেমন আছেন, মন-মেজাজ খুব খারাপ, এমন সময় একদিন ভগ্নদূতের মতো এসে হাজির রাঘব। তার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনলাম এবং সেদিনই বিশ্বস্ত কিছু লোকবল সংগ্রহ করে রওনা হলাম সপ্তগ্রামে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনই, মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম না। আমি, সৌকত আলী খাঁ, রাঘব নানাসূত্রে চেষ্টা করে যখন তোমার বাড়ির সন্ধান পেলাম তখন তোমরা বেরিয়ে পড়েছো পথে। কী আর করি? সৌকত আলী খাঁ নির্দেশ দিলেন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। মখসুসাবাদে—নবাব শাহনওয়াজ খাঁ সপরিবারে আসছিলেন আগ্রায়, আমি আর রাঘব ভিড়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে।...এখানে এসেও কত খুজেছি, দেখা পাইনি। কিন্তু থাকার একটা আস্তানা চাই তো, আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম মথুরায় আর রাঘব গোঁয়ারগোবিন্দের মতো রয়ে গেল এখানেই। তার সঙ্গেও বহুকাল সাক্ষাৎ নেই—'

'এখানে আপনার আলাপ হয়নি কারো সাথে?'

'হয়েছিল।' গঙ্গাকিশোর বললেন, 'আমিনউদ্দৌল্লা আসফ খাঁ।.... শাহনওয়াজ খাঁ আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আসফ খাঁ কৃপাপরবশতঃ চাকুরি দিতে চেয়েছিলেন,

কিন্তু মা কী হবে আমার চাকুরি? একটা তো পেট— কোনো রকমে চলে যাবে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মথুরায় গিয়ে ঈশ্বর উপাসনায় মেতে গিয়েছিলুম—'

'আবার তো আসতে হল আগ্রায়?'

'তা হল।' গঙ্গাকিশোর উদ্ভাসিত হলেন, 'আমার একটা উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে—মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। এ কী কম আনন্দ, মা? বাদশাহ বেগমের পেয়াদা গিয়ে যখন বললে এক বাঙালি-বিয়ের পুরুত হতে হবে, সত্যি বলতে কি, আমি খুব খুশি হইনি। কিন্তু তাঁর রাজত্বে বাস করছি, অসম্মান করতে চাইনি বলেই দ্বিধা কাটিয়ে চলে এলুম। —ভাগ্যিস এলুম! আমাদের মহারাজের বিয়ে আর আমি তার পুরোহিত, ভাবতেই রীতমতো শিহরণ জাগছে। মহারাজের পছন্দের তারিফ করি। ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকরুন! আমাদের মহারানী হবার উপযুক্ত বটে—'

ইন্দিরার পানে অপাঙ্গে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেন।

লজ্জা পেল ইন্দিরা। এতক্ষণ মনোরমার আড়ালে বসে গল্প শুনছিল তন্ময় হয়ে, বিয়ের কথা আর রূপের প্রশংসা শুনে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—তাড়াতাড়ি কক্ষান্তরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। গঙ্গাকিশোর হো হো শব্দে হেসে উঠে বললেন, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও মা মহারানী, একটা সুখবর শুনে যাও—'

ইন্দিরা দাঁড়াল না, ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। লজ্জায় আনন্দে তার বুক ঢিপঢিপ করছিল। একেবারে আড়ালে যেতে পারল না, দরজার পাল্লার পাশে দাঁড়াল চুপ করে। গঙ্গাকিশোর বললেন, 'দেশের সঙ্গে মহারাজের তো কোনো সম্পর্ক নেই— আমি কিন্তু খবর রাখি সব। মহারাজের খুড়োমশায়ের সংকটাপন্ন ব্যাধি—বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রণসাগরের সিংহাসন এখন শূন্য। পরগণা বরবক সিংহের সনন্দ নিয়ে আমরা দেশে যাব, বিয়ের পর রণসাগরের একেবারে মহারানী হয়েই তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে, বলো এটা সুখবর কিনা—'

ইন্দিরা আনন্দে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বুকের নিচে বালিশ চেপে আবেগে বিড়বিড় করে উঠল, 'রাজা, আমার রাজা—'

সে চোখ মুছতে লাগল। আনন্দে তার চোখে জল এসে গেছে।

এ অনুভূতিকে আরও রস-মধুর করার জন্যেই যেন আগ্রা দুর্গের দিল্লি ফটকে নবহতে দ্বিতীয় প্রহরের সুর বদলে মধ্যরাত্রির রাগ মালকোষ শুরু হল। প্রহরে প্রহরে সুর বদলায় নবহত। মনোরমা তা জানত। অস্পষ্টভাবে বদলি নহবতের সুর শুনে সে সচকিত হল। গঙ্গাকিশোর তা লক্ষ্য করলেন, বললেন, 'কি ভাবছো মা?'

মনোরমা উৎকণ্ঠা চেপে বললে, 'ঠাকুরমশাই, গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি। সূর্যকান্ত তো এখনও ফিরল না?'

'তাই তো! গঙ্গাকিশোর বললেন, 'এখন রাত কত?'

'দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়ে তৃতীয় প্রহর শুরু।'

'তার মানে মধ্যরাত্রি।' গঙ্গাকিশোর বললেন, 'বাদশাহ কী এত রাত অবধি দরবারে থাকেন?'

মনোরমা বললে, 'শুনিনি কখনও।'

'আমি দেখছি।' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গঙ্গাকিশোর : 'খোঁজ নিয়ে আসি—'

'কোথায় যাবেন?'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'যেতে আসতে যেটুকু সময় লাগে—'

তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন আগ্রা দুর্গের দিল্লি ফটক পর্যন্ত। নহবতের সুর রাত্রির বাতাস মথিত করে তুলছিল। কিন্তু জনপ্রাণী নেই, চারিদিক যেমন নীরব তেমনি নিস্তব্ধ। তিনি দিল্লি ফটক থেকে অমর সিংহ ফটকের সমুখ পর্যন্ত অনুসন্ধান করলেন। কোথাও কারো সাথে সাক্ষাৎ হল না। মনসবদারের শিবিরে শিবিরে শুধু এক-একজন প্রহরী ব্যতীত সকলেই সুষুপ্তিমগ্ন, অমর সিংহ ফটক জনশূন্য। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দরবার শেষ হয়ে গেছে এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই, সমস্ত চাঞ্চল্য স্তব্ধ। নহবত ককিয়ে ককিয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ শুনলেন চুপচাপ। মহারাজ তাহলে গেলেন কোথায়?

তিনি হাঁটা শুরু করলেন আমিনউদ্দৌল্লা আসফ খাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে। মনে পড়ল সপ্তগ্রাম থেকে আগ্রায় যখন এসেছিলেন তখন শাহনওয়াজ খাঁ তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—নবাব আসফ খাঁর সহৃদয় ব্যবহার তিনি বিস্মৃত হননি। আসফ খাঁ চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন চাকরি গ্রহণ করেননি এখন এ সংবাদটুকু দিতে পারলেই কৃতার্থ হবেন। দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

যমুনাতীরে বারদুয়ারীতে বসেছিলেন আসফ খাঁ। যদিও মধ্যরাত্রি—সুরম্য বারদুয়ারীর অভ্যন্তরে সুখাসনে বসে তিনি তখন নৃত্য উপভোগ করছিলেন। সুন্দরী ইরানী ক্রীতদাসীদের দেহভঙ্গিম নৃত্যে তাঁর ঝিমনো রক্তে দোলা লাগছিল। সভাসদগণ তারিফ করছিল, তিনি ক্লান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন। বয়স হয়েছে—রসোপভোগ করতে পারেন কিন্তু উদ্দাম হতে আর পারেন না। মজলিসে বসে কাজের কথা চিন্তা করছিলেন তিনি, এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। দেখতে পেলেন বৃদ্ধ গঙ্গাকিশোর প্রবেশ করছেন চিন্তাকুল ভঙ্গিতে। চিনতে পারলেন। ইংগিতে প্রহরীদের বাধা দিতে নিষেধ করলেন— গঙ্গাকিশোর ভেতরে ঢুকলেন বিনা বাধায়। কী কারণে এত রাত্রে আগমন? মনে পড়ল তিনি নিজেও জেগে আছেন কয়েকটি সংবাদ সংগ্রহের আশায়। বঘ্রা খাঁ কি ফেরেনি?

আসফ খাঁ উঠে পড়লেন। থেমে গেল নৃত্য। তিনি সভাসদদের বিদায় দিয়ে চলে এলেন কক্ষান্তরে—গঙ্গাকিশোর এলেন পেছন পেছন নির্দেশমতো। আসফ খাঁ বললেন, 'আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি সেই ব্রাহ্মণ, নবাব শাহনওয়াজ খাঁ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কী সংবাদ বলুন?'

গঙ্গাকিশোর ভণিতা করে নিলেন একটু। সূর্যকান্তর পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন

ফুলিয়ে, আসফ খাঁ বললেন, 'আমি চিনি। আজও দেখা হয়েছে খাস-দরবারে। আপনার আগমন কী ওর জন্যেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কী হয়েছে?'

'নবাব সায়েব আমি যখন নানা দেশে তার সন্ধান করে বেড়াচ্ছি—তখন তিনি এখানেই ছিলেন; আগ্রায় খোঁজ নিয়ে হতাশ হয়ে আমি যখন মথুরায় চলে যাই তখনও তিনি এখানকার বাসিন্দা, দেখা পাইনি। এখন যদি-বা তার সন্ধান পেলাম, দর্শন ঘটল না। বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি নবাব সায়েব—'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' আসফ খাঁ বললেন, 'শিগগির দেখা পাবেন।'

'তাঁর পরিজনেরা অধীর হয়ে উঠেছেন—'

'আপনি তাদের শান্ত করুন। এটুকু বলতে পারি আপাততঃ সে ভালই আছে, ফিরতে হয়ত দেরি হবে। আমি তার ওপর নজর রেখেছি।'

'নজর রেখেছেন? কেন?'

'দরকার পড়েছিল। এর বেশি জানতে চাইবেন না—'

'বিপদ ঘটেনি তো?'

'তেমন নয়—'

'নবাব সায়েব, দয়া করে খুলে বলুন।'

'কী বলব? আমি নিজেই জানিনে—'

'কবে দেখা পাব?'

'বলা শক্ত। তবে শিগগিরিই পাবেন এটুকু বলতে পারি—'

'আচ্ছা চলি।'

'শুনুন।' আসফ খাঁ বললেন, 'আপনার সঙ্গে যে ফকির সপ্তগ্রাম থেকে আগ্রায় এসেছিলে সে এখন কোথায়?'

'কে? নবীনদাস?'

'নাম মনে নেই।' আসফ আরেকটু বিস্তারিত হলেন, 'হুগলীতে পর্তুগীজ পাদ্রী যার অস্থি চূর্ণ করেছিল তার কথা বলছি—'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'নবীনদাস বৃন্দাবনেই আছে।'

'কার কাছে?'

'রঘুনন্দন গোস্বামীর আশ্রয়ে। ভিক্ষা করে দিন কাটায়—'

'এখানে আনতে হবে।'

'সে বোধ হয় আসতে চাইবে না—'

'কষ্ট হবে বুঝতে পারি।' আসফ খাঁ বললেন, 'কিন্তু বাদশাহের আদেশ, তার সামনে উপস্থিত করতে হবে।'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'তাহলে মথুরার ফৌজদারকে আদেশ করুন, তিনি যেন পালকি পাঠিয়ে দেন। পর্তুগীজ পাদ্রীর অনুগ্রহে নবীনদাস চলচ্ছক্তি রহিত—'

'এ কথাটা মন্দ বলেননি।'

আসফ খাঁ করতালি ধ্বনি করলেন— একজন খোজা এসে অভিবাদন করল। তিনি খাসনবীশকে ডেকে দিতে বলে আগ্রার ফৌজদারের নামে পত্র লিখতে বসলেন। খাসনবীশ এল অবিলম্বে, আসফ খাঁ তার হাতে পত্র দিলেন।

এমন সময় তৃতীয় প্রহর অতীত হল—দিল্লি ফটকে নহবত বেজে উঠল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে গঙ্গাকিশোর বিদায় নিতে চাইলেন।

'আপনি কাল-সকালে গোসলখানায় উপস্থিত থাকতে পারবেন?'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'পারি—'

আসফ খাঁ আর-একখানি পত্র লিখলেন, খাস-চৌকীর-মনসবদার স্বীয় পুত্র শায়েস্তা খাঁর নামে। বললেন, 'এটা দেখালে গোসলখানায় ঢুকতে পাবেন—'

'চলি।' 'আসনু—'

আসফ খাঁ দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ রাত্রির শীতল বাতাস ভেসে আসছে—অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ঘুম নেমে আসতে চায় চোখে। কর কর করছে চোখের তারা—ক্লান্তি নামছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু এখনও একটি কাজ বাকি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মতো তিনিও সূর্যকান্তর জন্যে উদ্বিগ্ন, কী হল তার? বঘ্‌রা খাঁ দেরি করছে কেন?

করতালিধ্বনি আবার। খোজার প্রবেশ। তিনি বললেন, 'খাওয়াস্ বঘ্‌রা খাঁ ফিরছে কিনা খবর নাও—' খোজা বললে, 'ফিরেছে জনাব।'

'ডেকে আনো—'

খোজা অভিবাদন করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন হাবসী প্রবেশ করে অভিবাদন জানাল। আসফ খাঁ পেছন ফিরে অন্ধকার যমুনার দিকে তাকিয়েছিলেন, আকাশ দেখা যাচ্ছিল, তারা নেই। মেঘ জমে আছে বিস্তর—বৃষ্টি হবে নাকি? ঠাণ্ডা বাতাস, কোথাও কী বৃষ্টি হচ্ছে? পদশব্দে সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ? বঘ্‌রা খাঁ?'

'জনাব, বান্দা হাজ্বির—'

আসফ খাঁ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'বঘ্‌রা খাঁ, সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে জনাব—'বঘ্‌রা খাঁ জবাব দিল।

'বাঙালি কোথায় গেল?'

'সে সাঁতরে, পানি ফটক পার হয়ে রঙমহলে প্রবেশ করেছে—'

'কেউ দেখেনি তো?'

'আলম্‌পনা, বুড়া বাঙালি জলের ভেতর ডুবে সাঁতরে তিরিশ গজ পরিখা আর পাঁচ গজ লহর পার হয়ে প্রবেশ করেছে রঙমহলে, তারপর আর দেখতে পাইনি—'

'সাবাস!' আসফ খাঁ বললেন, 'তার কথা অন্দরে জানাতে বলেছিলুম। সে কাজ করেছো?'

বখ্‌রা খাঁ বিনীতস্বরে বললে, 'জানিয়েছি হুজুর। সর্দারনী হামিদা বিবি জানে আর প্রহরী মারফত রঙমহলের বখ্‌শী জুলফিকার খাঁ য়াকুৎকে খবর দিয়েছি। তার পথ কেউ রোধ করবে না—'

'বেশ।' আসফ খাঁ জানতে চাইলেন, 'কিন্তু বাঙালি রাজাকে কয়েদ করল কে? সে খবর নিয়েছো?'

বখ্‌রা খাঁ বললে, 'আমি তখন উপস্থিত ছিলাম, জনাব। এটা য়াকুৎ বাঁদী জোবেদা আর কাল্‌মুক আখতাব খাঁর কাজ। সন্ধ্যার পর বাঙালি রাজা খাস দরবার থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় আখতাব খাঁ তার মাথায় ডাণ্ডা মারে, তারপর নৌকোয় তুলে পানিফটক দিয়ে রঙমহলে ঢোকে, নৌকোয় ওরা তিনজনে ছিল আমি দেখেছি—'

'আচ্ছা তুমি যাও।'

উদ্দেশ্য বোঝা গেল না। কার নির্দেশে জোবেদা ও আখতাব এমন কাজ করল? বাঙালি রাজার ওপর কার এমন নজর? ব্যাপারটা গুরুতর—বাদশাহ জানতে পারলে তার নিস্তার নেই ভাবতে ভাবতে অন্তঃপুর প্রবেশ করলেন আসফ খাঁ। রাত শেষ হয়ে আসছে এবার ঘুমনো দরকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। তিনি এগিয়ে চললেন শয়নকক্ষের পানে।

॥ একুশ ॥

আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার দুটো পথ প্রকাশ্য—একটি দিল্লি ফটকে অপরটি অমর সিংহ ফটকের সুমুখে। এ ব্যতীত পানিফটক দিয়েও অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যেত— কিন্তু সে পথ কেবল বাদশাহের অবরোধবাসিনী রমণীগণের জন্যে নির্দিষ্ট। এ তিনটি প্রকাশ্য পথ ব্যতীত আগ্রা দুর্গের অন্তঃপুরে প্রবেশের একটি গুপ্ত পথ ছিল—স্বয়ং বাদশাহ ব্যতীত অন্য কেউ সে পথ জানতেন না। বাদশাহ্ কখনও কখনও গুপ্তপথ ব্যবহার করতেন।

অন্তঃপুরে আকবর ও জহাঙ্গীরের আমলে এক বেগমের মহল হতে অন্য বেগমের মহলে যাতায়াতের বহু গুপ্তপথ নির্মিত হয়েছিল। শাহজহানের আমলে আরজ্‌মন্দবানু বেগম ব্যতীত মহলসরার মধ্যে অন্য অধিবাসিনী না থাকায়, গুপ্তপথ ব্যবহৃত হতো না তেমন। যোধবাঈ-মহলের পেছনে বাদশাহ বেগমের হামামের নিচে একটি গুপ্তগৃহ আছে। এই গৃহে এখনও একটি বধ্যমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়। কোন অন্তঃপুরচারিণী রীতিবিরুদ্ধ আচরণ করলে তাকে এই গৃহে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেন বাদশাহ্ অথবা প্রধানা বেগম। মোগল সাম্রাজ্যের যুগের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আগ্রা দুর্গে শ্বেত ও রক্তমর্মরনির্মিত বিশাল প্রাসাদের নিচে

পথবিচলিতা অন্তপুরচারিণীর জীবন নাট্যের শেষ অঙ্ক যে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতো তা এখনও দর্শকদের মনে ভীতি সঞ্চার করে থাকে।

বহুদিন এই বধ্যমঞ্চ ব্যবহৃত হয়নি, বহুদিন বাদশাহের অন্তঃপুরে কোন অবরোধবাসিনী স্বীয় রক্তস্রোতে স্বেচ্ছাচারের প্রায়শ্চিত্ত করেনি, বহুদিন সে কক্ষে প্রবেশ করেনি কেউ। কক্ষে আবর্জনা হেথা হোথায়, অপরিচ্ছন্ন, ধুলিস্তরে আচ্ছন্ন গৃহতল। বহুদিন এখানে আসার প্রয়োজন হয়নি কারো, অব্যবহৃত, অসংস্কৃত। মৃত্যুপুরীর মতো অন্ধকার—তদুপরি ভোরের রাত্রি—অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যায় না কিছুই। কিন্তু বাদশাহজাদী চলেছেন সঙ্গে, অতএব মশালের আলোকে পথ পরিষ্কার। বাঁকের পরে বাঁক, বাদশাহজাদীর চলনভঙ্গিতে ঈষৎ ক্লান্তি। বুঝি-বা নিদ্রার আবিলতা। প্রিয়সখীর খসমের ঔদ্ধত্যে কিছু বিরক্তি। চোখের কোণ দিয়ে জহানারা লক্ষ্য করছিল বন্দী যুবকের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য আছে কিনা—তার আভাসমাত্র নেই। খোজাদের সাথে বন্দী অবস্থায় সে চলেছে যেন বিলাস-গৃহে। দেখে নিরতিশয় বিরক্ত হল জহানারা। মুর্খ জানে না বাদশাহজাদীর মেজাজ—খেলার ছলেও প্রাণ নিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। বেয়াদপি মাফ করবে না সে, অসংগত জেদ বরদাস্ত করা তার স্বভাবের বাইরে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের মাথা বাড়িয়ে দেয় বধ্যমঞ্চে, সে নাচার। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

চারজন খোজা সূর্যকান্তকে নিয়ে ঢুকল সেই কক্ষে। তাদের সামনে পাঁচজন ও পেছনে পাঁচজন তাতারী প্রতিহারী— হাতে জ্বলন্ত মশাল। জ্বলছে দপদপিয়ে। বেশ অলোকিত হয়ে উঠেছে কক্ষ । স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ, যেন নড়াচড়া করলে মৃত আত্মারা কথা কয়ে উঠবে। বধ্যমঞ্চ দেখা যাচ্ছিল, মশালের আলোকে প্রেতের মতো নৃত্যরত। বীভৎস তার অস্তিত্ব। দেখে, সূর্যকান্ত চোখ ফিরিয়ে নিল নিজের অজান্তে।

খোজারা তার বন্ধন মোচন করল এবং জহানারার সামনে দাঁড় করিয়ে দূরে সরে গেল পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। জহানারার ইংগিতে খোজারা টেনে সরিয়ে দিল বহুদিনের রক্তস্রোতে বিবর্ণ কাষ্ঠখন্ডটি—নিচে যমুনার জলের কুলুকুলুধ্বনি শোনা যায় দূরাগত মৃত্যুর মতো। তার পার্শ্বে ফাঁসিকাঠ, গ্রাসের জন্যে উন্মুখ। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর অবারিত পটভূমি। এখনই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে জীবন।

কিন্তু চলবে না বিচলিত হলে। মানুষ অমর নয়—মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি। সূর্যকান্ত মনে মনে দৃঢ়তা সঞ্চয় করে চারিদিকে সহজভাবে তাকাতে লাগল। কোথাও ছিদ্র নেই, নিরেট মৃত্যুপুরী বটে। কিন্তু ঘাতক কই? দড়ি কই?—বাদশাহজাদী কী তাকে পরীক্ষা করছেন? প্রাণভয় দেখিয়ে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা?

সে কী ছেলেমানুষ?

'বাদশাহজাদী, এখানে এনেছেন কেন?'

বলতে, বলতে পারল, অটুট মনোবল। জহানারা যেন চমকে উঠল। এ প্রশ্ন সে আশা করেনি। ভেবেছিল ভীত হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইবে। মরতে কে চায়? কিন্তু তা ঘটল না দেখে সে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, 'বুঝতে যখন পারছো, জিজ্ঞেস করছো কেন? এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য একটাই। সেটা সুখকর নয় বলাই বাহুল্য। সমস্ত তৈরি আছে, ইংগিত করলেই ঘাতক এসে উপস্থিত হবে।'

'তাকে আসতে বলুন।'

সাহস সঞ্চয়ের পর সূর্যকান্ত বেপরোয়া। মৃত্যু তো একবারই হবে —ভয়ে কুঁকড়ে সেই মৃত্যুকে ছোট করা কেন? আসুক, সাহসের সঙ্গে সহজভাবে গ্রহণ করা যাবে।

'বাঁচতে চাও?'

জহানারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল তার পানে। সূর্যকান্ত হেসে ফেলল।

'বড় অদ্ভুত কথা শাহজাদী। মরতে কার সাধ?'

জহানারা ঠোঁট কামড়াল। বললে, 'দৌলত খাঁ, তুমি মুক্তি পেতে পারো যদি ধর্মপত্নী গ্রহণ করো।'

'কে আমার ধর্নপত্নী?'

'কেন গুলরুখ?'

'সেই কথা।' সূর্যকান্ত বললে, 'আবার বলছি আমি হিন্দু, মুসলমান নই। আমার নাম দৌলত খাঁ নয়, সূর্যকান্ত। আমার বিবাহ স্থির হয়ে আছে, আপনি যে রমণীর কথা বলছেন তাকে আমি চিনি নে। আপনি অনর্থক পীড়ন করছেন শাহজাদী—'

'তার মানে তুমি পত্নী গ্রহণ করবে না?'

'আমার পত্নী নেই, কারণ এখনও আমার বিবাহ হয়নি—'

'ভেবে দেখ।'

'শাহজাদী, আমার কথা আমি বলেছি—'

'এই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ—'

দপ করে জ্বলে উঠল জহানারা। সেই জেদ—অসঙ্গত ঔদ্ধত্য। যদিচ এ অনমনীয় মনোভঙ্গি প্রশংসার যোগ্য তবু নিজের সম্মান থাকে কোথায়? ছোট হবে একটা সাধারণ মানুষের কাছে বাদশাহজাদী হয়ে? তা কখনও হয়! মুহূর্তমাত্র দ্বিধা, জাহানারা তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকল, 'জল্লাদ—'

দ্বারের পাশে জল্লাদ অপেক্ষা করছিল — সে এগিয়ে এল। তার হাতে প্রাণঘাতী কুঠার—মশালের আলোয় চকচক করে উঠল। তার সহকারী একজন তাতারী এল শক্ত দড়ি নিয়ে। ঘাতক এবং তাতারী যখন সূর্যকান্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল তখন অকস্মাৎ একটা বাধা সুউচ্চ প্রাচীরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল

একাটা লোক, বাঘের মতো হিংস্র তার ভঙ্গি। চিৎকার করে সে বললে, 'খবরদার, এক পা এগিয়ো না—'

বলে সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল জল্লাদ ও তাতারীকে। তারা ছিটকে গেল। খোজারা ব্যাপারটা বোঝার আগেই সে তড়িদ্বেগে ঘুরে কেড়ে নিল তরবারি, সেটা সামনে তুলে প্রতিরোধ করল পরবর্তী আক্রমণ। কিন্তু সে একা। আর ওরা সর্বসমেত ষোলজন। হতচকিত ভাব কেটে যাবার পর আক্রমণ করল একযোগে। রাঘব দেখল সমূহ বিপদ। সে আত্মরক্ষার জন্যে পিছু হটতে লাগল— তার অঙ্গে তলোয়াড়ের আঘাত পড়েছে। গ্রাহ্য না করে সে এক খোজাকে জখম করে তার তরবারি কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সূর্যকান্তর পদপ্রান্তে। বললে, 'মহারাজ, শিগগির বেরিয়ে যান, দুয়ার হাবসীদের পেছনে—'

সূর্যকান্ত দাঁড়িয়েছিল নির্বাক দর্শকের মতো, ডাক শুনে চমক ভাঙল। মনে হল স্বপ্ন দেখছে কিন্তু মহারাজ নামে সম্বোধন করবে আর কে, রাঘব ছাড়া? রাঘব এল কী করে এই দুর্ভেদ্য বধ্যভূমিতে? দুর্দান্ত সাহস! কিন্তু এ তো আত্মহত্যারই নামান্তর। একা রাঘব কী পারবে ষোলজনের সঙ্গে লড়াই-এ? সূর্যকান্ত তরবারি কুড়োতে যাচ্ছিল রাঘবকে রক্ষা করার জন্যেই, দেখতে পেল ঘাতকের কুঠার রক্তে লাল, সে পেছন থেকে আঘাত করেছে, রাঘব পড়ে আছে দ্বিখণ্ডিত হয়ে। নিমেষে ঘটে গেল ঘটনাটা, সূর্যকান্ত বিহ্বল, বিমূঢ়। অস্ফুট আর্তনাদে সে মাথা নত করল শুধু।

এ সময়ে ঢুকল গুলরুখ। চোখের পলকে চারদিক দেখে সে শিউরে উঠল। থরথরিয়ে কাঁপল তার দেহ। খানিক আগে যে রক্ষা করেছিল পিশাচী জোবেদার আক্রমণে সেই দৈবপ্রেরিত মানুষটি আর নেই—দ্বিখণ্ডিত পড়ে আছে ভূমিতলে। দেরি হয়ে গেছে আসতে একটু, আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠপন্থা হিসাবে রাঘব প্রাচীরে না ওঠা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছিল গুপ্ত পথে। প্রাচীরবেষ্টনী ধরে দ্রুত চলে এসেছে রাঘব — তার মধ্যে এই কাণ্ড। গুলরুখ বারংবার শিহরিত হতে লাগল।

জহানারার মধ্যে বোধহয় রক্তের নেশা এসে গিয়েছিল। সে বললে, 'দৌলত খাঁ, দেখলে তো? স্বেচ্ছায় কেউ মরতে চাইলে আমি কিছু করতে পারি না—'

'শাহজাদী, আমাকেও এর কাছে যেতে দিন।'

সূর্যকান্তর কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ। তার চোখ ভরে গেছে জলে। জহানারা কঠিনস্বরে কী বলতে যাচ্ছিল, গুলরুখ লুটিয়ে পড়ল পদতলে। কাতরকণ্ঠে বললে, 'শাহজাদী, আমাকে আর একটা সুযোগ দিন। আমি বুঝিয়ে দেখি—'

'কী বোঝাবি?'

গুলরুখ বললে, 'আমাদের দুজনকে নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগ দিন—'

'তোর জন্যেই ও মরতে বসেছে। আচ্ছা দ্যাখ্ শেষ চেষ্টা করে।'

যেন অনিচ্ছার সঙ্গে কৃপাবশতঃ জহানারা তার প্রর্থনা মঞ্জুর করল। খোজা ও তাতারীরা বাইরে চলে গেল তার নির্দেশে, একটিমাত্র মশাল রেখে। নিজেও কক্ষের বাইরে চলে এল। রাঘবের মৃতদেহ আড়াল হয়ে গেছে অন্ধকারে, বাধামঞ্চ অস্পষ্ট, ভোরের যমুনার মৃদু কুল-কুল ধ্বনি গহ্বরে। যেন একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চলেছে এমনই শান্ত ও ধীর পদক্ষেপে গুলরুখ সূর্যকান্তর সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল তাব প্রিয়পুরুষ বিপর্যস্ত, ভগ্ন, বিশৃঙ্খল— বুঝিবা নিঃস্বশক্তি। শুনতে পেল সেরকমই ব্যথিত কণ্ঠস্বর ঃ 'বিবি, তুমি কে? কেন আমায় এত কষ্ট দিচ্ছ?'

গুলরুখ বলতে চাইল, 'এমন হবে আমি ভাবিনি। তোমার চেয়ে আমি বেশি কষ্ট পাচ্ছি, তুমি বিশ্বাস করো।' কিন্তু বলতে পারল না, তার হৃদয় দ্রুততালে স্পন্দিত হচ্ছিল, জিবে শুষ্কতা, গুলরুখ ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়, বিভ্রান্ত। অবনতমুখী করুণ লাবণ্য একটি মুখমণ্ডল হৃদয়-ভারে জর্জরিত। ম্লান, বিষণ্ণ।

অন্য সময় হলে সূর্যকান্ত হয়তো মনে মনে তার রূপের প্রশংসা করত, বিষণ্ণ মধুর ছবিটি এঁকে রাখত সংগোপনে। কিন্তু এখন তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ, বিশেষ করে রাঘবের মৃত্যু নিদারুণ বিচলিত করেছে। তার কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে ওঠে আপনা থেকে, সে বলে, কী কথা আছে আমার সাথে আপনার? সুযোগ ভিক্ষা করলেন কেন? আপনাকে আমি চিনি না—'

'চেনেন না?' জড়তা কাটল, গুলরুখ আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনি— তুমি আমকে চিনতে পারলে না? ভালো করে চেয়ে দ্যাখো তো?'

নির্লজ্জের মতো সে মুখখানি তুলে ধরল। কিন্তু সূর্যকান্ত দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক। অর্থাৎ সে তার বাক্য প্রত্যাহার করবে না। বিরক্তিব সঙ্গে ঘৃণাও মিশেছে মুখমণ্ডলে। গুলরুখ ক্ষুব্ধ, অপমানিতা। সে সংযত কণ্ঠে বললে, 'সপ্তগ্রামের যুদ্ধে আহত হয়েছিলে তা কী তোমার স্মরণে আছে?'

'আছে—'

গুলরুখ বললে, 'বজরায় আমি তোমার শুশ্রূষা করেছিলাম তা নিশ্চয় বিস্মৃত হওনি?'

'সেবা একজন করেছিল, সূর্যকান্ত অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিস্ফারিত ঃ 'সে কী তুমি!'

গুরুখ বললে, 'হ্যাঁ—'

'রোগশয্যায়, স্বপ্ন দেখতাম আমার শিয়রে বসে ইন্দিরা সেতার বাজাচ্ছে', সূর্যকান্তর স্বরে নম্রতা ঃ 'কিন্তু পরে জেনেছি ইন্দিরা সেতার বাজাতে জানে না।'

গুলরুখ দুঃখের সাথে বললে, 'সে আমি। যদি বলো সেদিনের রাগরাগিণী আবার বাজিয়ে শোনাতে পারি। তোমার ভালো লেগেছিল বলে সেগুলো আমারও প্রিয় রাগরাগিণী—'

'তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। হয়ত সে-ই তুমি। কিন্তু তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি!'

'আমার দুর্ভাগ্য।' গুলরুখ সখেদে বললে, 'আরও দুর্ভাগ্য এই যে ত্রিবেণীর ঘাটে দূর থেকে তোমার রূপ দেখে আমার ভালো লাগে এবং তন্মহূর্তে আমার হৃদয়-মন সমর্পণ করি। লজ্জার কথা, তবু এই সত্যি। তখন থেকেই তোমাকে পাবার আশায়—'

গুলরুখ হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে না পেরে করতলে মুখ ঢেকে থরথর করে কেঁপে উঠল। সূর্যকান্ত বুঝতে পারল গুলরুখ কাঁদছে। বিব্রত হল। এসব ক্ষেত্রে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে সে দাঁড়িয়ে রইল হতবাক স্তম্ভিতের মতো। নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো।

সামান্য পরে জলে-ভেজা চোখ তুলে গুলরুখ বললে. 'তোমাকে পাব বলে লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি— সৌকত আলী খাঁ ও শাহনওয়াজ খাঁ জানেন, আমি তোমার ধর্ম পত্নী। তাঁদের কাছে এই পরিচয় আমি দিয়েছি। কতকটা নিজের সম্মান রক্ষার জন্যে বটে, কিছুটা স্বেচ্ছায়। এখন ফেরার পথ নেই—'

সূর্যকান্ত নীরব।

গুলরুখ বললে, 'তুমি সপ্তগ্রামের যুদ্ধে আহত হয়ে পথে পড়েছিলে, আমি তখন শাহনওয়াজ খাঁর সঙ্গে বজরায় ফিরছিলাম, দেখতে পেয়ে পথ হতে তুলে বজরায় আনি। বজরায় দু'তিনদিন অজ্ঞান হয়েছিলে, ইন্দিরা, ইন্দিরা বলে ডাকতে, আমি ভেবেছি এ তোমার আদরের ডাক। তারপর ফিরিঙ্গিরা যখন আমাদের বজরা ডুবিয়ে দেয় তখন তোমাকে আর খুঁজে পাইনি। কতদিন পর, সেদিন দেখলাম, তুমি পানিফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছো। দেখেই আমার শিরায় সেই পুরনো রক্ত বয়ে গেল, প্রতিজ্ঞা করলুম এবার তুমি আমার নাগালের মধ্যে, যেমন করে হোক পেতে হবে। হ্যাঁ, আমিই তোমাকে এখানে আনিয়েছি—'

সূর্যকান্ত নির্বাক।

একমুহূর্ত তার স্তম্ভিত ভাবের প্রতি তাকিয়ে গুলরুখ বললে, 'শাহজাদীও জানেন তুমি আমার স্বামী। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন ও বিশ্বাস করেন। তাই তোমার কথা তিনি আমল দিতে চান না। ভেবেছিলুম তাঁর অনুরোধে তুমি আমাকে গ্রহণ করবে কিন্তু দেখছি জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে, ঘটনা এখন আমার আয়ত্তের বাইরে—'

নিঃশ্বাস ফেলল গুলরুখ। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল একটুক্ষণ থেমে। সেখানে আশানুরূপ ভাবের প্রতিফলন না পেয়ে সে বললে, 'কী কুক্ষণে দেখেছিলাম : বিষময় হয়ে উঠল দুজনের জীবন। দোষ তোমার নয়, আমার। কত কষ্ট দিলাম। আমার এ চোখ দুটো যদি না থাকত— তোমায় যদি না দেখতাম! শুধু দেখবার আশায় কতদিন বেহায়ার মতো পথের পানে তাকিয়ে থেকেছি, পাবার আশায় কত

রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়েছি, শয্যা হয়ে উঠেছে কণ্টকশয্যা। প্রিয়তম, আমার কথা একটু চিন্তা করো। ভেবে দেখ আমি রমণী, নারীত্বের শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে কীভাবে দাঁড়িয়েছি তোমার সামনে। এতেও কী তোমার দয়া হবে না?'

গলার স্বর ধরে গেল। কাঁপতে লাগল অধরোষ্ঠ। গুলরুখ প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে লাগল।

সূর্যকান্ত চুপ। গুলরুখের বেদনা অন্তর স্পর্শ করেছে। তার প্রগাঢ় প্রণয় অস্বীকার করা যায় না। মৃত্যুস্থলে দাঁড়িয়ে এ প্রণয়ের আস্বাদ তার অভিনব লাগল। এই মুহূর্তে মনে হল বধ্যমঞ্চ মিথ্যা—মিথ্যা রাঘবের আত্মত্যাগ। জগৎ-সংসারের সত্য বলে যদি কিছু থাকে তা এই রমণীর প্রেম। একে অসম্মান করার অধিকার তার নেই। কিন্তু জটিলতা অন্য দিকে। সংস্কারের বাধা—বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দিরা। তার কী হবে? তাকে রক্ষার যে কেউ নেই!

সূর্যকান্ত বললে, 'বিবিসায়েব, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, আপনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন—'

বলতে কষ্ট হল, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আপনা থেকে! মনে জোর পেল। হঠকারিতা কী মানায়?

গুলরুখ বললে, 'প্রিয়তম বলে স্বীকার করেছি। তুমি আমার কাছে দেবতার চেয়ে বড়। ইহকাল পরকাল সবই তুমি। তোমার বাহির সুন্দর ভিতর সুন্দর, তুমি রূপবান গুণবান, আমি সামান্য রমণী, তোমার রূপে-গুণে মুগ্ধ, স্বেচ্ছায় তোমার চরণে আশ্রয় চাইছি—'

'আমার অনেক বাধা।'

গুলরুখ যেন ভেঙে পড়তে চাইল: 'প্রিয়তম, কোথায় বাধা বলো আমি দূর করে দেব। যদি জাতের বাধা তোলো তবে বলি মুসলমান হিন্দু হতে পারে, হিন্দুও মুসলমান হতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানের একাধিক পত্নীর কথা কে না জানে? যদি তোমার পত্নী থাকে তাহলেও আমি আপত্তি করব না। শুধু তুমি রাজী হও—'

'সেকথা আমি বলিনি। পত্নী আমার নেই।'

গুলরুখ বললে, 'তবে? অর্থের কথা ভাবছো? প্রতিপত্তি চাও? দেখ, বাদশাহজাদীর মতো বাদশাহ বেগমেরও আমি অনুগ্রহের পাত্রী, শাহনশাহ-বাদশা কন্যার মতো স্নেহ করেন, তাঁদের অনুরোধ করে তোমাকে সমস্ত দিতে পারি। মনসব, খিলাত, ইনাম, তালুক, মদদ্ যা চাইবে তাই পাবে। তোমার জন্যে অসাধ্য সাধন করতে পারি আমি—'

'আপনার অশেষ মেহেরবানী। কিন্তু তার দরকার নেই। কারণ আমি মুসলমান হতে পারি না।'

গুলরুখ বললে, 'বেশ। আমি হিন্দু হব—'

'মুসলমান কখনও হিন্দু হতে পারে না।'

'কত মুসলমান বৈষ্ণব হয়েছে—'

'আমি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব হলে জাতিচ্যুত হব।'

'কত সংকীর্ণ তোমাদের জাতির গণ্ডি!' গুলরুখ ক্ষুব্ধ অভিমানে বললে, 'থাক এত তর্ক। শোনো, আমি শাহাজাদীকে বলেছি যে তুমি দৌলত খাঁ, আমার স্বামী, এক কাফের রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু হয়েছ। এখন তোমাকে মুসলমান হতে হবে—'

কণ্ঠে জোর আনল গুলরুখ। ভালোবাসায় কিছু করা গেল না যদি ভয়ে বশীভূত হয়!

সূর্যকান্ত এইখানে অটল। ভয়ের সাথে পরিচয় নেই।

'আমি কারো খেলার পুতুল নই। মিথ্যাচারণ আমি চিরদিন ঘৃণা করি—'

গুলরুখ বললে, 'সেটা অন্য সময় মহৎ গুণ কিন্তু এক্ষেত্রে অনিবার্য আত্মঘাতী। তুমি জানো মুসলমানের রাজ্যে হিন্দু মুসলমান হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু মুসলমান যদি হিন্দু হয় তাহলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। যদি সম্মত না হও তবে শাহজাদী কোতলের হুকুম দেবেন।'

'বিবিসায়েব, মরতে আমি কাতর নই —'

'এই দম্ভের জন্যেই বাদশাহজাদীর মেজাজ বিগড়েছে।' গুলরুখের শেষ চেষ্টা ঃ 'শোনো, এখন সম্মত হও, পরে না-হয় ভুলে যেও। আমি কোনো অনুযোগ করব না, বিশ্বাস করো।'

তার স্বরে আন্তরিকতা ছিল। সূর্যকান্তর চিত্ত স্পর্শ করল। এ আত্মত্যাগ যে নারীর তাকে অবজ্ঞা করা যায় না। সূর্যকান্ত কোমলকণ্ঠে বললে, 'আপনার প্রস্তাব খুব লোভনীয় কিন্তু হৃদয়হীন। একবার সম্মত হয়ে পরে ভুলে যাব এমন শক্তি আমি সঞ্চয় করিনি। তাছাড়া এ খেলা শোভনও নয়, সুন্দরও নয়। দয়া করে এটাই মনে করুন আমি আপনার উপযুক্ত নই—'

'তা .দ মনে করতুম তাহলে এমন নির্লজ্জ হব কেন?'

'আমি নিরুপায়—'

'তোমার চরণে ঠাঁই দেবে না তবে?'

বার বার অস্বীকার করতে হৃদয়ে বেদনা জাগছিল। সূর্যকান্ত বললে, 'বিবিসায়েব, মাফ করুন। আপনি বাদশাহের পালিতা কন্যা, কত সম্ভ্রান্ত আমীর উজীর আপনার পাণিগ্রহণে লালায়িত, আমি সামান্য ব্যক্তি, আমাকে অপরাধী করবেন না—'

'বেশ।' সুগভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে ঃ 'অনেক কষ্ট দিয়েছি, মাফ করো। বুঝতে পারলুম জগতে প্রণয় সাধনার বস্তু, ইচ্ছা করলেই তা পাওয়া যায় না। কিন্তু যে অবস্থায় এখন তোমাকে দাঁড় করিয়েছি তা থেকে উদ্ধারের পথ ভাবতে হবে। শাহজাদীর মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠেছে, তাঁর

কোপানল হতে পরিত্রাণের আশা কম। কী যে করি—ওই দরজা ঠেলেছেন বুঝি—'

সূর্যকান্ত বললে, 'খুলে দিন।'

'কিন্তু—'

ঠক ঠক ঠক—দরজায় শব্দ হচ্ছিল।

'খুলে দিন। দেরি হলে আরও রেগে যাবেন—'

বিচলিত গুলরুখ দরজার পাল্লা টেনে খুলে দিল। শাহজাদীই বটে। বেশ বিরক্ত।

জহানারা বললে, 'চটপট কোনো কাজ করতে পারিসনে? বোঝাতে এতক্ষণ লাগে? তোর খসম পোষ মেনেছে?'

গুলরুখ বললে, 'শাহজাদী তুমি আজকের মতো ওকে মাফ করো—'

'তবে পোষ মানেনি?'

গুলরুখ ব্যস্তস্বরে বললে, 'মানবে। তাড়াতাড়ি করলে মাটি হয়ে যাবে। সময় লাগবে—'

'বুঝতে পেরেছি। তুই ধৈর্য ধরে সাধ্য-সাধনা করে পোষ মানাতে চাস, কিন্তু আমি তা সহ্য করব কেন? তোর অনুরোধ রাখেনি, আমার হুকুম তোয়াক্কা করেনি। বেয়াদপ, বেতমিজ। সরে যা, আমি এখনই শায়েস্তা করব— সেই সাজাই ওর প্রাপ্য—' জহানারা ভেতরে ঢুকল ক্রোধে কঠিন হয়ে। অপমানিত হয়েছে। এখনই কোতলের আদেশ দেবে। কে রক্ষা করবে? একজন প্রাণ দিয়েছে, দৈবপ্রেরিত ও-রকম কোনো পুরুষের আগমন কী সম্ভব? কেউ পারে না? তার প্রণয়ের বলি হবে অমন সুন্দর একটি পুরুষ? দ্রুত চিন্তা করছিল গুলরুখ। একজন পারে— শাহজাদীর হুকুম নাকচ করার ক্ষমতা একজনের আছে। তিনি বাদশাহের বেগম আরজুমন্দবানু। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে অনুরোধ করলে রক্ষা করা যায়। শেষ চেষ্টা। গুলরুখ জহানারার পাশ কাটিয়ে দৌড়ল অন্দরমহলের দিকে।

জহানারা বললে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'আসছি —'

জহানারা বললে, 'তোর বেওকুফ খসমের সাজাটা দেখে যা। জল্লাদ!'

'একটু অপেক্ষা করুন শাহজাদী। আমি এলুম বলে—' প্রাণপণে দৌড়ল গুলরুখ। অন্দরমহলে দ্বাররক্ষী প্রহরীরা অবাক। গুলরুখ সুন্দরী দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য দৌড়য় কেন?

বাদশাহ বেগমের সাক্ষাৎ মিলল। তিনি এদিকেই আসছিলেন। থামলেন। তার আবেদন শুনে বললেন, 'চল্ দেখি বাঁচাতে পারি যদি—'

দুজন খোজা সূর্যকান্তকে তখন বধ্যমঞ্চে দাঁড় করিয়েছে, তার মাথা কাষ্ঠখণ্ডের

ওপর স্থাপিত। জল্লাদ কুঠার তুলবে। এই সময় বাদশাহ হেগম ঢুকলেন। তিরস্কারের সুরে বলে উঠলেন, 'এ কী করছিস জহানারা, ছিঃ! অনর্থক প্রাণহত্যা। ছেড়ে দে। .....এই, তোমরা চলে যাও এখান থেকে।

॥ বাইশ ॥

আসফ খাঁর ভালো ঘুম হল না— ভোরে গোসলখানায় ডেকেছেন বাদশাহ। খাস-দরবারে এক-তরফা আলোচনা হয়েছে, গোসলখানায় সম্ভবতঃ শেষ মীমাংসা। বাদশাহের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয়নি—পর্তুগীজ-শক্তির উচ্ছেদ চান তিনি। আজ ইংরেজ- প্রতিনিধির সঙ্গে অনেকে উপস্থিত থাকবেন, তিনি তো থাকবেনই, শাহনওয়াজ খাঁ, সৌকত আলী খাঁ, কাশেম খাঁ, এরাও থাকবেন। উপস্থিত থাকার কথা সূর্যকান্তরও। তার কথা বলা হয়নি বাদশাহকে। সময় পাওয়া যায়নি। বাদশাহ জানেন না গতকাল খাস-দরবার হতে বেরিয়ে সূর্যকান্ত কোথায় গেছে, তাকে নিয়ে কোন্ খেলা চলছে। প্রধান অমাত্য হওয়া সত্ত্বেও তিনিই কী সমস্ত সংবাদ জানেন, খাওয়াস বঘ্রা খাঁ পরিবেশিত সংবাদটুকু ছাড়া? এতক্ষণ কী ঘটেছে কে জানে।

আসফ খাঁ প্রস্তুত হলেন বেরোবার জন্যে। আর একটা কাজ তিনি করেছেন, সপ্তগ্রামের কথা উঠবে অনুমান করে তিনি উপস্থিত থাকতে বলেছেন বাঙালী পুরোহিতকে— যদি ডাক পড়ে হাজির থাকা ভালো। আর সেই ফকির, নবীনদাস না কী যেন নাম, পুরোহিতের কাছে তার অবস্থানের সংবাদ পাবার অনেক আগেই, সন্ধ্যাবেলা খাস-দরবার হতে বেরিয়েই, লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মথুরা ও বৃন্দাবনে। তার আসতে দেরী হয়েছে। শয্যাত্যাগ করে সংবাদ নিয়ে জেনেছেন সে এসেছে খানিক আগে এবং যথাস্থানে অপেক্ষা করছে। দেখা যাক বাদশাহ কোন্ আদেশ দেন?

বেরিয়ে পড়লেন আসফ খাঁ। সামান্য আগে এসে পড়েছিলেন তিনি। ভোরের আলো তখনও স্পষ্ট ফুটে ওঠেনি। দেখতে পেলেন দেওয়ান-ই-আমের পেছনে হাতির দাঁতের তৈরী মণিমুক্তাখচিত একখানি বিচিত্র নালকী অপেক্ষা করছে আটজন তাতারী বাহকসহ, বোঝা গেল বাদশাহ এখনও গোসলখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হননি। ওটি বাদশাহের বাহন। অন্যান্য সভাসদ ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নাকারাখানার ফটক দিয়ে প্রবেশ করছে দেওয়ান-ই-আমের চত্বরে। আসফ খাঁ চললেন তাঁদের সাথে।

দেওয়ান-ই-আমের পেছন দ্বার দিয়ে ঢুকলে দেওয়ান-ই খাসের চত্বর—তার পেছনে গোসলখানা।

শুনলে মনে হয় বুঝি স্নানঘর, কিন্তু তা নয়। গোসলখানা মোঘল সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাগৃহ। দরবার-আমের পরে বাদশাহ এইখানে বসে প্রধান অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। গোপন মন্ত্রণাগৃহ বলা চলে। এখানে বসে বিভিন্ন সুবার শাসন

সম্বন্ধে আদেশ যেমন দেন তেমনি রাজ্যতন্ত্রের গোপনীয় ব্যবস্থাদিও হয়। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

আসফ খাঁ ঢুকলেন গোসলখানায়। দেখলেন দ্বারের দপ্যাশে সকলে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। বাদশাহের নালকীর আগমনধ্বনি শোনা যাচ্ছে— তার প্রস্তুতি। এসে গেল নালকী, থামল দুয়ারে। বাদশাহ্ নামলেন। সভাসদগণ একসঙ্গে কুর্নিশ করে সংবর্ধনা জানালেন। তাঁদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলেন বাদশাহ্— বসলেন গদীতে। আসফ খাঁ ও শাহনওয়াজ খাঁ বসলেন তাঁর নিকটবর্তী আসনে। অন্যেরা দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁদের ঘিরে।

উপবেশনের পর বাদশাহের সতর্ক চক্ষু চারিদিকে কী যেন খুঁজল, কার যেন সন্ধান করল। তারপর জিজ্ঞাসা ঃ 'উজির সায়েব, নতুন মনসবদার কী আসেনি? সে কই?'

প্রশ্নটা প্রথমেই উঠবে আসফ খাঁ তা ভাবেননি। বিব্রত হলেন বেশ। যেটুকু তিনি জানেন, ব্যক্ত হলে বিপদের সম্ভাবনা। বাদশাহের মেজাজ গরম হয়ে উঠতে পারে। অথচ মিথ্যা বলা আরও বিপদজনক। অগত্যা তিনি বললেন, 'জহাঁপনা, নতুন হাজারী মনসবদার সূর্যকান্ত নিখোঁজ, তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না—'

'সে কী কথা উজীর সায়েব?' বাদশাহ্ রীতিমত বিস্মিত ঃ 'যে লোক কাল রাত্রে আমার কাছে এসেছিল আজ সকালে সে নিখোঁজ, বেপাত্তা? তাজ্জব কা বাত! কারণ জানেন?'

উজীর নতমস্তকে জানালেন, 'এখনও জানতে পারিনি—'

'বাসায় সন্ধান করেছিলেন?'

উজীর তদবস্থায় বললেন, 'সে বাসায় ফেরেনি—'

'তার মানে রাস্তাতেই কিছু ঘটেছে। কোতোয়াল কী করে সারারাত? এমন একটা কাণ্ড—' থেমে তিনি আদেশ দিলেন, 'সৌকত আলী খাঁ, নগর-কোতায়ালকে তলব করো এখনি—'

'যো হুকুম জহাঁপনা।' সৌকত আলী খাঁ কুর্নিশ করে বাইরে চলে গেলেন। তিনিও বিস্মিত কম নন। চন্দ্রকান্তর পুত্র ভোজবাজি জানে নাকি, যখন-তখন উধাও হয়ে যায়?

বাদশাহ্ বললেন, 'উজীর সায়েব, আরও দুজন অনুপস্থিত। সুরাটের ইংরাজদূত আর সেই বাঙালী গওয়াহ্। তারা কোথায়?'

'উপস্থিত আছে, জনাব আলি—'

বাদশাহ্ বললেন, 'ডাকুন।'

আসফ খাঁ করতালিধ্বনি করলেন—খাওয়াস বঘ্‌রা খাঁ দর্শন দিল দ্বারপ্রান্তে। তিনি খাস-চৌকির মনসবদার শায়েস্তা খাঁকে ডাকতে আদেশ দিলেন। পরমুহূর্তে শায়েস্তা খাঁ হাজির।

'ইংরাজ দূত বাঙালী ব্রাহ্মণ আর ফকির—'

শায়েস্তা খাঁ অভিবাদন করে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রার কোতোয়াল জব্বর খাঁ ঢুকল কুর্নিশ করে। সে কাঁপছিল। গোসলখানায় বড়-একটা তার ডাব পড়ে না।

'জব্বর খাঁ, তুমি খাজা আবুল হোসেনের ছেলে, সেইজন্যে তোমাকে আগ্রার কোতোয়াল করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি নিতান্ত অকর্মণ্য। জলজ্যান্ত মানুষ গায়েব হয়ে যায় কী করে? কাল রাত্রে একজন বাঙালী আমীর, হাজারী মনসবদার, প্রথম প্রহরের শেষ পর্যন্ত দেওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত ছিল, তারপর তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে ফেরেনি তুমি সংবাদ জানো?'

জব্বর খাঁ কাঁপতে কাঁপতেই মাথা নাড়ল, 'আমি কোনো সংবাদ পাইনি—'

'অপদার্থ!' বাদশাহ গর্জন করে উঠলেন, 'আজ রাত্রের মধ্যে দেওয়ান-ই-খাসে তার সংবাদ দিতে না পারলে তোমাকে আগ্রা থেকে দূর করে দেব—যাও—'

জব্বর খাঁ কুর্নিশ করতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনো রকমে কর্তব্য সমাধা করে বেরিয়ে গেল।

আসফ খাঁ দেখলে তাঁর জ্ঞাত সারে একজন নিরপরাধীর দণ্ড হয়। তিনি বাদশাহের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'জহাঁপনা, জব্বর খাঁর অপরাধ নেই। নতুন মনসবদারের খবর দিতে পারবে অন্দরমহলের বখশী জুলফিকার খাঁ য়াকুৎ আর হামিদা বিবি—'

'তারা কেন?' বাদশাহ বিস্মিত।

উত্তর দেওয়া হল না। শায়েস্তা খাঁর সাথে ঢুকলেন টমাস হার্ডি ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তাদের পেছনে নবীনদাস বাবাজী— দুজন খোজা বহন করে আনল তাকে। নবীনদাস দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়েছে চত্বরে। আসফ খাঁর দৃষ্টি সেই দিকে। বাদশাহ পর্যন্ত আকৃস্ট।

'ব্যাপার কী?'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'জনাব আলি, পর্তুগীজ পাদ্রী ওর দেহের সমস্ত অস্থি চূর্ণ করে দিয়েছে, ওর দাঁড়াবার শক্তি নেই—'

'পর্তুগীজ পাদ্রী এ কাজ করল কেন?'

শাহনওয়াজ খাঁ বললেন, 'আমি শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে ছিলাম না। আপনি ওর কাছ থেকেই শুনুন—'

আসফ খাঁর ইশারায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এগিয়ে এলেন। বাদশাহের প্রশ্ন ও নবীনদাসের উত্তর তর্জমা করবেন তিনি। দেশকালের রীতি অনুযায়ী বাল্যকালে ফরাসী শিখেছিলেন গঙ্গাকিশোর। এখন কাজে লাগল। মনে মনে তিনি আসফ খাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উজীর!

'ফকির, পর্তুগীজ পাদ্রী তোমার ওপর অত্যাচার করেছিল কেন?'

'সে আমার বন্ধু বলে—'

'এ রকম অত্যাচার যে করে সে কী কারো বন্ধু হয়?'

'হয় বই কি মহারাজ? যে পথভ্রান্তকে পথ নির্দেশ করে সে-ই তো প্রকৃত বন্ধু—'

'তুমি কী পথ ভুলে হুগলী গিয়েছিলে?'

'ইচ্ছা করেই গিয়েছিলাম—'

'তবে পথ ভুলেছিলে কোথায়?'

'একেবারে আদিতে। বৈরাগী হয়ে যখন অর্থের লোভ সংবরণ করতে পারিনি তখনই—'

'তাতে পর্তুগীজ পাদ্রী অত্যাচার করে কেন?'

'সে নিমিত্তমাত্র। গোবিন্দের আদেশ ছিল তাই—'

'গোবিন্দ কে?'

'তিনিই সব। এ জগৎ-সংসারের পিতা, আমার আপনার ও সকলের প্রভু—'

'বাদশাহ হাসলেন।' বললেন, 'ফরিক, খোদা কী তোমার ওপর অত্যাচার করতে পর্তুগীজ পাদ্রীকে আদেশ করেছিলেন?'

'নিশ্চয়। তা না হলে মানুষের সাধ্য কী যে সে কারো অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে—'

'ফকির, তুমি কী পাগল?'

'মহারাজ, যতদিন লোভ ও মোহের পঙ্কে নিপতিত ছিলাম ততদিন পাগলের দশা গেছে, এখন মদনমোহন দয়া করেছেন এখন আর পাগল নই—'

'পাদ্রী কী ধরণের অত্যাচার করেছিল?'

'ভুলে গিয়েছি। আমার মনে নেই—'

'বলো কি।'

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বললেন, 'আমি আন্দাজ করতে পারি। ওর সঙ্গে আমিও বন্দী ছিলাম। যদি অনুমতি করেন, নিবেদন করি—'

বাদশাহের অনুমতি দানের পর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যতখানি শুনেছিলেন ও আন্দাজ করেছিলেন তার বীভৎস বর্ণনা তুলে ধরলেন। শুনে বাদশাহ শিহরিত। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

বাদশাহ বললেন, 'ইংরেজ, সমস্ত খৃস্টান পাদ্রী কী এরকম অত্যাচার করে থাকে?'

টমাস হার্ডি নতমস্তকে উত্তর দিল, 'জহাঁপনা, খৃস্টান-সমাজ অনেক বড়, সবাই এক নয়। যতদূর জানি খৃস্টান-সমাজে কেবল পর্তুগীজ ও স্পেন দেশের

পাদ্রীরাই নৃশংস। তারা নিজেদের দেশে অন্য মতাবলম্বী খৃস্টানদের ওপরেও জঘন্য অত্যাচার করে থাকে, ভারতবর্ষে এ অত্যাচার নতুন—'

'তাহলে আমার রাজ্যে ওদের বাস করতে দেওয়া উচিত নয়।'

টমাস হার্ডি বললে, 'শাহানশাহের দরবারে বহুবার ওদের অত্যাচারের কথা নিবেদন করেছি—আমরা অত্যাচারিত হয়েছি নানাভাবে। জহাঁপনার আদেশ পেলে এতদিনে আমরা ওদের অত্যাচার দমন করতে পারতুম—'

'আদেশ কেন দিইনি জানো?' বাদশাহ তার ক্ষোভের উত্তরে বললেন, 'তুমিও ফিরিঙ্গি পর্তুগীজও ফিরিঙ্গি। তোমরা উভয়েই এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছো। আমি মনে করতাম তোমরা ঈর্ষাবশতঃ ওদের নামে অপবাদ দিচ্ছ। কারণ ইতিপূর্বে আমার প্রজাদের ওপর অত্যাচারের কথা আমি শুনিনি—'

টমাস হার্ডি বললে, 'জহাঁপনা, গোস্তাকি মাফ করবেন, হিন্দুস্থানের সকল সংবাদ কী আপনার কর্ণগোচর হয়?

'কী বলতে চাও?'

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন বাদশাহ্।

টমাস হার্ডি বাধা পেলেন, আসফ খাঁ তাড়াতাড়ি বললেন, 'জহাঁপনা, ওয়াকেনবীসরা যে সমস্ত সংবাদ পাঠায় তা সংখ্যায় কম নয়—প্রতিটি লিখিত সংবাদ শুনতে গেলে আপনার সারাদিন চলে যায়। তাই খাসদবীর বেছে বেছে কতকগুলো পত্র রঙমহলে পাঠিয়ে দেয়—'

'উজীর সাহেব, এর আগে কী পর্তুগীজ ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা ওয়াকেনবীস লিখে পাঠিয়েছিল?'

আসফ খাঁ বললেন, হ্যাঁ। আহমদাবাদ, সাতগাঁও ও জহাঙ্গীর নগরের ওয়াকেনবীস দু-তিনবার এই সংবাদ দিয়েছিল—'

'হুঁ।—এরপর সুবা বাঙলা ও সুবা গুজরাতের সমস্ত ওয়াকেনবীসের সমস্ত পত্র যেন আমার নিকট উপস্থিত করা হয়।'

আসফ খাঁ বললেন, জহাঁপনার হুকুম তামিল হবে—'

'শোনো হার্ডি', বাদশাহের কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর: 'কাশেম খাঁ বাঙলার সুবাদার হয়ে যাচ্ছে। আমি বাঙলা ও গুজরাতের পর্তুগীজদের শাসন করব। তোমরা কী অন্যদিকের ভার নিতে পারবে?'

টমাস হার্ডি বললে, 'কোন্‌দিক?'

'ইরাণ আর সুরাট—'

টমাস হার্ডি বললে, 'কী করতে হবে?'

'হয় পর্তুগীজদের জাহাজ আটকাবে নতুবা ধ্বংস করবে—'

টমাস হার্ডি বললে, 'পারব।'

'এ আদেশ আমি আগে দিয়েছি। দেরি না করে তুমি সুরাটে ফিরে যাও। যুদ্ধের আয়োজন করগে—'

টমাস হার্ডি অভিবাদন করে বললে, 'জহাঁপনা, আমি এতদিনে চলে যেতাম শুধু উজীর-সাহেবের হুকুম পাইনি বলে যাওয়া হয়নি। আপনার প্রতিটি আদেশ প্রতিপালিত হবে। চললাম।'

সে চলে গেল।

'কাশেম খাঁ—'

বাদশাহ ডাকলেন।

'জহাঁপনা—'

কাশেম খাঁ সামনে এসে কুর্নিশ করল।

'তুমি বাঙলার নতুন সুবাদার নিযুক্ত হলে। আমি চাই যত শীঘ্র সম্ভব পর্তুগীজ শক্তির উচ্ছেদ—'

কাশেম খাঁ বললে, 'তাই হবে জহাঁপনা।

বাদশাহ উঠে দাঁড়ালেন। বিকলাঙ্গ নবীনদাস বৈরাগী সেই ভাবে বসে রয়েছে। তার কাছে এসে তিনি বললেন, 'ফরিক, আমার রাজ্যে বাস করে তুমি অনেক যন্ত্রণা-ভোগ করেছো, বলো কী চাও?'

নবীনদাস চক্ষু মুদে ধ্যান করছিল, চোখ মেলে বললে, 'মহারাজ, আপনার অশেষ করুণা। আমার আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে গোবিন্দের মন্দিরপ্রান্তে বাস করতে অনুমতি দিন—'

'আর কিছু চাই?'

নবীনদাস বললে, এই যথেষ্ট—'

'বেশ।' বাদশাহ আঙুল হতে একটি বহুমূল্য আঙটি খুলে তার হাতে দিলেন, বললেন, 'ফকির, এই চিহ্নটি তুমি রাখো, যদি কখনও প্রয়োজন হয় তখন এটা দেখিও। আমি যখন যেখানেই থাকি, বাদশাহী কর্মচারী তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে—'

বেরিয়ে এসে নালকীতে চড়লেন। চললেন মহলসরার দিকে। বহুক্ষণ প্রিয়তমা বেগম আলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ নেই।

॥ তেইশ॥

তিনি ডাকেন আলিয়া বলে। পুরো নামটি বেশ দীর্ঘ। হজরত মমতাজ-ই-মহল আরজমন্দবানু বেগম রৌশন জহানী। সাধারণ লোকের কাছে বাদশাহ বেগম। উত্তরকালে মমতাজ। বাদশাহের হৃদয় ভরিয়ে রেখেছেন স্নেহে প্রেমে মমতায়। সুরূপা তো বটেই, দয়াবতী। তাঁর কাছে আবেদন জানালে কেউ ব্যর্থ হয়

না বড়-একটা। অন্দরমহলে যেমন বাদশাহের ওপরেও তেমনি অপ্রতিহত প্রভাব। বাদশাহের মহিষী বেগম।

সকাল হয়েছে। অঙ্গুরীবাগের চত্বরে দাঁড়িয়ে আলিয়া বেগম লাল মাছকে খেতে দিচ্ছিলেন, বাদশাহের নালকী ঢুকল। আলিয়া বেগম এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে নামতে সাহায্য করলেন। তারপর দুজনে অগ্রসর হলেন রঙমহলের দিকে। বাদশাহ্ বললেন, 'তোমার কাজ মিটেছে?'

আলিয়া বেগম বললেন, 'হ্যাঁ। মাছেদের খাওয়ানো শেষ হয়েছে—'

'তোমার খাওয়ানোর চোটে ওগুলো বাঁচলে হয়!'

আলিয়া বেগম বললেন, 'বাঁচবে না কেন? ঠিক বাঁচবে দেখো —'

'ভালো'।

রঙমহলে প্রবেশের পূর্বে বাদশাহ দেখলেন বাঁদীদের সর্দারনী হামিদা বিবি আর বখশী খোজা জুলফিকার খাঁ য়াকুৎ নিতান্ত অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে এক পাশে। নিশ্চয় কোনো অপরাধ করেছে। বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, 'আলিয়া, ব্যাপার কী? ওরা ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন? কী করছে?'

'চলো বলছি।' আলিয়া বেগম যমুনাতীরস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, 'জহাঁপনা, আমার আমলে মহলসরায় যা হয়নি তা-ই হয়েছে—'

বাদশাহ বিস্মিত ঃ 'কী হয়েছে?'

আলিয়া বেগম বললেন, 'আপনি সুস্থ হোন তারপরে বলব—'

'আমি বেশ সুস্থ আছি তুমি বলো।'

আলিয়া বেগম বললেন, 'বড় ভীষণ কথা, মহলসরায় দুজন পুরুষ ধরা পড়েছে—'

'বলো কি। পুরুষ।'

আলিয়া বেগম বললেন, 'ব্যাপারটা তাই—'

'কোন্ জাত?'

বাঙালী—'

বাঙালী?'

তাঁর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

'হ্যাঁ জহাঁপনা, একজন সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক— ভাগ্যক্রমে রক্ষা করতে পেরেছি। আর একজন বৃদ্ধ, আমি পৌঁছুবার আগেই মারা গেছে—'

'কোথায় ধরা পড়ল?'

'শিশমহলের নিচে ফাঁসিখানায়—'

'কে ধরল?'

'সে অনেক কথা। তবে বাঁচিয়েছি আমি—'

'তুমি?'

'হ্যাঁ জহাঁপনা।' আলিয়া বেগম বললেন, 'সন্ধ্যার সময়ে য়াকুৎ বাঁদী জোবেদা জানাল যে গুলরুখ রঙমহলে একজন পুরুষ ধরে এনেছে। কথাটা বিশ্বাস করিনি। গুলরুখ এ কাজ করবে কেন? তারপর আজ ভোরে আপনি যখন দরবার আমে চলে গেলেন জোবেদা ফের এল। বললে, ফাঁসিখানায় জহানারা আর গুলরুখ একজন পুরুষকে কোতল করেছে। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখেছিলাম। সম্ভবতঃ গুলরুখের সঙ্গে তার মনোবাদ হয়েছে। পরে 'ওদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি আমার অনুমান মিথ্যা নয়, বিবাদ ওই ধৃত যুবককে নিয়েই। গুলরুখের অভিযোগ, জোবেদা তাকে খুন করতে চেয়েছিল একা পেয়ে, যুবকের দখলিস্বত্ব নিয়ে। এ অন্যায় জুলুমের বিচার চেয়েছে সে। জোবেদা স্বীকার করেছে তাই। গুলরুখ বলেছে এমন যার লালসা তাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত—'

'ঠিক বলেছে।' বাদশাহ্ বললেন, 'তারপর?'

আলিয়া বেগম বললেন, 'দ্বিতীয়বার জোবেদার সংবাদ শুনে কৌতূহলবশে আমি ফাঁসিখানার উত্তরের দেওয়াল সরিয়ে দেখলাম, সত্যি সত্যি জল্লাদ জুনা খাঁ একজন মরদকে কোতল করার জন্যে তৈরি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। পথে গুলরুখের সাথে দেখা। সে আকুল হয়ে বাঁচাবার আবেদন জানাল। শুনতে শুনতে ফাঁসিখানায় ঢুকে কোতল থামিয়ে দিলাম। আগে বিচার হোক তারপর তো কোতল—'

'বেশ। কিন্তু জহানারা এর মধ্যে কেন?'

আলিয়া বেগম বললেন, 'গুলরুখ নাকি অনুরোধ করেছিল। জহানারা বলে তার নাম দৌলত খাঁ, সে গুলরুখের স্বামী, কিন্তু সে এ কাফের রমণীর প্রেমে পত্নী পরিত্যাগ করে কাফের হয়েছে। জহানারার কথা শোনেনি বলে সে কোতলের আদেশ দিয়েছিল—'

'দৌলত খাঁ কী বলে?'

আলিয়া বেগম বললেন, 'তার এক কথা। সে নাকি হিন্দু এবং গুলরুখ তার কেউ নয়। অনেক বোঝালুম কিন্তু ফল হয়নি। কী করব বুঝতে পারছি না—'

'হুঁ'। বাদশাহ্ পায়চারি করে নিলেন একবারঃ 'জট পাকিয়ে গেছে। সরেজমিন তদন্ত দরকার। যুবক আছে কোথায়?'

'অঙ্গুরীবাগের পাশের ঘরে।' সহসা তাঁর চোখ দুটো ভরে উঠে জলেঃ 'জনাব একটা অনুরোধ রাখবে?'

'আলিয়া, হিন্দুস্থানের এক সীমা থেকে অপর সীমা পর্যন্ত তোমার আদেশ প্রতিপালিত হয়, তোমার কোন্ অনুরোধ রাখিনি বলো? যখন যা আদেশ করেছো আমি তা-ই করেছি, এখনও করব।' আদরের বাহুবেষ্টনে কাছে টেনে নিলেন বাদশাহ্ঃ 'তোমার চোখে জল দেখলে আমি বড় ব্যথা পাই—'

'দিলের, তার মুখখানা দারার মতন।' আলিয়া বেগম মৃদু ও কোমলস্বরে

বললেন, 'প্রাণে মেরো না। যদি সে অপরাধী হয় তবে অন্য সাজা দিও, এইটুকু অনুরোধ।'

'তাই হবে আলিয়া—'

বেগম আনন্দে স্বামীর বক্ষলগ্না হলেন, 'দিলের, আমার দিলের—'

বাদশাহ ক'মুহূর্ত চুপ করে তাঁর আনন্দ-আবেগ উপভোগ করলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'অনেকদিন পরে দিলের' বলে ডাকলে, 'আপনি' নয় 'জহাঁপনা' নয়। ভারি সুন্দর লাগল শুনতে। মনে হচ্ছে বয়স যেন অনেক কমে গেল—'

লজ্জা পেলেন আলিয়া বেগম। মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'সব সময় মনে থাকে না—'

'তবে বলো কেন?'

আলিয়া বেগম বললেন, 'তুমি যে এখন বাদশাহ হয়েছো দিলের—'

'তখ্‌তে বসে কী দূরে সরে গিয়েছি, আলিয়া?'

বেগম বিব্রতস্বরে বললেন, 'তা কেন? বরং আরও কাছে এসেছো। আমি তোমার মনের কতখানি জায়গা জুড়ে আছি সে তো আমিই জানি। মাঝে মাঝে ভাবি যখন থাকব না তখন তোমার দশা কী হবে—'

'ছিঃ ওকথা বলতে নেই। তুমি থাকবে না কেন? কে কাড়ে দেখব—'

'মানুষ কী চিরকাল বেঁচে থাকে দিলের?'

'তুমি বেঁচে থাকবে।' বাদশাহ বললেন, 'আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব—'

আলিয়া বেগমের চোখ আবার জলে ভরে গেল। বললেন, 'এইজন্যে মরে গেলেও আমার দুঃখ নেই। তুমি বড্ড স্নেহ করো—'

'স্নেহ নয় ভালবাসি। আলিয়া, প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তুমি আমার সব।' বাদশাহ বললেন, 'কিন্তু বার বার মৃত্যুর কথা তোলো কেন? শুনতে ভালো লাগে না। চলো তাকে দেখে আসি।'

আলিয়া বেগম ঝলমলিয়ে উঠলেন, 'চলো—'

শাহজহান কক্ষে প্রবেশ করেই থমকে গেলেন। ভেবেছিলেন অপরিচিত কোনো ব্যক্তি, কিন্তু এ কী, এ যে সূর্যকান্ত। বিস্ময়ে বললেন, 'মনসবদার, তুমি এখানে?'

শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিবশত সূর্যকান্ত বসেছিল অবসন্নের মতো, বাদশাহের কণ্ঠস্বর শুনে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। অভিবাদন জানিয়ে বললে, 'শাহানশাহ, তকদির—'

ক্লান্তিতে তার গলার স্বর ফুটল না ভাল করে।

আলিয়া বেগম মৃদুস্বরে বললেন, 'এই সেই যুবক—'

কিন্তু আলিয়া, 'এ যে আমার নতুন মনসবদার!' বাদশাহ্ বললেন, 'এর সব কথা আমি জানি। আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী সৌকত আলী খাঁ, নবাব শাহনওয়াজ খাঁ এমন-কি তোমার পিতা পর্যন্ত উত্তমরূপে চেনেন। মাত্র গতকাল হাজারী মনসবদারের পদ দিয়েছি। তারপর থেকেই উধাও। খুব চিন্তিত ছিলাম। আমি জানি এ যুবক মুসলমান নয়, হিন্দু, বাঙলা মুলুকে বাড়ি—'

আলিয়া বেগম বললেন, 'আমার কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে।'

'মনে হয় এ একটা ষড়যন্ত্র। ভারি অন্যায়। শাস্তি পেতে হবে—'

তখনই ডাক পড়ল হামিদা-বিবি আর জুলফিকার খাঁর। তারা এল কাঁপতে কাঁপতে। জেরা চলল। তাদের দুজনের কাছ থেকে যেটুকু জানা গেল তা এই যে জোবেদা বাঁদী এ কাফেরকে রঙমহলে এনেছে গুলরুখ-বিবির নির্দেশে। সমস্ত ঘটনার মূলে ওই গুলরুখ— 'বটে।' বাদশাহ্ গম্ভীরস্বরে বললেন, 'ডাকো তাকে।'

খানিক পরে এল গুলরুখ। ডাক শুনেই সে বুঝতে পেরেছিল আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে—সব ফাঁস হয়ে গেছে বাদশাহের জেরায়। এ খেলা শেষ হয়ে এসেছে। এবার তার পালা, কিন্তু হার সে স্বীকার করবে না, কিছুতেই না। অপরের দেওয়া দণ্ড গ্রহণ করে সে কিছুতেই ছোট হবে না দশের কাছে—ছোট করবে না প্রণয়দেবতার দান। শাস্তি যদি পেতেই হয় তবে তা গ্রহণ করবে নিজের হাতেই। একটা শুধু আশ্বাস, যা সে চেয়েছিল তা পেয়েছে, তার প্রণয়-পুরুষের জীবন রক্ষা করেছে চরম বিপাকে পড়েও। বেঁচে আছে তার দেবতা। এর চেয়ে বড় সান্তনা আর কী হতে পারে? খোদাতাল্লা তাকে অনন্ত পরমায়ু দিন—

গুলরুখ প্রবেশ করল একেবারে প্রস্তুত হয়ে।

'একে তুমি চেনো গুলরুখ?'

গুলরুখের স্বর শান্ত ঃ 'হ্যাঁ জনাব—'

'কেউ হয় তোমার?'

গুলরুখ দ্বিধাহীন ঃ 'হ্যাঁ জহাঁপনা, আমার পাষাণ-দেবতা—'

'তুমি একে মহলসরায় এনেছিলে?'

গুলরুখ অবিচলিত ঃ 'এনেছিলাম—'

'স্বেচ্ছায়?'

গুলরুখ অকম্পিত কিন্তু অশ্রুসজল ঃ 'শাহানশাহ্, আপনার কাছে স্নেহ পেয়েছি, বাদশাহ্ বেগমের কাছে মাতার বাৎসল্য। পরম সৌভাগ্য না হলে এ জিনিস কেউ পায় না। আমি তার যোগ্য হতে পারিনি। মিথ্যা অনেক বলেছি আর বলব না, মিথ্যা বলে আমার ওই দেবতাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। হ্যাঁ, মোহের বশে শয়তান-শয়তানীর সাহায্যে ওকে দেবীস্বরূপা মাতার বাসস্থানে এনেছিলাম—'

কার পরামর্শে গুলরুখ?'

গুলরুখের উত্তর তেমনি সুস্পষ্ট : 'পরামর্শদাতা আমার এই দুটি চক্ষু। এরাই আমার কাল। ....জহাঁপনা, কেউ অপরাধী নয়। হামিদা বিবি, জুলফিকার খাঁ, জোবেদা, আখতাব বা শাহজাদী কেউ অপরাধী নয়। ওরা নিমিত্ত মাত্র। অপরাধ আমার এই চক্ষুর। সুদূর সপ্তগ্রামে ওই দেবদুর্লভ রূপ আমার নয়ন অন্ধ করে দিয়েছিল— সেই অন্ধতার বশবর্তী হয়ে একের পর এক অপরাধ করেছি। আজ আমি নিজে শাস্তি দেব—'

'কী শাস্তি দেবে?'

'এই দেখুন—'

গুলরুখ ক্ষিপ্রহাতে কাপড়ের ভেতর থেকে দুটি তীক্ষ্ণধার লৌহ শলাকা বার করে তৎক্ষণাৎ নয়নদ্বয়ে বিদ্ধ করল—অব্যর্থ সন্ধান। তার অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটি হীনপ্রভ হয়ে গেল একেবারে—গাল বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল অশ্রুজলের মতো। —রক্তের অশ্রুজল!

বেদনায় বিস্ফারিত সূর্যকান্ত। এ তার কল্পনার বাইরে ছিল। কাছে এসে বেদনামথিত কণ্ঠে বললে, 'এ কি করলে গুলরুখ?'

ম্লান হাসি ফুটে উঠল গুলরুখের রক্তাক্ত পাণ্ডবর্ণ মুখে : 'এই তো বেশ হলো প্রভু। সব কামনার অবসান। শুধু অন্ধের নয়নপথে ভেসে থাকবে তোমার ওই স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্তি—'

'আমি বুঝতে পারিনি গুলরুখ, ক্ষমা করো।'

গুলরুখ শিহরিত কণ্ঠে বললে, 'ছি-ছি ওকথা বোলো না, আমার পাপ বেড়ে যাবে। তুমি সুন্দর, তোমার কোনো দোষ নেই। তোমার যে রূপ আমি মনের মধ্যে ধারণ করে রইলুম তা-ই আমার বাকি জীবনের অন্ধকার আলোকিত করবে—তুমি দুঃখ পেও না—'

বাদশাহ বেগম বললেন, 'আমি সহ্য করতে পারছিনে। বাকি জীবন কাটাবি কী করে? আমার এই অন্ধ মেয়েটার তুমি একটা বন্দোবস্ত করে দিও—গো'

শাহজহান বললেন, 'গুলরুখ আমার কাছেই থাকবে।'

॥ চব্বিশ ॥

সূর্যকান্ত মুক্তিলাভ করে বাসায় ফিরে এল। তার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় সকলে বিশেষ ব্যাকুল ছিল। বাসা-বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। মনোরমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকল কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল, ইন্দিরা দ্বারের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুর দুর বক্ষে শুনল। গঙ্গাকিশোর বললেন, 'শুভকাজটা সেরে ফেলি এবার। চাকরির দরকার কি, বাদশাহের সনন্দ নিয়ে বাঙলায় ফিরলেই হয়। নিজের ন্যায্য পাওনা ছেড়ে এভাবে টো টো করে ঘোরা—'

সূর্যকান্ত হেসে বললে, 'নতুন চাকরিটা খোয়াব?'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'ওদিকে খুড়ামশায়ের ডাক এসেছে, তাঁর অবর্তমানে রাজ্যটা দশভূতে লুটে নিক এই কী তুমি চাও? আমাদের নতুন রানী-মা পথে বসুক তোমার ইচ্ছা কী তাই? আমি তা হতে দেব না—'

বলে আড়চোখে দ্বারান্তরালে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। ইন্দিরার শাড়ির যেটুকু আভাস দেখা যাচ্ছিল, তাও অন্তর্হিত।

সূর্যকান্ত বললে, 'কাশেম খাঁ শিগগির বাঙলায় যাচ্ছেন সুবাদারী নিয়ে, আমার ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে ফিরি—'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'বেশ তো। ততদিনে এদিকের কাজটা সারা থাক্। ফিরে গিয়ে সময় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'মাসিমা কী করবেন?'

মনোরমা বললে, 'আমার ফেরার ইচ্ছা নেই। বয়স তো হল। বৃন্দাবনবাসিনী হবার বাসনা—'

'আমাদের সঙ্গে চলুন।'

মনোরমা বললে, 'না বাবা। এতদূরে এসে ফিরে গেলে আমার নরকেও স্থান হবে না—'

কাশেম খাঁ বাঙলায় এসে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তুতিতে কাটল কয়েকটা দিন। জহাঙ্গীর-নগরে অবস্থান করে মনে মনে একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। সর্বদাই সন্ধান রাখছিলেন তিনি এবং সর্বত্র লোক মোতায়েন করছিলেন যাতে জাল কেটে বেরিয়ে যেতে না পারে একজন পর্তুগীজও। মাছের মতো ছেঁকে তোলার ইচ্ছা। তার জন্যে ব্যাপক আয়োজন দরকার। যেন বুঝতে না পারে তাদের ঘিরে ফেলা হচ্ছে। ছড়িয়ে, বড় করে জাল ফেলতে হবে। এতটুকু ছিদ্র বা ফাঁক রাখা চলবে না। জলে স্থলে অবরোধ। পুত্র এনায়েতউল্লা খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সেনাপতি আল্লা ইয়ার খাঁর সঙ্গে বর্ধমানে হিজলী-আক্রমণের ছলে, তারা ওখানে অবস্থান করুক স্থলপথ আগলিয়ে।

কিন্তু জবর অবরোধ দরকার জলপথে— যে পথ দিয়ে এসেছে পর্তুগীজেরা সে-পথ দিয়ে যেন ফিরে যেতে না পারে। নদীপথে বিভিন্নস্থানে ঘাঁটি প্রয়োজন। মখ্‌সুসাবাদে ঘাঁটি করে প্রস্তুত হয়ে থাকলেন সেনাপতি বাহাদুর খাঁ কাম্বোহ। আর শ্রীপুর থেকে সুন্দরবনের দিকে রওনা হলেন খাজা শের খাঁ নাওয়ারার সমস্ত কোশা ও গরাব নিয়ে। জহাঙ্গীর নগরের নদীপথ আগলিয়ে তিনি নিজে তো রইলেনই।....সূর্যকান্ত এসে পড়বে শিগগির, স্ত্রী নিয়ে বাড়ি গেছে, ওর ওপরে নির্ভর করা যায়। আর সপ্তগ্রামে আছেন শেঠ সর্বেশ্বর। একযোগে সকলের সহযোগিতা পেলে ওদের ধ্বংস অনিবার্য। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। কেবল সূর্যকান্তর অপেক্ষা। খোঁজ নিয়ে জেনেছেন বাদশাহের সনন্দ দেখে মুমূর্ষু

খুড়ামশায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন, সূর্যকান্ত এখন মহারাজা। সে আসছে দলবল নিয়ে।

ফিরিঙ্গিরা কিন্তু একেবারে চোখ বুজে ছিল না। ঝড়ের সংকেত দেখতে পাচ্ছিল দিকে দিকে। দূরে কোথায় কি-রকম মেঘ জমছে তা দেখার মতো দূরদৃষ্টি না থাক্ কাছের চেনা মেঘটি গুরুগম্ভীর আকার ধারণ করেছে এটুকু তারা বেশ টের পাচ্ছিল। তাদের বুকের ওপর বাস করে সেনার পর সেনা জমিয়ে তুলছে সর্বেশ্বর। এত সেনা সংগ্রহের কারণ কী? বড় বাড় বেড়েছে। অতীতে লোকটা বহু প্রকার বাধা সৃষ্টি করেছে, সপ্তগ্রামে কিছু করার উপায় নেই ওই লোকটার উপস্থিতিতে— সৌকত আলী খাঁ না-থাকার সময়েও বাধা এসেছে ওর কাছ থেকে। সপ্তগ্রামের জানপ্রাণ ধর্মাধর্মের রক্ষক যেন ও-ই। শিক্ষার দরকার হয়ে পড়েছে। আতস্বিতে তাঁর গৃহ আক্রমণ করল ফিরিঙ্গিরা। ভেবেছিল অপ্রস্তুত গৃহস্বামীকে বেশ কায়দায় ফেলা যাবে কিন্তু সর্বেশ্বর প্রতিপক্ষের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব হতে অবহিত ছিলেন বলে তেমন ক্ষতিসাধন সম্ভব হল না— যথেচ্ছ লুট ও সম্পত্তি নাশ করে চলে গেল তারা।

এ আক্রমণে সর্বেশ্বর সেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধস্পৃহায় সঞ্চারিত হল উত্তেজনা। তিনি সপ্তগ্রামে ফৌজদারের সহযোগিতায় হুগলী আক্রমণ করলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। আক্রমণের পরদিন সূর্যকান্ত এসে উপস্থিত সদলে। বুকে জড়িয়ে ধরলেন সর্বেশ্বর। বললেন, 'আপনি এসে গেছেন—আর ভয় নেই—'

সূর্যকান্ত বললে, 'জোর লড়াই চালান। আরও আসছে—'

লড়াইয়ের সংবাদ চলে গিয়েছিল মখ্‌সুসাবাদে, সেখান থেকে দ্রুত আসছিলেন খাজা শের খাঁ, কোশা ও গরাব নিয়ে সুন্দরবনের জলপথ অবরুদ্ধ করে তিনি হুগলীর কাছে এসে পড়েছিলেন—ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলেন। এনায়েতউল্লা খাঁ ও আল্লা ইয়ার খাঁ এলেন তারপর। হিজলীর পথ অবরোধ করে রইলেন স্বয়ং কাশেম খাঁ।

প্রসারিত জাল ঘুটিয়ে আনা শুরু হল।

এর সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা। পর্তুগীজ পাদ্রী ও ফিরিঙ্গি হার্মাদদের অত্যাচারে প্রপীড়িত দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসীরা দলে দলে যোগ দিল বাদশাহী ফৌজে। সৈন্যদল বেড়ে গেল আশাতিরিক্ত। তাদের সাহায্যে বাহাদুর খাঁ কাম্বোহ ও খোজা শের খাঁ প্রচুর নৌকো সংগ্রহ করে হুগলীর নিম্নে একটি নৌ-সেতু নির্মাণ করলেন — উদ্দেশ্য হুগলী বন্দরের সমস্ত গরাব কোশা ও জেলেডিঙা যাতে বাদশাহী নাওয়ারা কর্তৃক ধৃত হয়। হল তাই। বিপুল বেগে শুরু হল আক্রমণ। স্থলপথে পদাতিক আর জলপথে নৌসেনা হুগলী বন্দর ও দুর্গ আক্রমণ করল ১০৪০ হিজরায়, খৃষ্টাব্দ ১৬৩০।

দুর্গের বাইরে অবস্থিত নগর ও বন্দর আল্লা ইয়ার খাঁ দখল করে নিলেন সহজে। কিন্তু দুর্গ রয়ে গেল অটুট। সে যেন দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠল।

উপর্যুপরি আক্রমণে যখন কোনো ফল পাওয়া গলে না তখন সর্বেশ্বর এক নতুন পথ আবিষ্কার করলেন। তিনি জানতেন গির্জার কাছে হুগলী দুর্গের পরিখা বেশ সংকীর্ণ, তাঁর আদেশে সেনাবাহিনী সুড়ঙ্গ কেটে সেই স্থানের জল বার করে দিল। সৈন্য ঢুকল সেই পথে। আক্রমণের বেগ তাতে বাড়ল বটে কিন্তু দুর্গ রয়ে গেল অক্ষত, ভিতরে প্রবেশ সম্ভব হল না তবু।

আল্লা ইয়ার খাঁ ও অন্যান্য সেনানায়কগণ খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এভাবে অবরোধ করে কত দিন থাকা যায়? সামান্য একটা দুর্গ দখলে এত সময় নিলে সম্মান থাকে কী?'

কাশেম খাঁর অনুচরেরা ক্রমাগত আসছে আর সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কী ভাবছেন? তাঁর সম্মানও যে রক্ষা হয় না!

সূর্যকান্ত বললে, 'আমরা যদি বারুদের প্রয়োগ জানতাম—'

আল্লা ইয়ার খাঁ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন শিবিরে, ঘুরে দাঁড়ালেন, 'তার মানে?'

'সুড়ঙ্গ কেটে বারুদের সাহায্যে দুর্গপ্রাকার উড়িয়ে দেওয়া যায়—'

আল্লা ইয়ার খাঁ বললেন, 'তা হচ্ছে না কেন?'

'আমরা কেউ সুড়ঙ্গের নিশানা করতে পারছিনে—'

আল্লা ইয়ার খাঁ বললেন, 'আবার চেষ্টা করুন।'

'তাতে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ তৈরি হবে, আর নষ্ট হবে বারুদ। ওটা পাকা মাথার কাজ। দুর্ভাগ্যের বিষয় তেমন মাথা আমাদের মধ্যে নেই—'

সর্বেশ্বর সেন ঢুকলেন একজন বিকলাঙ্গ ইংরাজকে সঙ্গে নিয়ে। 'শুনুন এর কথা। হয়ত এর দ্বারা কাজ হবে—'

সূর্যকান্ত বললে, 'একে পেলেন কোথায়?'

'রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছিল নিজের মনে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সে একজন ইংরাজ বণিক—পর্তুগীজ-দস্যুর আক্রমণে হৃতসর্বস্ব হয়ে প্রথমে ছিল গোয়ায় সেখানকার পাদ্রীদের অত্যাচারে হাতের হাড় খুইয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে এখানে। স্বদেশে লোকটা ছিল যুদ্ধব্যবসায়ী—এখন আক্রোশ পর্তুগীজদের ওপর। সুড়ঙ্গ কেটে বারুদ ঠেসে কী করে দুর্গপ্রাকার ধ্বংস করতে হয় তা সে শিখেছে ফরাসী দেশে। ওর হাত গেছে কিন্তু মগজটা এখনও আছে, ওকে দিয়ে কাজ হতে পারে—'

সূর্যকান্ত বললে, 'রাজী আছো?'

বিকলাঙ্গ ইংরাজ বললে, 'এক্ষুনি—'

'চলো, আমি লোক দিচ্ছি। শুধু দেখিয়ে দাও কোথায় কীভাবে সুড়ঙ্গ কাটতে হবে। বারুদ আমাদের মজুত—'

বিকলাঙ্গ ইংরাজ আগেই চিন্তা করে রেখেছিল। লোকের সাহায্যে সে একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করল। ওপর থেকে ভিতরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঢেলে দিন বারুদ—'

সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তটি বারুদে পূর্ণ করা হল। রাশি রাশি বারুদ। স্তূপ জমে উঠল।

এখন সমস্যা কে করবে অগ্নিসংযোগ? প্রাণের মমতা সকলেরই আছে। হিন্দু অথবা মুসলমান সেনাদের মধ্যে অগ্নিসংযোগে রাজী হল না কেউই।

ফের দুশ্চিন্তা। এতদূর এসে ব্যর্থ হবে আয়োজন? বাদশাহী ফৌজের দল প্রস্তুত হয়ে রয়েছে চারিদিক ঘিরে, দুর্গপ্রাকার ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করবে তারা। নষ্ট হবে এ সুযোগ? কেউ ভেবেই পাচ্ছিল না কী ভাবে সমাধান হবে এ সমস্যা। মশাল জ্বলছে লেলিহান হয়ে। ওটা নিয়ে শুধু নিচে নেমে যাওয়া। কেউ নেই?—সূর্যকান্ত অস্থির হয়ে উঠছিল মশালের পানে তাকিয়ে। মশাল নয়, বুঝি লেলিহান হয়ে উঠেছে—হার্মাদদের অট্টহাসি।

কাঁধে হাত পড়ল। ঘুরে দাঁড়াল সূর্যকান্ত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

'আপনি?'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'মশালটা দাও।'

'কিন্তু আপনি কেন? না—না—না—'

গঙ্গাকিশোর বললেন, 'একটা সংবাদ দিতে এসেছিলুম। তোমার খুড়ামশায় গত হয়েছেন, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। যুদ্ধ আজই শেষ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ও কী করছেন? আপনি যাবেন না ভট্‌চায-জ্যাঠা—'

গঙ্গাকিশোর নিজেই তুলে নিলেন মশাল। বললেন, 'এমন সুযোগ আর কখনও পাব না। তুমি বাধা দিও না সূর্যকান্ত। আমাকে প্রতিশোধ নিতে দাও—'

এগিয়ে চললেন তিনি।

'ওটা আত্মহত্যার পথ। ওখান থেকে কেউ ফেরে না ভট্‌চায-জ্যাঠা। আপনি ফিরে আসুন—'

সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে গঙ্গাকিশোর বললেন, 'আমার প্রাণের বিনিময়ে তোমাদের মঙ্গল হোক। বাঙলার মঙ্গল হোক। সকলের মঙ্গল হোক।'

তিনি নেমে গেলেন সুড়ঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে হুগলীর পর্তুগীজ গীর্জা ও দুর্গপ্রাকার ঊর্ধ্বে উত্থিত হল ভীষণ শব্দে, আরও কিছুক্ষণ পরে হুগলীর পর্তুগীজ অধিকার লুপ্ত হল চিরতরে। সামান্যক্ষণের যুদ্ধ, বন্দী হল সবাই। তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল আগ্রায়। ফিরে

গেল বাদশাহী সৈন্য। ফিরে গেল সূর্যকান্ত। ফিরে গেল সকলে। ফিরলেন না শুধু একজন।

॥ পঁচিশ ॥

প্রাক-শীতের এক অপরাহ্নে একখানি ছোট নৌকো আগ্রা দুর্গের শ্যামল তৃণক্ষেত্রের সম্মুখে এসে থামল। ওটা ঘাট নয় যমুনার ঢালু তীর, তৃণের আচ্ছাদনে শয্যার মতো বিস্তীর্ণ। নৌকোয় আরোহী দুজন, একজন পুরুষ অপরজন নারী। পুরুষের পোশাকে আভিজাত্যের লক্ষণ—নারীর শিরে অবগুণ্ঠন। পরিচিত জায়গা, তবু নৌকো হতে অবতরণ করে পুরুষ জিজ্ঞাসা করল, 'মাঝি, সমাধি কোথায়?'

'সোজা চলে যান—ওই যে—'

মাঝি অদূরে দূর্বাক্ষেত্র দেখিয়ে দিল আঙুল তুলে। দুজনে এগিয়ে চলল নির্দেশ মতো।

তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের রক্তরাগচ্ছটা আগ্রা দুর্গের শীর্ষে— ঝলমল করছে শুভ্র মতি মসজিদের শুভ্রতর মিনার। যেন রিক্ত অঙ্গে বেদনার প্রতিফলন। তেমনি নির্মীয়মান ক্ষুদ্রাকার সমাধিসৌধটি মনে হয় প্রকৃতির এক ফোঁটা অশ্রুজল, শুভ্রমর্মরে বিরহ-প্রণয়ের মর্মান্তিক আলোছায়া। নিস্তব্ধ প্রান্তরে সে বুঝি কালোত্তীর্ণ বিরহ-বেদনা। সম্পূর্ণ হয়নি এখনও কিন্তু গঠন-কৌশলে অসাধারণ নৈপুণ্য।

'কতদিন পরে এলাম।' পুরুষ স্বগতোক্তির মতো বললে, 'মনে হচ্ছে সব যেন বদলে গেছে। ওখানে ছিল ফাঁকা প্রান্তর এখন গড়ে উঠছে সমাধি। ইন্দিরা, তুমি কী শুনতে পাচ্ছ কোথা থেকে গান ভেসে আসছে—'

ইন্দিরা দূরে সমাধির পানে তাকিয়েছিল। বললে, 'আমরা বড় দেরি করে এলাম।'

'তোমার জন্যেই আসা। তোমাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, দুর্ভাগ্য, তিনি আজ ইহজগতে নেই—'

ইন্দিরা বললে, 'জায়গাটা কী সুন্দর! ওপরে খোলা আকাশ, নিচে ফাঁকা প্রান্তর, পাশে নীল যমুনা। মাঝে গড়ে উঠছে মর্মরের সমাধি—'

'সবে শুরু হয়েছে। কাজ এগোচ্ছে। চমৎকার দেখাচ্ছে সমাধিটা, না?'

ইন্দিরা বললে, 'ওর নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত বাদশাহ বেগম—'

'বাদশাহ বড় ভালবাসতেন।'

ইন্দিরা বললে, 'সেই ভালবাসার সৌধই গড়ে উঠেছে একটা—'

'তোমার যেন নিশ্বাস পড়ল।'

ইন্দিরা বললে, 'ঈর্ষা হয়—'

'দেখেছো কত লোক খাটছে? বাদশাহ কার্পণ্য করবেন না নিশ্চয়। প্রিয়তমা বেগমের উপযুক্ত সম্মান তিনি রাখবেন।'

ইন্দিরা বললে, 'প্রেমিক শাহজহান—'

আবার দীর্ঘশ্বাস। হিন্দুস্থানের বাদশাহের হয়ত এ একটা খেয়াল! আমরাও পারতাম যদি আমাদের সাধ্যে কুলতো! এ রকম কত প্রেম ঝরে যায়।'

ইন্দিরা বললে, 'কাছে গিয়ে কাজ নেই—'

'কেন?'

ইন্দিরা বললে, 'চেয়ে দ্যাখো—'

সূর্যকান্ত দেখল, সমাধির পাশে সাদা পোশাকে একজন প্রৌঢ় মুসলমান—সমাধিগাত্রে মিশে আছেন যেন। তাঁর পদপ্রান্তে এক অন্ধ রমণী, শীর্ণদেহে ও মলিন বেশে। প্রৌঢ় মুসলমান সমাধিগাত্রে বাহু প্রসারিত করে স্তব্ধ। বুঝিবা বাহ্যজ্ঞানরহিত।

'কে উনি?'

ইন্দিরা বললে, চিনতে পারলে না তুমি?'

'বুঝতে পারছিনে—'

'আমি দেখেই চিনেছি।'

'কে?'

'সমাধির পাশে ওভাবে আর কে বসে থাকবেন, বাদশাহ ছাড়া?'

'বাদশাহ!'

'আমার তাই মনে হয়—'

বিস্ময়ে তাকাল সূর্যকান্ত। ইন্দিরার অনুমান মিথ্যা নয়। বাস্তবিক হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট বাদশাহ শাহজহান প্রাকশীতের অপরাহ্নে প্রান্তরমধ্যে সমাধিপার্শ্বে বসে আছেন শূন্য মস্তকে— বিশ্বাস করা যায় না। বলে না দিলে চেনা শক্ত। বাদশাহের এ এক অন্য রূপ।

'তুমি চিনলে, কী করে?'

ইন্দিরা বললে, 'চেনা যায়—'

সূর্যকান্ত বুঝল মেয়েদের অন্তর্দৃষ্টি পুরুষদের অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ।

ইন্দিরা বললে, 'বাদশাহ বেগমকে চোখে কখনও দেখিনি, শুধু তোমার মুখে শুনেছি তাঁর কথা। বিয়ের পরে যাবার ইচ্ছা ছিল তাও ঘটে ওঠেনি। এখন বিরহী বাদশাহের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। একবার স্পর্শ করব ওঁর সমাধি। এসো এইখানে দাঁড়াই, বাদশাহ চলে গেলে সমাধির কাছে যাব—'

'অনেক কাছে এসে পড়েছি!'

ইন্দিরা বললে, 'তা হোক। দাঁড়াও এখানে গান শোনো—'

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হৃদয় মন্দির মোর—'

গান ভেসে আসছিল।

'কানু ঘুমাল—'

বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল সুর।

'প্রেম প্রহরী রহ জাগি—'

শাহজহান সমাধিগাত্র হতে মুখ তুলে তাকালেন।

'কে তোমরা? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

নজর পড়েছে ওদের প্রতি।

সূর্যকান্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। অভিবাদন করে আত্মপরিচয় দিল। শাহজহান স্মরণ করতে পারলেন। 'মনসবদার, তুমি কি গান গাইছিলে?'

সূর্যকান্ত বললে, 'না জহাঁপনা'

'তবে কে গাইল?'

সূর্যকান্ত বললে, 'ওপাশে বসে কেউ গাইছে। দেখতে পাচ্ছি না—'

'মনসবদার, এ কোন্ ভাষার গান?'

সূর্যকান্ত বললে, 'বৈষ্ণব পদাবলী। হয়ত কোনো বৈষ্ণব গাইছে—'

'বড় মিঠে সুর, তুমি ডেকে আনতে পারো?'

সূর্যকান্ত পেছন ফিরে ইন্দিরার পানে তাকাল।

তা দেখে শাহজহান বললেন, 'কে উনি? তোমার আত্মীয়া?'

সূর্যকান্ত বললে, 'আমার স্ত্রী—'

'উনি এসেছেন কেন?'

সূর্যকান্ত বললে, 'হজরত বাদশাহ বেগমের সমাধির ধুলো নিয়ে যেতে —'

'কাছে আসতে বলো। ওকে গুলরুখের কাছে রেখে তুমি গায়কের সন্ধানে যাও।'

সূর্যকান্ত বললে, 'কার কাছে রেখে?'

'কেন গুলরুখ। ওই তো বসে রয়েছে—'

গুলরুখ!

সূর্যকান্তর সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল। দেখেছিল আগেই। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। ও কী গুলরুখ? দেহের সে লালিত্য কই? সজ্জার সে ঘটা কই? শীর্ণদেহা, মলিনবাস পরিহিতা কে ও?—অপলকে তাকিয়ে সূর্যকান্তর মন ভরে উঠল করুণায়। এ সেই নারী একদা যে নিজের হাতে শলাকাবিদ্ধ করেছে নিজের চোখ। প্রণয়ের এ ইতিহাস কেউ কী লিখে রাখবে শিলায় কিংবা মর্মরে?

গুলরুখের মণিহারা চোখ দুটো বিস্ফারিত—শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। কখন্ অজান্তে উঠে দাঁড়িয়েছে, উভয়ের কথোপকথন শুনছিল উদগ্রীব হয়ে। বাদশাহের কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল, 'তুমি! দেবতা এ তোমার কণ্ঠস্বর! কতদিন পরে এলে—'

তার মাথার আবরণ খসে গেছে, রুক্ষ তেলহীন কেশরাশি, জ্যোতিহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখ। যেন একটা সর্বহারা বিষাদের প্রতিমূর্তি।

সূর্যকান্ত ডাকল, 'গুলরুখ—'

'আজ কত কাছে তুমি। কত সহজে আমার নাম ধরে ডাকলে। এই প্রথম তোমার কণ্ঠে আমার নামের ডাক শুনলাম। আবার ডাকো।'

সূর্যকান্ত ডাকল, 'গুলরুখ—'

'বলো প্রিয়তম।'

সূর্যকান্ত বললে, 'কেমন আছো?'

'খুব ভাল। এর চেয়ে বেশি সুখ আমি চাইনি—'

সূর্যকান্ত বললে, 'কিন্তু এ তো সুখ নয় গুলরুখ। নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করছো। তুমি আমার দেশে চলো—'

'কোথায় প্রিয়তম?'

সূর্যকান্ত বললে, 'আমার দেশে চলো। আমি যত্ন করে রাখব। তোমার সেবা করব। সুস্থ করে তুলব, তুমি আবার সেই পুরানো দিনের গুলরুখ হবে—'

'পাগল হয়ে যাব, প্রিয়তম। আমার শক্তি বড় অল্প। অমন করে ডাক দিলে আমি যে নিজেকে ধরে রাখতে পারব না! দোহাই, তুমি অন্য কথা বলো—'

সূর্যকান্ত নির্দ্বিধায় বললে, গুলরুখ আমি তোমাকে ভালবাসি। এই জোরে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কোনো আপত্তি শুনছিনে—'

'চুপ চুপ চুপ।'

গুলরুখের সারা দেহ কাঁপল থরথরিয়ে। আবেগে কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। অন্ধ চোখ দুটি ভরে গেল জলে।

'প্রিয়তম, এই যথেষ্ট। অনেক পেলাম। সেদিন রূপের অহংকারে যা পাইনি আজ সর্বহারা আমাকে তাই দিলে—'

সূর্যকান্ত বললে 'যাবে না গুলরুখ?'

'বড় দেরি হয়ে গেছে, প্রিয়তম! আজ আমার কিছু নেই। সম্পূর্ণ রিক্ত, নিঃস্ব। এখানেই থাকতে দাও, এই আমার যথার্থ স্থান। তোমার প্রেমের মধ্যে যাকে একটুখানি ঠাঁই দিয়েছো তোমার করুণার মধ্যে তাকে আর টেনে নামিও না—'

থেমে বললে, 'আমার কাছে তুমি রাজা হয়ে আছো। সে ছোট হয়ে যাবে। সেই রাজকীয় অনিন্দ্য রূপ আমি দেখতে পাই। ক্ষমা করো রাজা, আমার রাজা—'

'গুলরুখ!'

'তিনি কই?' গুলরুখ কাঁপা হাত বাড়িয়ে দিল: 'তোমার স্ত্রী।'

কথাবার্তার ফাঁকে ইন্দিরা এগিয়ে এসেছিল, আরও কাছে এল। স্পর্শমাত্রেই গুলরুখ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলল। হাত বুলোতে লাগল পিঠে মাথায়।

অশ্রুধারা নেমে এল গাল বেয়ে। গাঢ়, আপ্লুতস্বরে বললে, 'সুখী হও, বহিন। রাজার সুখভাগিনী হও।'

গান ভেসে আসছিল, 'প্রেম প্রহরী রহু জাগি—'

প্রান্তরের সীমায় তৃণক্ষেত্রের পাশে, পথের ওপর বসে এক কৃশকায় বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ উদাত্ত গলায় গান গাইছিল ঃ

হৃদয় মন্দির মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন পৌর চোর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥

সূর্যকান্ত কাছে গিয়ে বললে, 'এখানে বসে গান গাইছো কেন?'

গান থামিয়ে বৃদ্ধ বললে, 'আমার চলবার শক্তি নেই, একজন দয়া করে এই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে আছি। মনে ভাবলুম গান শুনে যদি কেউ বাকি পথটা পৌঁছে দেয়—'

সূর্যকান্ত বললে, 'তুমি কোথায় যাবে?'

'ওই সমাধির কাছে—'

সূর্যকান্ত বললে, 'চলো আমি ওখানে নিয়ে যাব বলেই এসেছি।'

'আপনার অসীম দয়া। জয় রাধামাধব—'

সূর্যকান্ত বৃদ্ধকে কোলে তুলে নিল। প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে বৃদ্ধ গুনগুন করে গান গাইছিল! সমাধির কাছে এসে বৃদ্ধ কাপড়ের ভেতর থেকে একটি বহুমূল্য হীরের আঙটি বার করে সূর্যকান্তের হাতে দিল। বললে, 'এটা বাদশাহকে দেবেন—'

বাদশাহ আঙটি দেখে চমকিত হলেন।

'ফকির, তুমি কী সপ্তগ্রামের সেই বৈষ্ণব?'

বৃদ্ধ নবীনদাস বললে, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমার কিছু প্রার্থনা আছে—'

'প্রাসাদে গেলে না কেন?'

নবীনদাস বললে, 'মহারাজ, আমার মন বলে দিলে এখানেই আপনার দেখা পাব—'

'ফকির, তুমি কী চাও?'

নবীনদাস বললে, 'আমার গুরু বন্দী হয়ে আছেন, মহারাজ দয়া করে তাকে মুক্তি দিন—'

'তোমার গুরু?' নবীনদাস বললে, 'হ্যাঁ মহারাজ—'

'কোথায়?'

কিছুদূরে মমতাজ-ই-মহল আরজুমন্দবানু বেগমের জগদ্বিখ্যাত সমাধির ভিত্তি নির্মাণকল্পে বহু ব্যক্তি মজুর খাটছিল। কেউ পাথর ভাঙছে কেউ মাটি

তুলছে। তার মধ্যে কয়েকজন বন্দী ফিরিঙ্গি ছিল, তারা মাটি বইছিল। তাদের একজনের পানে আঙ্গুল নির্দেশ করে নবীনদাস বললে, 'ওই যে—'

'মনসবদার, ডেকে আনো।'

সূর্যকান্ত ডেকে আনল।

'তুমি এর গুরু?'

ফিরিঙ্গি বুঝতে পারল না। তারপর বিকলাঙ্গ নবীনদাসের পানে তাকিয়ে শিউরে উঠল। আধোবদন হল আপনা-আপনি।

'চিনতে পারলে না?' নবীনদাস স্মিতমুখে বললে, 'একদিন এই পথভ্রান্তকে পথের আলো দেখিয়েছিলে— সেই আলোয় আজও পথ চলছি। তুমি না দেখালে ও-পথের সন্ধান আমি পেতাম না। অতএব তুমি আমার গুরু। মহারাজ, আমার গুরুর মুক্তি প্রার্থনা করি—'

শাহজহানের ইংগিতে সূর্যকান্ত ফিরিঙ্গির বন্ধনদশা মোচন করল।

'তুমি মুক্ত—'

ফিরিঙ্গি বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যমুনার তীর থেকে বেগে বাতাস উঠল, প্রাক-সন্ধ্যার আকাশ হতে মুছে গেল দিবসের শেষ রশ্মিরেখা। শুধু জেগে রইল শ্বেতশুভ্র সমাধি। ধূলিঝঞ্ঝার হাত হতে মুক্তি পাবার জন্যে শাহজহান সমাধি আলিংগন করে বসে পড়লেন। তাঁর পশ্চাতে গুলরুখ ও ইন্দিরা নতজানু হয়ে বসল। সূর্যকান্ত মাথা নিচু করে দাঁড়াল তাদের পিছনে। নবীনদাস ছোট মানুষ, সে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দরাজ গলায় গান ধরল, 'প্রেম প্রহরী রহু জাগি—'

ফিরিঙ্গির হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। তার চোখে অশ্রু দেখা দিল। সে স্বদেশের প্রথানুসারে নত হল। তার সামনে সমাধি। পাশে শাহজহান। ও প্রান্তে নবীনদাস। প্রণাম কার উদ্দেশ্যে বোঝা গেল না। হয়তো হিন্দুস্থানের সহনশীল উদার আত্মার উদ্দেশ্যেই।

সেই ফিরিঙ্গি হুগলীর পাদ্রী আলমিডা।

সমাপ্ত